সচিত্র

কাশীধাম

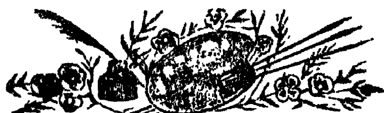
(কাশী তথা বারাণসীর অতীত ও বর্ত্তমান সময়ের বিস্তৃত বিবরণ।)

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ, "শিল্প ও সাহিত্য"
পত্রিকার সম্পাদক এবং 'আলোক-চিত্রণ'
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা
শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।

——:o:——

ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের
'শিল্প ও সাহিত্য' পুস্তক-বিভাগ হইতে
শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
কলিকাতা।
১৩১৮।

মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র



PRINTED AND PUBLISHED BY
Syam Lall Chuckerbutty,
THE INDIAN ART SCHOOL,
92, Bowbazar Street. Calcutta.



যিনি আমার প্রত্যক্ষ দেবতা, যাঁহার পদ-কোকনদ
আমার তীর্থশ্রেষ্ঠ কাশী, যাঁহার কাশী-
বাস ও কাশীদর্শন জন্যই আমি বারং-
বার বারাণসীর নানাস্থান পরিদর্শন
করিবার অবসর পাইয়াছিলাম,
সেই পরমারাধ্যা অন্নপূর্ণা-
সদৃশা স্নেহময়ী জননীর
শ্রীচরণাম্বুজে আমার এই
অতি সামান্য অঞ্জলি
"কাশীধাম"
ভক্তি-সৎকারে
সমর্পিত
হইল।

কাশীধাম।

শ্রীমন্মথ।

প্রকাশকের নিবেদন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল কাশীধামের কতিপয় অংশ, "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়, অনন্তর কাশীবাসী ও কাশী-দর্শনাভিলাষী অনেকের বিশেষ অনুরোধে ইহা এক্ষণে তাহা হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া সম্পূর্ণ পুস্তকাকারে পরিণত হইল।

পুরাকাল হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশবাসী বহু মহানুভব ব্যক্তি কাশী বারাণসী সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকেও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত হিন্দুর দৃষ্টিতে সুপবিত্র কাশীর ঐতিহাসিক সৌন্দর্য্য লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই বিস্তৃতভাবে কোন পুস্তক প্রণয়ন করেন নাই, বিশেষ বাঙ্গালা-ভাষায় কাশী-সম্বন্ধে আদৌ কোন প্রামাণ্য পুস্তক না থাকায় মদীয় অগ্রজ মহাশয় প্রায় ১৫।১৬ বৎসর কাল যাবৎ অনেক সময় কাশীতে অবস্থান করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন, এ পুস্তকে তাহাই সাধ্যমতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে আমাদের পুণ্যতীর্থ কাশীর দর্শনার্থী জন-সাধারণ ইহা পাঠে কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার বোধ করিলে আমাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইতি

কলিকাতা।
সন ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

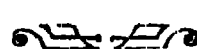
শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্ত্তী।
প্রকাশক।

সূচীপত্র।



বর্ত্তমান কাশীর সাধারণ দৃশ্য।

কাশীধাম।



কাশীধাম আর্য্যের অতি প্রাচীন, পবিত্র ও মহা পুণ্য-তীর্থ। আর্য্যসন্তান এ দুর্দ্দিনেও ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, বিধি-নিয়ম সর্ব্ব কর্ম্মে পতিত হইয়াও কাশীর সেই মহামহিমান্বিতা চিরশান্তিপ্রদা সুশীতল-বাহিনী গঙ্গা, সেই পবিত্র মহাতীর্থ মণিকর্ণিকা-দশাশ্বমেধ সেই ত্রিভুবন-বিশ্রুত সত্যনিষ্ঠ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মহাশ্মশান, বাল্মীকি-ব্যাস বুদ্ধ-শঙ্কর প্রভৃতির সেই অলৌকিক সাধন-সামর্থ্য, যাহা কাশীর প্রতি অণু পরমাণুর সহিত বিজড়িত, যাহা জগতের সকল জাতির ইতিহাসেই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে, তাহার মাহাত্ম্য ও মায়া, চিত্ত হইতে এখনও তাঁহারা বিচ্যুত করিতে পারেন নাই ; তাই এখনও যাঁহার ধমনীতে আর্য্য-শোণিত অতি ক্ষীণভাবেও প্রবাহিত আছে, তাঁহার হৃদয় ও জীবনে একবার মাত্র কাশীদর্শন ও অন্তে কাশীতল-বাসিনী গঙ্গার পবিত্র সলিলে দেহ বিসর্জ্জন করিতে অভিলাষ করে ; তাই এখনও ভারতের প্রান্ত-চতুষ্টয়ের প্রত্যেক প্রদেশ, প্রতি পল্লী, প্রতি গৃহ

হইতে দলে দলে লক্ষ লক্ষ লোক আসিয়া কাশীবাস করিতেছে ও কাশীদর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এমন পবিত্র তীর্থ জগতে আর বুঝি নাই! কেবল সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসী হিন্দুদিগেরই যে ইহা প্রধানতম-তীর্থ, তাহা নহে, ইহা এসিয়া মহাপ্রদেশ বা প্রাচ্যভূখণ্ডের একমাত্র মহাতীর্থ বলিয়া জগৎ প্রসিদ্ধ। চীন, জাপান, তীর্ব্বত ও সিংহল প্রভৃতিদেশ-বাসী পবিত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগেরও সেইরূপ বরেণ্য ও অত্যন্ত আকাঙ্খার স্থান। মহামুনি শাক্যসিংহ ধর্ম্ম ও নির্ব্বাণ সম্বন্ধে তাঁহার সুপবিত্র মত এই স্থান হইতেই প্রথম প্রচার করেন। কাশীর প্রাচীনত্ব ও তাহার চিরপ্রতিষ্ঠিত একছত্র-ধর্ম্ম-সিংহাসন সম্পর্কীয় নানা প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে, সে সকলের বিস্তৃত উল্লেখ প্রয়োজন মনে করি না। তবে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত আভাষ সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

কাশী কত দিনের ?

কাশী কত দিনের, এই প্রশ্ন লইয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রদেশের কত পুরাতত্ত্ববিদ্ কত কথাই যে লিপিবদ্ধ

করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যিনি আর্য্যবংশ-সম্ভূত, বেদাদি সনাতন-ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি আছে, তাহাকে এই অনাদি-লিঙ্গরূপী বিশ্বেশ্বরের অতি প্রীতিপ্রদ কৈলাসসম আদি তীর্থ এই 'কাশীধাম' যে কতদিনের, তাহা আর বলিতে হইবে না—কত সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, কত কল্প কত মহাকল্প যে, ভাগিরথীর ঐ কল-কল-প্রবাহিত তরঙ্গমালার ন্যায় কাশীর পবিত্র বক্ষ বিধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার কত যুগ-যুগান্তর ঠিক এইরূপ ভাবেই প্রবাহিত হইবে, কে তাহার গণনা করিবে? সেই অনাদি ও অনন্ত কালভৈরবই 'কোতোয়াল'রূপে কাশীর চির-শান্তিপ্রদ অন্নপূর্ণার সিংহদ্বারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহার গণনা করিবেন। এ সংবাদ তোমার আমার রাখিবার সাধ্য নাই, সামর্থ্যও নাই। আবার যাহাদের এ বিশ্বাস নাই, জগতের সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই যাঁহারা খৃষ্ট জন্মের দুই পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বা পরে বলিয়া স্থির করেন, তাঁহারাও কাশীর জন্ম-কাল অতি প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পণ্ডিতবর রেভাঃ ডাঃ এম, এ, শেরিং 'বেনারস-লণ্ডন-মিশনারী-সোসাইটীর' আচার্য্যরূপে বহুকাল কাশীবাস করিয়া সন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে "The Sacred City of the Hindus" নামক যে

সুবৃহৎ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি কাশীর প্রাচীনত্ব বিষয়ে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, "কাশী-বা বেনারসের পূর্ব্ব-ইতিহাস সুদূর অতীতের ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন, হিন্দুদিগের এই পবিত্র সহর গভীর অবিরোধী পুরাতত্ত্বের বিষয়ীভূত। যখন আর্য্যগণ উত্তর ভারতের নানাস্থানে অতি ধীরে ধীরে আত্ম-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতে ছিলেন, বোধ হয় তখনই তাঁহা-দিগের দ্বারা এই কাশী সহরেরও প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। দুর্ভেদ্য কুহেলিকাচ্ছন্ন বা ঘনঘোর মেঘমালায় সমাবৃতবৎ বৈদিককাল বা আর্য্য-ইতিহাসের মধ্য দিয়া কাশীর সেই পুরাতত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্তই দুরূহ। সে যাহা হউক ইহা যে আর্য্যদিগের আর্য্য নাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের অতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপ্রদ স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন আর্য্য-শাস্ত্রাদি আলোচনায় সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"এই প্রাচীন সহর 'বেনারস' বহু পুরাতত্ত্বের আধার, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সময় সময় নানা দৈব ও রাষ্ট্রীয় দুর্ঘটনায় ইহার বহু প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতল অতীতের কোলে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! তবে শাক্যমুনি হইতে ইহার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী বেশ জানিতে পারা যায়।"

"পঞ্চবিংশতি-শতাব্দীরও পূর্ব্বে যখন আসিরীয়, কালদীয়, বাবেলন্, ট্রয় ও মিসর সবে মাত্র আপন আপন নবোত্থিত প্রভাব প্রকাশ করিতেছিল, যখন রোম, গ্রীস প্রভৃতি তাহাদের জরায়ু-শয্যায় শায়িত, তাহাদের নাম গন্ধও কেহ যখন জানিতে পারে নাই, সেই প্রাচীনযুগে কাশীনগরী আপন বিদ্যা ও বৈভবে অতি প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি সগর্ব্ব অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিয়া নিজ পুরাতত্ত্বের পরিচয় দিতে ছিল।* এতদ্ব্যতীত কালের এই বিষম ঘাত-প্রতিঘাতে কত দেশ, কত জনপদ, কত জাতি কয়েক শতাব্দীর জন্য উত্থিত হইয়া আবার কোথায় অতীতের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাদের চিহ্ন মাত্রও নাই; কিন্তু কাশীর—সেই একই ভাব চিরদিন সমান ভাবেই বিরাজিত, কাশীর ভাগ্যসূর্য্য কোন কালেই অস্ত হয় নাই, কাশীর শান্তস্নিগ্ধ যশঃসৌরভ কোন দিনই মলিন হয় নাই। যুগ-যুগান্তর ধরিয়া বংশপরম্পরায় তাহা চলিয়া আসিতেছে, কাশীনগরী ভারতের অধিশ্বরীরূপে চিরদিন নিজ সমান আধিপত্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে, কাশী যেমন পুরাতন তেমনি চির নূতন।"

* যজুর্ব্বেদের 'শতপথ ব্রাহ্মণ' ও 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণ' উপনিষদেও কাশী একটী বিস্তৃত জনপদ ও যজ্ঞভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মহাত্মা কেন্ সাহেবও তাঁহার ‘Picturesque India’ নামক গ্রন্থের ৩০২।৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন “আর্য্যদিগের ভারতে প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বেনারস বা কাশীর প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। কাশী জগতের অতি প্রাচীন সহর।”

শাক্যসিংহ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্বলাভ করনান্তর খৃঃ পূর্ব্ব ছয়শত শতাব্দীতে আত্মমত প্রচারোদ্দেশ্যে ভারতের বিধি-নিয়ম ও ধর্ম্মচক্র-পরিচালক কাশীর সিদ্ধ-সাধু ও বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হন ও প্রাচীন প্রচলিত মতের খণ্ডন করিয়া নিজমতের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হন। মহামুনি বুদ্ধদেব তখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদ্যপি কাশীর মধ্যে একবার তাঁহার মত কিয়ৎ পরিমাণেও প্রতিষ্ঠালাভ করে, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে তাঁহার প্রভাব বিস্তার করা অতি সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। এইরূপ ভাব কেবল যে তিনিই পোষণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, জগতের যে কোনও ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ভুক্ত জনসমূহ এখনও পূর্ব্ব-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচারীমণ্ডলীর পার্শ্বেই সেইভাবে দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব অভিমত প্রচার করিয়া থাকেন। এই কারণেই হিন্দুর মন্দিরের পার্শ্বে জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মোস্‌লমান দিগের মন্দির বা মঠ, গীর্জা ও মশ্‌জিদের প্রতিষ্ঠা

হইয়াছে ও হইতেছে। এইভাবেই শাক্তের প্রতি বৈষ্ণবের নিন্দাবাদ, বৈষ্ণবের উপর শৈবের শ্লেষোক্তি প্রভৃতি শুনিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক ভগবান বুদ্ধ যখন আর্য্যের আচার-ভ্রষ্টতা দেখিয়া কাতর হইলেন, তখনই সাময়িক ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের বিধি-নিয়ম-প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই প্রচার-কার্য্য কাশী হইতেই আরম্ভ হওয়ায় কাশীর সহিত তাঁহার ঐতিহাসিক জীবন জড়িত হইয়া রহিয়াছে। মহাত্মা 'কেন্' বলিয়াছেন কাশী হইতে ভগবান বুদ্ধের যে পবিত্র মত প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমে বিস্তৃত হইয়া ভূমণ্ডলের অর্দ্ধাধিক মনুষ্য-সমাজের উপর প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

'ফা-হিয়েন' ও 'হিউয়েন্থ-সাং' প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-চীন-পর্য্যটকদ্বয় খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৭ম শতাব্দীতে ভারতের বৌদ্ধতীর্থসমূহ পর্য্যটন করিতে আগমন করেন। তাঁহাদের লিপিবদ্ধ বর্ণনাবলী হইতে জানিতে পারাযায় যে, তৎকালে কাশীধাম ভারতের একটী প্রধান রাজ্য-রূপে পরিগণিত ছিল। তখন তাহার পরিধি প্রায় ছয়শত সাতষট্টী মাইল ছিল। সেই বিস্তৃত রাজ্যের পশ্চিম পার্শ্বে গঙ্গার নিকটেই কাশীরাজ্যের রাজধানী দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইলের উপর এবং প্রস্থে অনুমান এক মাইল হইবে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তাহার

আনুসঙ্গিক বহুজনাকীর্ণ অন্যান্য বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলিও সংবদ্ধ ছিল। এস্থানের জনমণ্ডলী যেমন ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন, তাঁহাদের গৃহাদি যেরূপ বহু দুর্লভ ও মহামূল্য সামগ্রীনিচয়ে সুশোভিত ও গৌরবান্বিত ছিল, তাঁহারাও সেইরূপ সুসভ্য, ভদ্র, অমায়িক ও মার্জ্জিত-বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন, বিশেষ যাঁহারা বিদ্যানুশীলনে জীবন অতিবাহিত করিতেন, তাঁহাদের সৌজন্য ও মহানুভবতা বাস্তবিকই অনির্ব্বচনীয়। কাশী রাজ্যের অধিবাসীমধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং অতি অল্পসংখ্যক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এস্থানের জল-বায়ু প্রীতিপ্রদ, প্রচুর শস্য-সম্ভার, ফল-ফুল ও শাক-সব্জীতে সকল ক্ষেত্রই যেন সমাচ্ছাদিত। এখানে ত্রিশটী বৌদ্ধবিহার বা মঠ প্রায় তিন সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুগণে পরিপূর্ণ ছিল, এবং শতাধিক হিন্দু মন্দির ও মঠে প্রায় দশ সহস্র সাধু-সন্ন্যাসী পূজারী ও তাহাদের শিষ্য-সেবক বাস করিত। এই মন্দিরশতকের মধ্যে বারানসীর মধ্যে মাত্র কুড়িটী এবং অবশিষ্ট নিকটস্থ গ্রামের অন্তর্গত ছিল।*

* Narrative of Fa-Hian, eoncerning his visit to Benares and Saranath. Extracted from the Foe Kaue Ki, by M. M. Remusat, Klaproth and Landresse. Paris 1836 Ch. XXXIV., pp. 304, 305. And Narrative of Hiouen-thsang. Translated by Dr. Shering from the " memoites surles coutrees Occi-

মহানুভব হিউয়েন্থ-সাংএর এই বর্ণনা হইতে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীপূর্ব্বে কাশীর কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা সুন্দররূপে পরিজ্ঞাত হইল।

বর্ত্তমান সময়েও কাশীর অবস্থা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও সৌন্দর্য্য-সমন্বিত। এখনও গঙ্গাবক্ষ হইতে দেখিলে কাশীনগরী প্রকৃতই যেন মর্ত্ত্যে স্বর্গপুরী বলিয়া মনে হয়! "মিঃ মেকলেও" বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "বাস্তবিক কাশী সর্ব্ব বিষয়েই এসিয়া খণ্ডের মধ্যে একটী প্রধান উল্লেখযোগ্য স্থান।" (Macauley on Warren Hastings.)

ডাঃ প্রাইম, একজন আমেরিকান পর্য্যটক কাশী দর্শন করিয়া বিমোহিত চিত্তে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "আমি অনেক স্থান দেখিয়াছি, ভারতের দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহরও দেখিয়াছি, কিন্তু কাশীর সেই ধারাবাহিক সৌন্দর্য্যরাশি দর্শনে হৃদয়ে কি যে এক অভিনব ভাব ও কল্পনার স্রোত প্রবাহিত করে, তাহা বাস্তবিক আমার বর্ণনাতীত। সেই সমুচ্চ মন্দির-চূড়া, সেই গগনস্পর্শী মিনারেট, সেই অগণ্য সোপানশ্রেণী-পরিশোভিত-গঙ্গাতট, সেই সংকীর্ণ পথের উভয় পার্শ্বে পঞ্চতল ষড়তল বিশিষ্ট অসংখ্য সৌধরাজ, আবার সেই

dentales de Hiouen-thsang" of M. Stanislas Julien, translator of the original Chinese Work. Vol. I., pp. 353-376.

সোপান ও পথগুলি সততই কেমন অদ্ভুত জনতাপূর্ণ, তাহার মধ্যে মধ্যে ভীষণদর্শন বিশ্বনাথের বৃষ ও অন্নপূর্ণার গাভীগুলি কেমন গম্ভীর ভাবে বিচরণ করিতেছে, কাহারও প্রতি যেন ভ্রূক্ষেপ নাই, চারিদিকে অগণ্য বানর অসঙ্কোচে লাফালাফি করিতেছে, যাত্রীর বস্ত্র ধরিয়া খাবার চাহিতেছে, বিস্তৃত পথে উষ্ট্র হস্তী একাগাড়ী নিরন্তর গমনাগমন করিতেছে, এই সকল প্রাচ্য-প্রদেশ-সুলভ দৃশ্যাবলী কাশীতে যেন একাধারে সন্নিবেশিত। যখন আমি নৌকারোহণে গঙ্গার বক্ষ হইতে ঘাটগুলি ও হিন্দু-স্থাপত্যের অদ্ভুত কলা-কৌশল লক্ষ্য করিতেছিলাম, বলিতে কি—তখন আমার মনে হইতেছিল, আমি বুঝি কোনও স্বপ্নরাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।" (Benares Guide Book PP. 14-15.)

ডাঃ প্রাইস, মিঃ মেকলে, ডাঃ সেরিং মহানুভব হিউয়েন্থ-সাং ও ফা-হিয়েন প্রভৃতির আধুনিক ও প্রাচীন কাশীর বর্ণনা হইতে কাশীর বিদ্যা ও বৈভব সম্বন্ধে যেমন বিবিধ বিষয় অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ কাশীর বর্ত্তমান ও প্রাচীন সহর সম্বন্ধেও এক নূতন কথা জানিতে পারা গিয়াছে, যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মহাত্মাই বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। এখন আমরা যে স্থানে সহরের এই গৌরবময় বিকাশ দেখিতেছি,

প্রাচীন সময়ে ঠিক এই স্থানেই কাশীরাজ্যের রাজধানী বা সহর প্রতিষ্ঠিত ছিল না—পুরাতত্ত্ববিদ্দিগের বর্ণনা ও বংশপরম্পরায় কাশীর অধিবাসী অনেক বৃদ্ধের মুখেও এখনও তাহা শুনিতে পাওয়া যায়।

কাশীরাজ্যের রাজধানী।

প্রাচীনকালে কাশীরাজ্যের রাজধানী বা সহর এবং কাশীতীর্থ উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত ছিল। রাজধানী ও তীর্থের এইরূপ পৃথক স্থান-নির্ব্বাচন আর্য্য-ঋষিদিগের যে প্রকৃতই দূরদর্শিতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যেও গ্রাম ও নগর আদি প্রতিষ্ঠার সম্বন্ধে সে বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। 'মানসার' প্রভৃতি স্থাপত্য-বেদানুমোদিত গ্রন্থাদির মধ্যেও সে কথা স্পষ্ট লিখিত আছে। যাহা-হউক কাশীসহর সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধানে যাহা জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাই নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কাশীর সেই প্রাচীন সহর বর্ত্তমানের এই সহর হইতে অনুমান দুই মাইল উত্তরে অবস্থিত ছিল। আমরা এক্ষণে যাহাকে কাশী, বারাণসী অথবা বেনারস একই স্থান বলিয়া বুঝিয়া থাকি, সেকালে

ঠিক তাহা ছিল না। তখন কাশীরাজ্য ও তাহার রাজধানী বর্ত্তমান সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে এবং কাশীক্ষেত্র বা বারাণসী পরস্পর পৃথক্ বলিয়া পরিচিত ছিল।

পূর্ব্বোল্লিখিত ফা-হিয়ান ও হিউয়েন্থ-সাং চীন পর্য্যটকদ্বয়ের কথা বোধ হয় পাঠকের স্মরণ আছে। প্রথম ব্যক্তি ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ৬২৯ হইতে ৬৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাশী পরিদর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়াও বেশ বুঝিতে পারা যায়। এক্ষণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট যাহাকে জেলা বেনারস (Dist. Benares) রূপে বিভাগ করিয়াছেন, পূর্ব্বে প্রায় তাহাই কাশীরাজ্য-রূপে পরিচিত ছিল, এবং সেই বিভাগের অধীশ্বর তখন কাশীরাজ নামে বিদিত হইতেন, মহাভারতাদি পাঠেও সে কথা অবগত হওয়া যায়। গীতার মধ্যেও সকলে দেখিতে পাইবেন যে, কুরুক্ষেত্রের মহারণে বীর্য্যবান্ কাশীরাজ পাণ্ডব-পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং কাশীরাজ সেকালে মহারাজ অফ্ বেনারস বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। এক্ষণে আমরা যাহাকে কাশীরাজ বলিয়া অভিবাদন করি, বস্তুতঃ তিনি কাশীরাজ নহেন, তিনি মহারাজ অফ বেনারস, কিন্তু এক্ষণে প্রকৃত বারাণসীরাজও তাঁহাকে

বলিতে পারা যায় না. কারণ বারাণসীর মধ্যে অতি অল্পস্থানই তাঁহার জমীদারীর অধীন। তিনি এক্ষণে জেলা বেনারসের অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রামের জমীদার মাত্র, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কৃপাপাত্র খেতাবী মহারাজ, তবে নানা কারণে, বিশেষতঃ বারাণসী-তীর্থের সম্মানেই অন্যান্য খেতাবী মহারাজ অপেক্ষা ইহাঁর সম্মান আছে।

বহু পূর্ব্বযুগে অন্ততঃ মহাভারতের যুগেও কাশী-রাজ্যের কতদূর বিস্তৃতি ছিল, ঠিক জানিতে পারা না যাইলেও পূর্ব্বোক্ত চান-পর্য্যটকদ্বয়ের বর্ণনা হইতে কাশীরাজ্যের পরিধি যে ৬৬৭ মাইল ছিল এবং তাহার রাজধানী বা সহর অনুমান তিন চারি মাইলমাত্র ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইংরাজ-চিহ্নিত জেলা বেনারেস, অধুনা ইউনাইটেড-প্রভিন্সের অন্তর্গত। ইহার উত্তরসীমা জোনপুর জেলা এবং গোমতী নদী, দক্ষিণে মির্জাপুর জেলা এবং কর্ম্মনাশা নদী যাহা বঙ্গ-বিভাগের অন্তর্গত আরা এবং সাহাবাদ জেলা হইতে ইহাকে পৃথক করিতেছে, পূর্ব্বে গাজীপুর জেলা এবং পশ্চিম সীমা এলাহাবাদ ও মির্জাপুর জেলা। এই নির্দ্দিষ্ট ভূভাগের পরিমাণ সম্ভবতঃ অধিক ছিল, কারণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেকালের পরিমাণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিমাণ হইতে অনেক বড় ছিল, কিন্তু সেকালের রাজধানী অপেক্ষা বর্ত্তমানের

কাশীসহর যে, অনেক বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে তাহা পূর্ব্বলিখিত পরিমাণ হইতেই জানিতে পারা যায়। এক্ষণে সেই প্রাচীন সহরের প্রকৃত স্থান নির্ণয় করিতে হইবে।

ফা-হিয়েন, সারনাথের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, কাশী সহরের অনুমান দুই মাইলের মধ্যেই উত্তর-পশ্চিম-কোণে সেই স্তূপ অবস্থিত, এবং হিউয়েন্থ-সাং বলিয়াছেন, কাশীরাজ্যের রাজধানী হইতে কিছু কম দুই মাইলের মধ্যে উত্তর-পূর্ব্বদিকে সেই স্তূপ ও মন্দির দেখিয়াছি। এক ব্যক্তি সহরের উত্তর-পশ্চিম এবং অন্য ব্যক্তি সহরের উত্তর-পূর্ব্ব বলিয়াছেন ; যিনি উত্তর-পশ্চিম বলিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা প্রায় সার্দ্ধদুইশত বৎসর পূর্ব্বে তিনি আসিয়াছিলেন, তখন সহর সারনাথ-স্তূপের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—এক্ষনে যথায় রাজঘাট বা কাশী-ষ্টেসন হইয়াছে, সেইস্থান হইতে বরুণার ধারে ধারেই তখন সহর ছিল। কর্ণেল উইলফোর্ডও বলিয়াছেন "the old city of Benares, north of the river Buruna," বরুণার উত্তর পার্শ্বেই প্রাচীন সহর অবস্থিত ছিল। (Asiatic Researches, vol. IIX., P. 199.) এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সহর হইতে সারনাথের দিকে সকল পথ-ঘাটই

প্রাচীন সহর ও গৃহাদির ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক-প্রস্তরে সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। খুবই সম্ভব ফা-হিয়েনের পরিদর্শনের পর—আড়াই শত বৎসরের মধ্যে কোনও দৈব দুর্ঘটনা দ্বারাই হউক বা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন হিন্দু ও বৌদ্ধ দিগের মধ্যে বিরোধ হইয়াই হউক সহরের পূর্ব্ব অংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর ক্রমে পশ্চিমদিকে নূতন সহরের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। যে সময় হিউয়েন্থ-সাং আসিয়া ছিলেন, তিনি সেই নব প্রতিষ্ঠিত সহরই তখন দেখিয়া থাকিবেন এবং সেই কারণ তাহারই উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সারনাথের স্তূপ ও সঙ্ঘারামের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

কথিত আছে, বানার নামক একজন মহা প্রতাপান্বিত রাজা কাশীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, (Benares Illustrated.) কেহ কেহ বলেন তাঁহারই নামানুসারে কাশী রাজধানীর নাম 'বানারস' হইয়াছে। সে যাহা হউক, তাঁহার সময়েও যে, সহর রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেই ছিল, কাশীর বহু প্রাচীন অধিবাসীর বংশধরের মুখে এ কথা এখনও শুনিতে পাওয়া যায়। হোসেন-নিজামীর ইতিহাস হইতেও জানিতে পারা যায় যে, ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজ জয়চাঁদ কাশীর অধীশ্বর ছিলেন, (Murrey's Hand-Book,

Bengal. P. 204) তাঁহার দুর্গও রাজঘাটের নিকট ছিল এবং সেই কারণ গঙ্গার ঐ ঘাটটী এখনও রাজ-ঘাট বলিয়া পরিচিত। সেই অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকা ও ইষ্টক-স্তূপ এখনও প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে নিঃসন্দেহেই জানা যাইতেছে যে, রাজঘাট হইতে বরুণার ধারেধারেই কখন পূর্ব্বে এবং কখন বা পশ্চিমে সেই সহর অবস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত আর এক কথা আছে, তাহাতেও সহর যে, ঐ দিকেই ছিল তাহা প্রমাণিত হইবে।

বুদ্ধদেব যখন ভারতের প্রচলিত-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় মত প্রচার করিবার মানসে গয়া হইতে এস্থানে উপস্থিত হন, তখন তিনি যে, সহর ছাড়িয়া বা ভারতের ধর্ম্মচক্র-পরিচালক কাশী-বাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদিগের সম্মুখীন না হইয়া দূরে নির্জ্জন পল্লীর মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তাহা হইলে তাঁহার গয়া পরিত্যাগ করিবারই বা আবশ্যকতা ছিল কি? তিনি যে, কাশী সহরের অন্তর্গত অথবা তাহারই প্রান্তভাগে নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেও বরুণার উত্তর অংশে কাশী রাজ্যের

রাজধানী বর্ত্তমান ছিল। এই আধুনিক সহর, বিশ্বনাথের রাজধানী পঞ্চক্রোশী-বারাণসী, তখন নির্জ্জন বা কেবলমাত্র সাধু-সন্ন্যাসী-সেবিত তপোবন-স্বরূপ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞভূমি ও তীর্থরাজরূপে বিরাজিত ছিল। আশ্রম-পীড়াকর ও তপোবিঘ্নকর সহরের সে অবিরাম কোলাহল এখানে আদৌ প্রবেশ করিত না। কাশীরাজ্যের অধিরাজগণও মুনি ঋষি-দিগের শান্তিতে সাধন ভজন করিতে দিবার জন্যই সতত: দূরে সহর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন। কেবল বিশ্বনাথ-দর্শনাভিলাষী যাত্রীগণ সময় সময় বারাণসী মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিশ্বনাথ দর্শন ও সাধুদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতেন।

এতদ্ব্যতীত যে কোনও প্রাচীন সহর, নগর বা গ্রাম দেখিলেও এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, কোন স্থলেই শ্মশান-স্থান গ্রামের মধ্যস্থলে বা তাহার অন্তর্গত নির্দ্দিষ্ট নাই। সকল স্থলেই গ্রাম হইতে বহুদূরে কোন নির্জ্জন নদীতটে অথবা বিশাল প্রান্তর-প্রান্তে শ্মশান দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং মহাশ্মশান মণিকর্ণিকা কিম্বা হরিশ্চন্দ্র-ঘাট কখনই সহরের অন্তর্গত ছিল না। বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গৃহিত হরিশ্চন্দ্র-ঘাটের চিত্র দেখিয়াছি, পনের ষোল বৎসর পূর্ব্বে স্বচক্ষে হরিশ্চন্দ্র-ঘাট দেখিয়াছি, নিকটে তেমন কোনও

বাসভবন ছিল না, তখনও শ্মশানের গাম্ভীর্য্য ও ভীষণতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কিন্তু এই কয় বৎসরের মধ্যেই গঙ্গাতীরে দক্ষিণাভিমুখে অসিসঙ্গম-সমীপে এত দ্রুত ঘন-পল্লীরূপে লোকের বসবাস হইতেছে যে, কাশীর ভূমি কলিকাতার ন্যায় দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক এই শ্মশানদ্বয় দেখিয়াও বেশ অনুমান করা যাইতে পারে যে, এইস্থানে কখনই কোন গৃহী লোক স্ত্রী পুত্র কলত্রাদি লইয়া বাস করিতেন না। বিশেষ শাস্ত্রীয় প্রমাণ আছে যে, বিশ্বনাথের অন্তর্গৃহীক যাত্রার মধ্যে বাস করিতে নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহা সত্বেও আজকাল অন্তর্গৃহীর মধ্যেই লোকের বসবাস অধিক—এখন সকলেরই সাধ বিশ্বনাথের নিকট, গঙ্গার নিকট একটী বাড়ী পাইলেই ভাল হয়, তাহা হইলে নিত্য গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন হয়। এই উদ্দেশেই ক্রমে বিশ্বনাথ-সমীপবর্ত্তী স্থানসকল জনতাপূর্ণ হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। এখন কাশীবাসী জনগণ প্রকৃত কাশীর আদিম অধিবাসী নহেন, সকলেই ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্ত হইতে আগমন করিয়া এখানে বাস করিতেছেন। এবং এক এক প্রান্তীয় হিন্দু পরস্পর আত্মীয়তা-সূত্রে এক এক মহল্লা বা পল্লী করিয়া লইয়াছেন। বাঙ্গালীরা বাঙ্গালী টোলা, নেপালীসকল নেপালীখাপরা ও রামঘাট,

পাঞ্জাবীরা লহরীটোলা, মহারাষ্ট্রী পঞ্চগঙ্গা ও রামঘাট, মাদ্রাজীরা কেদারঘাট প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই সকল স্থানে এখন প্রবেশ করিলে মনে হয়, যেন আমরা পল্লীবাসী সেই সেই প্রদেশেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। যাহা হউক অন্তর্গৃহীক ও পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন সময়ে সহর এই স্থানে ছিল না।

বারাণসী।

'বারাণসী' এই শব্দের মূল অন্বেষণ করিতে যাইয়া অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্র হইতে তাহার এত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাহাতে অমূলক বা মাত্র প্রবাদসমূহ আদৌ শুনিতেই ইচ্ছা হয় না। প্রথমতঃ 'বারাণসী' শব্দের শব্দার্থ ধরিয়া অধ্যাপক উইলসন্ তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে 'বর' শব্দের উত্তর 'অনস্' প্রত্যয় যোগে বারাণসী সিদ্ধ হয়, এইরূপ বলিয়াছেন এবং 'বর' অর্থে শ্রেষ্ঠ বা পবিত্র এবং 'অনস্' অর্থে অপ্ বা জল অর্থাৎ পবিত্র জল অথবা পতিতপাবনী গঙ্গা; তাহারই তীরে অবস্থিত

বলিয়া তীর্থরাজ বারাণসী নামে কল্পিত হইয়াছে।
(Murry's Hand-Book of Bengal. P. 203.)

পতঞ্জলীর 'মহাভাষ্য, বিষ্ণুপুরাণ, বামনপুরাণ প্রভৃতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বরুণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী উত্তর-প্রবাহিতা গঙ্গাতটস্থিত ভূভাগ অবিমুক্ত বারাণসী নামে খ্যাত। পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণ-কাশী-খণ্ডেও ঐ কথা লিখিত আছে।

বারাণসীতি যৎখ্যাতং তন্মানং নিগদামিবঃ।
দক্ষিণোত্তরযোর্ণদ্যো বরণাসিশ্চ পূর্বতঃ॥

*　　　*　　　*

দক্ষিণোত্তরদিগ্‌ভাগে কৃত্বাসিং বরুণাং সুবাঃ।
ক্ষেত্রস্য মোক্ষনিক্ষেপ রক্ষারিবৃতি মায়যুঃ॥

বরুণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী স্থানই বারাণসী ক্ষেত্র বা তীর্থ। এই বরুণা বা অসি সম্বন্ধে বামনপুরাণে (৩।২৪।২) ভগবান্ বিষ্ণু বলিতেছেন, "এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রয়াগ-তীর্থে আমার অংশসম্ভূত যোগশায়ী নামে যে বিখ্যাত বিরাট অব্যয় পুরুষ নিরন্তর বাস করিতেছেন, তাঁহারই দক্ষিণ চরণ হইতে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী শুভঙ্করী বরুণা এবং বাম পদ হইতে অসি নামক নদীদ্বয় নিসৃত হইয়াছে। এই দুই নদীর মধ্যে যোগশায়ী মহাদেবের সর্ব্ব পাপবিনাশক ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ যে তীর্থক্ষেত্র বিরাজিত, তাহারই নাম অবিমুক্ত

বারাণসী। রামায়ণ, মহাভারত ও উপনিষদাদি আর্য্য-শাস্ত্রের সকল স্থানেই এই একই কথা লিখিত রহিয়াছে। তবে কোন কোন উপনিষদ ও তাহার টীকাকার (শঙ্করানন্দ প্রভৃতি) 'বরুণা ও অসি' না বলিয়া 'বরুণা ও নাশী' বলিয়াছেন। জাবালোপ-নিষদে লিখিত আছে—"এই স্থানে জীবের মৃত্যু হইলে স্বয়ং রুদ্র তাহাকে তারকব্রহ্ম নাম শুনান, সেই কারণ জীব অমৃতত্ব লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রে সতত বাস করা কর্ত্তব্য, ইহা পরিত্যাগ করা কোন মতেই উচিত নহে। হে যাজ্ঞ-বল্ক, আমি যাহা বলিলাম, তাহা সত্য বলিয়া জানিবে। সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বরুণা ও নাশীর মধ্যে অবস্থিত। সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত দোষসমূহ নিবারণ করে বলিয়া একের নাম বরুণা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়কৃত পাপরাশি নাশ করে বলিয়া অপরের নাম নাশী হইয়াছে।" কেহ কেহ বলেন প্রাচীন বৈদীক-যুগে 'নাশী' নামই প্রচলিত ছিল, পৌরানিক যুগে উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অসি বা অসী হইয়াছে। আবার কেহ কেহ উহার আধ্যাত্মিক ভাবে বরুণা অর্থাৎ পিঙ্গলা এবং অসী অর্থাৎ ইড়া, ইহাদের মিলনে বারাণসী হইয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন। স্থূলতঃ বরুণা ও অসির মিলনে বারাণসী ইহাই সর্ব্ববাদি সম্মত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে এই,

বারাণসীই সেকালে কাশীপুরী বা কাশীতীর্থ ছিল। 'দশকুমার চরিত্র' ও 'রামায়ণ উত্তরকাণ্ডে' কাশীপুরীকেই বারাণসী বলা হইয়াছে।

বারাণসীর স্থান-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আর্য্য-ঋষিগণের জ্ঞান, গভীর গবেষণা ও সূক্ষ্মদর্শিতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ভারতখণ্ডের মধ্যে পবিত্র গঙ্গাতটে এমনই এক অদ্ভুত স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন, যথায় ভগবতী ভাগিরথী হিমগিরি হইতে প্রবলবেগে বিনির্গতা হইয়া দক্ষিণ সাগরাভিমুখে সমতল আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশ ধীরে ধীরে অতিক্রম করিবার সময়, কি জানি কি চিন্তা করিয়া, একবার উত্তরদিকে নিজ পিত্রালয়ের প্রতি ফিরিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্মুখেই নিজপতি কাশীশ্বর বিশ্বনাথকে এবং তদ্‌সহ চতুর্দ্দিকে পুষ্পাঞ্জলি-হস্তে ভক্ত সন্তানমণ্ডলীকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বুঝি মা আমার, সে অভিলাষ পরিত্যাগ করিলেন; তাই সাধ্বী, পতি-চরণতল স্পর্শ করিয়া পতিতপাবনী পূত-সলিলা পাপীকুলের উদ্ধারমানসে পুনরায় পূর্ব্ব পথেই চলিতে লাগিলেন। মায়ের সেই উত্তর-প্রবাহ, এই কাশীতলে এখনও বিরাজিত রহিয়াছে। গঙ্গার এরূপ অভিনব প্রবাহ ভারতের আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না! কেবল পিতৃক্রোড়েই পিতা মাতাকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য বুঝি মা আমার উত্তরাখণ্ডে উত্তর

কাশীতে সেই একবার উত্তরাভিমুখী হইয়াছিলেন, আর সমতলভূমিতে আসিয়া এই একবার। আর্য্য-ঋষিগণ মায়ের কৃপায় বারাণসীক্ষেত্রের জন্য প্রকৃতই এই অতুলনীয় স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন। বারাণসী অসি ও বরুণার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গাতটস্থিত এক অমুন্নত পার্ব্বত্যভূমির উপর অবস্থিত। সেই কারণ অন্যান্য স্থানের ন্যায় গঙ্গার এই তটভূমি কখনও গঙ্গা-গর্ভ-গত হইতে পারে নাই। সেই আদিকাল হইতে এখনও সমান ভাবে একই স্থানে ইহা স্থির হইয়া আছে। বর্ত্তমান কাশী-সহরের উচ্চ-নিম্ন অসমতল পথ-ঘাট দেখিলে এখনও তাহা বেশ উপলব্ধি করিতে পারা যায়, এ বিষয় পাশ্চাত্য সুধিমণ্ডলীও লক্ষ্য করিতে বিস্মৃত হন নাই। মহানুভব "কেন্" বলিয়াছেন, "বারাণসী-তীর্থ উক্ত গঙ্গাতটে জল-তল হইতে প্রায় শত ফুট উচ্চ এক পর্ব্বত-চূড়ার উপর চিত্রিতবৎ শোভিত রহিয়াছে। ভারতে এমন সুন্দর সহর আর দ্বিতীয় নাই।" এতদ্ব্যতীত প্রবাদ আছে, বারাণসীমধ্যে কখনও ভূমিকম্প হয় না। ইহাও ঋষিদিগের সাধারণ দূরদর্শীতার কথা নহে! প্রকৃত পক্ষে বারাণসীর জন্য এরূপ স্থান নির্ব্বাচন, তাঁহাদের গভীর গবেষণার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। একাল পর্য্যন্ত বারানসী বা কাশী-ক্ষেত্রমধ্যে ভূমিকম্পের তীব্রতা কখনও অনুভূত হয়

নাই। সিস্‌মোগ্রাফ-যন্ত্র সাহায্যেও অতি ক্ষীণ ও ধীর আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। এই সকল নানা কারণেই বারাণসীকে ভারতের তীর্থরাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীরাজ্যের নৃপতিবৃন্দ।

কাশীরাজ্যের নৃপতিবৃন্দের ধারাবাহিক কোনও প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না; তবে বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রের মধ্যে বহু নৃপতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্ব প্রথম ঋগ্‌বেদে ও আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে দিবোদাস ও প্রতর্দ্দনের বিষয় জানিতে পারা যায়। অনন্তর পরবর্ত্তী অন্যান্য শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতর্দ্দন আবার দিবোদাসের পুত্র, ইহাঁরা কাশীরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। কাত্যায়ন তাঁহার ঋগ্‌বেদ অনুক্রমণিকায় দ্বিতীয় ব্যক্তিরই নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে দুইজন দিবোদাসের বিষয় বর্ণিত আছে। ;একজন হর্য্যশ্ব বা বধ্র্যাশ্বের সন্তান এবং অন্য ভীমরথের সন্তান, ইনিই প্রতর্দ্দনের পিতা কাশীরাজ বলিয়া পরিচিত; কিন্তু

অনেক ইংরাজ পণ্ডিত মনে করেন হর্য্যশ্ব বা বধ্র্যাশ্ব ও ভীমরথ একই ব্যক্তি হইবেন। (English Vishnu-Purana, Vol. IV, PP, 33 and 145, 146,) মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব হইতেও এরূপ জানিতে পারা যায়।

পুরাকালে আয়ুবংশীয় সুহোত্র-পুত্র কাশ নামক কোন এক গণ বা দেবতা হইতেই কাশীর ক্ষত্রিয় রাজাবলীর আরম্ভ হইয়াছিল। সেই বংশেই ক্রমে কাশ্য, রাষ্ট্র, দীর্ঘতপা, ধর্ম্ম, ধন্বন্তরি, কেতুমত, ভীমরথ ও দিবোদাস প্রভৃতি প্রধান প্রধান নৃপতিবৃন্দ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীরাজ্য পরিচালনা করিয়া ছিলেন।

মহারাজ ধন্বন্তরি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট চিকিৎসা-শাস্ত্র বা আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আয়ুর্ব্বেদকে আট ভাগে বিভক্ত করেন। সেই কারণ তিনি বৈদ্য নামে প্রসিদ্ধ হন; এবং আয়ুবংশসম্ভূত ধন্বন্তরি এই বেদের প্রচারক বলিয়া বোধ হয় চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ আখ্যায় পরিচিত হইয়াছে। দেবাদিদেব শঙ্কর আয়ুর্ব্বেদের আবিষ্কারক—তাঁহার পরম প্রীতিপ্রদ স্থান কাশী হইতেই শঙ্করাদেশে মহারাজ ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক ইহার প্রচার হইয়াছে। এই বংশে পরে কেতুমতাদি রাজন্যবর্গ জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীর অধিপতি হন। এই সময় হৈহয়পুত্রগণ কাশীরাজের সহিত বিবাদ

করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। তাহাতে হর্য্যশ্ব নিহত হন। অনন্তর সুদেব সিংহাসনারূঢ় হন, কিন্তু তিনিও হৈহয়গণকর্ত্তৃক নিহত হইলে উক্ত বংশের একমাত্র বংশধর দিবোদাসই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

"দিবোদাস ইতিখ্যাত বারাণস্যাধিপো ভবেৎ।"

দিবোদাস বারাণস্যাধিপ হইয়া বোধহয় বারাণসীর অন্তর্গত বরুণার নিকট কাশীরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়া শত্রুভয়ে তাহা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে, হৈহয়গণ কাশীরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় হৈহয়বংশীয় নৃপতি ভদ্রশ্রেণ্যই বারাণসী অধিকার করিয়াছিলেন, পরে দিবোদাস তাহাকে বিনাশ করিয়া পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। নিকুম্ভের অভিশাপে ও ক্ষেমক-রাক্ষসের উৎপাতে এই সময় বারাণসী হতশ্রী ও জনশূন্য হইলে, দিবোদাস গোমতীতটে এক নগর সংস্থাপিত করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। হৈহয়বংশীয় ভদ্রশ্রেণ্যের শিশুপুত্র দুর্দ্দম ক্রমে বর্দ্ধিত ও পরাক্রান্ত হইয়া পিতৃহন্তা দিবোদাসকে পরাজিত করতঃ বারাণসী পুনরাধিকার করেন। কিন্তু দিবোদাস ও দৃষদ্বতী বা মাধবীর গর্ভে প্রতর্দ্দন নামে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তিনি কালে মহা পরাক্রান্ত হইয়া দুর্দ্দমকে পরাজিত করিয়া পুনরায় কাশীরাজ্য

নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ইনি যেমন প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন, সেইরূপ স্বধর্ম্ম পরায়ণ ও পরম যাজ্ঞিক বলিয়া উপনিষদাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। রামায়ণ উত্তরকাণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, ইনি অযোধ্যাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। ইহাঁরই পুত্র বৎস—ঋতধ্বজ ও কুবলয়াশ্ব নামে পরিচিত হন। পরম জ্ঞানশীলা তত্ত্বদর্শিনী মদালসা এই কুবলয়াশ্বের সহধর্ম্মিনী ছিলেন। মহা বীর্য্যবান মহারাজ অলর্ক ইহাদের পুত্র, ইনিই ক্ষেমক-রাক্ষসকে বিনষ্ট করিয়া বারাণসীকে সুশোভিত করেন। তাঁহার পর যথাক্রমে সন্নতি, সুনীথ, ক্ষেম, সুকেতু, ধর্ম্মকেতু, সত্যকেতু, বিভু, সুবিভু, সুকুমার, ধৃষ্টকেতু (ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন) বেণুহোত্র, ভর্গ ও ভার্গভূমি প্রভৃতি প্রাচীন কাশবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করেন। মৎস্যপুরাণে চতুর্বিংশতিজন কাশবংশীয় নরপতির উল্লেখ আছে। ভার্গভূমির পর কোন্ ব্যক্তি কাশীরাজ্য পরিচালিত করেন, তাহার কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার পর সেই প্রাচীন রাজবংশের প্রভাব বিনষ্ট হইয়া থাকিবে। অনন্তর হৈহয়বংশীয় অষ্টবিংশতি ব্যক্তি কাশীর রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। ইহাদের পর প্রদ্যোৎবংশীয় নরপতিগণ ১৩৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে শিশুনাগ ইহাদিগকে

নিহত করিয়া তৎপুত্র যশকে বারাণসীতে অভিষিক্ত করিয়া গিরিব্রজে গমন করেন। বুদ্ধদেবের সময় ইনিই কাশীর মহা পরাক্রান্ত অধিপতি ছিলেন। ভগবান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইনি কাশীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের বিপুল সহায়তা করিয়াছিলেন।

জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়—৭ম তীর্থঙ্কর ভগবান সুপার্শ্ব মহারাজ প্রতিষ্ঠের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া কাশীতে জৈন-ধর্ম্মের প্রথম প্রচার করেন। সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠ-রাজের নামানুসারেই কাশী-রাজ্যের অন্যতর রাজধানী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকিবে। তদনন্তর খৃঃ পূঃ প্রায় ৮০০ অব্দে কাশী-পতি অশ্বসেনের ঔরসে ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ দেব জন্ম গ্রহণ করেন। তখন কাশীতে জৈনধর্ম্মের বেশ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাঁহার নির্ব্বাণলাভের প্রায় দুইশত বৎসর পরে মহামুনি শাক্যসিংহ বারাণসীতে পদার্পণ করেন।

বিম্বসর-পুত্র মহারাজ অজাতশত্রুর রাজত্বকালে কাশীরাজ্য-পরিচালক নরপতিগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বোক্ত প্রতিষ্ঠান নামক রাজধানীতে থাকিয়া রাজ-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্বে ৩৯০৫-৩৯১৮ শ্লোকের পাঠানুসারে জানিতে পারা যায়, মহারাজ পুরুর পূর্ব্বে

মহারাজ নহুষাত্মজ যযাতি কাশীরাজরূপে রাজধানী প্রতিষ্ঠানে রাজত্ব করিতেন।

"ত্রিদিবং স গতো রাজা যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
পুরুশ্চকার তদ্রাজ্যং ধর্ম্মেণ মহতাবৃতঃ।
প্রতিষ্ঠানে পুরবরে কাশীরাজ্যে মহাযশাঃ।

কথা-সরিৎ-সাগর পাঠেও জানা যায়, প্রতিষ্ঠান কাশীরাজ্যের রাজধানী ছিল।

বৌদ্ধ আধিপত্যসময়ে বহু রাজা কর্ত্তৃক কাশীরাজ্য শাসিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম 'ভীমশুক্ল', ইনি একজন মহা প্রতাপশালী নরপতি ছিলেন। (Der Budhisims translated from the Russian of Professor Wassiljew, Part 1, P. 54.)

কেহ কেহ দিবোদাসকে বৌদ্ধ রাজা বলেন। বোধ হয় পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী দিবোদাস নামে কোনও স্বতন্ত্র রাজা হইয়া থাকিবেন।

মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের সময় অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে কাশীরাজ্য পাটলিপুত্রের অধীন হইয়াছিল। তৎপুত্র প্রিয়দর্শী অশোক সারনাথে বহু স্তূপ ও বুদ্ধদেবের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। অশোকের পর তদীয় পৌত্র দশরথের সময় জৈন আজীবকগণের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। অনন্তর

ক্রমান্বয়ে চৌরাশিহাজার রাজা কাশীর রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া ছিলেন, 'দিপবংশে' এইরূপ বর্ণিত আছে (Journal of the Asiatic Society of Bengal, for 1838, P, 927,)

মৌর্য্যরাজাদিগের রাজত্বকালে কাশীরাজ্য পাটলিপুত্রের অধীনে ছিল। শুঙ্গমিত্র ও কাণ্বায়ন দিগের সময় বারাণসীতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়। মহারাজ অগ্নিমিত্র এই সময় অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া সনাতন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গৌরব উদ্ধারে যত্নবান হইয়া ছিলেন।

চীন-পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাং, ভারতে আসিবার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গুপ্ত সম্রাট বালাদিত্য নরসিংহগুপ্ত কাশীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময় হূণপতি তোরমাণ্ ও মিহিরকুল ভারতাক্রমণ করেন। মালবপতি যশোবর্ম্মার সাহায্যে মহারাজ বালাদিত্য হূণাধিপ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়া ছিলেন। তিনি শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী সকল সম্প্রদায়কে সমান ভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার পুত্র প্রকটাদিত্য কিছুকাল কাশীর অধীশ্বর ছিলেন। তাঁহার সময়ে সারনাথেও হিন্দু দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলিয়া ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে সম্রাট হর্ষবর্দ্ধন কাশীর অধিশ্বর ছিলেন। তৎপরে পুনরায় মগধের রাজারা কিছুদিন কাশীর নৃপতি হয়েন। অষ্টম শতাব্দীতে কান্যকুব্জাধিশ্বর যশোবর্ম্মা মগধাধিপকে পরাজিত করিয়া কাশীরাজ্যকে কনোজ-রাজ্যভুক্ত করিয়া ছিলেন। তাঁহার যত্নে কান্যকুব্জ ও কাশীধাম বৈদিকাচারের কেন্দ্রস্থান-রূপে পরিণত হইয়াছিল। ইহার পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র ও পৌত্র—চক্রায়ুধ ও ইন্দ্রায়ুধ কনোজের অধিপতি হন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন না। ইন্দ্রায়ুধের সময় পালবংশীয়গণ প্রবল হইয়া উঠেন। ধর্ম্মপাল কিছু কালের জন্য কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত জয় করিয়া ছিলেন। ভোজ ও তাঁহার বংশধর এই পাল উপাধি-ধারী রাজাগণ বারাণসী ও শ্রাবস্তীর মধ্যে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া বারাণসীক্ষেত্রে বহু দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এসিয়াটিক রিসার্চের পঞ্চমখণ্ডে এক প্রস্তর খোদিত শাসনলিপির উল্লেখ আছে—সেখানি ১৭৯৪ খৃঃ বেনারাসের মধ্যেই সারনাথগর্ভের কোন স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে। তৎপাঠে জানা গিয়াছে, গৌড়-রাজগণও কিছুদিন কাশীরাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থিরপাল ও বসন্তপালের

পিতা মহীপালের রাজত্বকাল ১০৮৩ বিক্রম অব্দে বা ১০২৬ খৃঃঅব্দে শেষ হয়। এই প্রস্তর-ফলক খানির খোদিত অক্ষরগুলি অতি জীর্ণ হইয়া ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই কারণ কোনও কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ উহার লিখিত কাল সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে আরও প্রাচীন সময়ে ইহাঁরা কাশী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশীরাজ্য রাষ্ট্রকুট-বংশীয় গাহড়বাল নৃপতিগণের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহাদের যত্নে বহু হিন্দু দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

মোসলমান ঐতিহাসিক দিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মোসলমান-আধিপত্য সময়ে বেনারস এবং তন্নিকটস্থ প্রদেশসমূহ কনোজের অধীনরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; এবং কনোজের শেষ রাজা মদনপাল হইতে জয়চন্দ্র পর্য্যন্ত বেনারসের রাজত্ব করিয়া ছিলেন।

হোসেন নিজামীর ইতিহাস এবং Colonel Briggs's translation From Farishta, vol. I., P. 179. হইতে জানিতে পারা যায় যে, "সিহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন কর্ত্তৃক ১১৯৪খৃঃ-অব্দে কাশীরাজ্যের অধিশ্বর মহারাজ জয়চাঁদ পরাভূত ও নিহত হইয়াছিলেন। কুতব সেই সময় নগরের মধ্যে

প্রবেশ করিয়া সহস্রাধিক মন্দির ও মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তি নষ্ট করিয়া ছিল। সেই মন্দিরাদির ইষ্টক ও প্রস্তরগুলি লইয়া সেই সকল স্থানে মস্‌জিদ্ প্রস্তুত করাইয়া ছিল। এই সময় হইতে কাশীরাজ্য মোসলমান রাজাদিগের দ্বারা শাসিত এবং এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র অনাদি-লিঙ্গ ও দেববিগ্রহ-ধ্বংসকারী কুতবের কিঞ্চিৎ পরিচয় এই স্থলে দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছি, কারণ বোধ হয় অনেকেই কুতবের প্রকৃত পরিচয় অবগত নহেন। কুতব মোসলমান ঔরসজাত খাঁটী মোসলমান নহে। তাহার প্রকৃত নাম রামপ্রসাদ, পাঞ্জাব প্রদেশ-বাসী একজন অতি নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয়-সন্তান। গজনীপতি সিহাবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরী কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া প্রথমে তাঁহার গোলামরূপে নিযুক্ত হয়, পরে বাধ্য হইয়া মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর কুতবুদ্দিন নাম ধারণ করে। ক্রমে নিজ কার্য্যে দক্ষতা দেখাইয়া সম্রাটের অতি প্রিয়-পাত্র হইয়া উঠে ও তাঁহার প্রধান সেনাপতিরূপে ভারতের নানা প্রদেশ জয় করিয়া সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লীর শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত হয়। এই সময় অযোধ্যা, প্রয়াগ ও কাশীধাম পর্য্যন্ত কুতব নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিল। প্রবাদ আছে, কুতব সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী নিষ্ঠাবান আর্য্যবংশ-সম্ভূত হইয়াও কোন্ পাপে মোসলমান ধর্ম্ম

গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, নিজে তাহার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া মূর্খ, দেব-দ্বিজের উপর ক্রুদ্ধ হইল ও তাহার ধ্বংস সাধনে মনোনিবেশ করিল। বোধ হয় কুতব মোসলমান ঔরসজাত প্রকৃত মোসলমান হইলে এতাধিক অত্যাচার করিতে পারিত কিনা সন্দেহ! কেবল কুতবই যে এই পথ অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা নহে, তাহার পরবর্ত্তী আরও কয়েকজন কাশীর যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়াছে। তন্মধ্যে দিল্লীর সম্রাট বেলোল-লোদীর সেনাপতি 'মহম্মদ ফর্ম্মুলি' বা প্রসিদ্ধ 'কালা-পাহাড়' অন্যতর। কুতবের পর এক এই কালাপাহাড় হইতে হিন্দুর যে অনিষ্ট হইয়াছে, বোধ হয় এ পর্য্যন্ত সমস্ত মোসলমানের সকল অত্যাচার একত্র করিলেও তাহার সমান হইবে না। কুতবের ন্যায় এটীও গৃহের শত্রু বিভীষণ—এটির পরিচয় বঙ্গীয় পাঠকগণের আরও জানিবার বিষয়, কারণ এটী আমাদের খাস বাঙ্গালার কুলাঙ্গার। ইহার প্রকৃত নাম কালাচাঁদ রায়। বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-শ্রেণীভুক্ত একটাকিয়ার ভাদুড়ী-রাজা জগদানন্দের বংশজাত। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত থান্দা থানার অধীন বীরজাওন গ্রামে তাহার জন্ম-স্থান। অল্প বয়সেই পিতার মৃত্যুহইলে মাতামহ কর্ত্তৃক কালাচাঁদ লালিত-পালিত হইয়া তৎকাল-প্রচলিত বাঙ্গালা ও পারসি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিল।

কালাচাঁদ বাল্যকাল হইতে বেশ বলবান, শস্ত্র-চালনায় ও অশ্বারোহণে বিশেষ পটু ছিল। শ্রীপুরনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুইকন্যার পাণিগ্রহণ করিবার দুই বৎসর পরে, গৌড়-সম্রাটের অধীনে ফৌজদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। পরে দৈব-দুর্ব্বিপাকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্বে সম্রাট-কন্যার পাণিগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিল, কিন্তু পরে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াও সমাজে পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারিয়া; মনের দুঃখে পুরী-জগন্নাথ দেবের নিকট সপ্তাহকাল অনাহারে ধরণা দেয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কোনও প্রত্যাদেশ না পাইয়া অধিকন্তু পাণ্ডাগণের কর্ত্তৃক অযথা তিরস্কৃত হইয়া কালাচাঁদ ক্রোধান্ধ হইল ও মোসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, পরে নিজ শ্বশুর গৌড়-সম্রাটের অনুমতি লইয়া উড়িষ্যা-বিজয় করে এবং জগন্নাথ-বিগ্রহ দগ্ধ করিয়া পাণ্ডা-দিগকেও জোর করিয়া মোসলমান করিতে থাকে। তাহার অত্যাচারে লোকে তাহাকে বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া 'কালাপাহাড়' বলিত। যে যে স্থানে কালাপাহাড় গিয়াছিল, সেই সেই স্থানেরই দেব-বিগ্রহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের এমন স্থান নাই, যথায় কালাপাহাড় হিন্দুর অনিষ্ট করে নাই। বার্ব্বাকসাহ যখন জৌনপুরের অধি-পতি; তখন বেলোললোদী দিল্লীর সম্রাট ছিলেন,

উভয়ের মধ্যে সাতাইশ-বর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ চলিতেছিল। বার্ব্বাকসাহ বাঙ্গালার অদ্বিতীয় বীর কালা-পাহাড়ের অতুল বিক্রমের কথা শুনিয়া তাহাকে নিজ সেনাপতি করিতে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু পথিমধ্য হইতে বেলোললোদী কর্ত্তৃক কৌশলে বন্দীকৃত হইয়া দিল্লীতে নীত হইলে, তথায় সম্রাট কর্ত্তৃক অতি সমাদরে গৃহীত ও অল্প দিনের মধ্যে সম্রাটের বিশেষ অনুরোধে তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে। তাহার পর শ্বশুরের সহিত যাইয়া জৌনপুর সাম্রাজ্য অধিকার করে। এই সময় শ্রীক্ষেত্র ও কামরূপের ন্যায় কাশীধামেরও হিন্দু ধর্ম্ম এককালে লোপ করিবার প্রয়াসে প্রভূত অত্যাচার করিয়াছিল। কোনও প্রাচীন মন্দিরই তাহার নিষ্ঠুর করে রক্ষা পায় নাই। এই সময় কালাপাহাড়ের এক মাতুলানী কাশীবাস করিতেন। চরম অত্যাচার-উপলক্ষে একজন দুষ্ট যবন তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করে। তিনি ঘৃণা, দুঃখ ও ক্রোধে রোদন করিতে করিতে কালাপাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে যৎ-পরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন ও তাহার সম্মুখে সেই স্থানেই আত্মহত্যা করিলেন। কালাপাহাড় স্বচক্ষে এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া তখনই অত্যাচার বন্ধ করিতে আদেশ করিল। আদেশমাত্র অত্যাচার তখনই বন্ধ হইল সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে বারাণসীর সকল দেবালয়ই

বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, কেবলমাত্র কেদারেশ্বর অনাদি শিবলিঙ্গটী তখন রক্ষা পাইল। এদিকে কালাপাহাড়, সেই রাত্রেই কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইল, পরে আর কেহই তাহার সন্ধান পায় নাই।

এত অত্যাচারেও এক হিসাবে কাশীর সেরূপ কোনও ক্ষতি হয় নাই; তাহার কারণ—মোসলমানগণ বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহার ধর্ম্ম-মতের প্রতি এমন বিশেষ লক্ষ্য করে নাই, যাহাতে সে সনাতন মতের কিছু মাত্রও পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সে কালে বারাণসী ও তাহার সহর সেরূপ রাজনৈতিক বা বাণিজ্যবহুল স্থান বলিয়াও প্রসিদ্ধ ছিল না।

তৎপরে অওরঙ্গজেব নিজ রাজত্ব সময়ে বিশ্বেশ্বরের সেই প্রাচীন পবিত্র মন্দির অতি বর্ব্বরের ন্যায় ধ্বংস করিয়া তাহারই উপরে এক মসজিদ্ নির্ম্মাণ করে এবং 'বারাণসী' আর্য্যের এই প্রাচীন নাম 'মহম্মদাবাদে' পরিবর্ত্তিত করিতেও কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে নাই।

কুতবুদ্দিনের পর যে সকল মোসলমান নরপতি আর্য্যাবর্ত্ত শাসন করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই যে, দেবদ্বেষী ও মন্দির-ভঙ্গকারী ছিলেন, তাহা নহে; সুলতান বল্‌বন্ প্রভৃতি কোন কোনও সম্রাট যথেষ্ট সমদর্শী ছিলেন, অর্থাৎ হিন্দু ও মোসলমানকে সমান চক্ষেই দেখিতেন। সম্রাট আকবরের সময়েও কাশীব

অনেক উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহারই সহায়তায় জয়পুরাধিপতি মানসিংহ কর্তৃক শত শত দেবালয় ও স্নানমন্দির এই সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাদসাহ শাজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র সাহিত্যানুরাগী দারাসেকো কিয়ৎ কালের জন্য যখন কাশীতে অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে ছিলেন (তিনি সে সময়ে যে স্থানে অবস্থান করিতেন, তাহা এখনও 'দারানগর' বলিয়া প্রসিদ্ধ) তখন কাশীরাজ্যের একজন স্বতন্ত্র অধিপতি হওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কিছুকাল পূর্ব্বেই সে পুরাতন রাজবংশের এককালীন লোপ হইয়া গিয়াছিল। অনন্তর ১৭৩০ খৃঃ অব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহ কর্ত্তৃক ত্রিকর্ম্মা ব্রাহ্মণ দিগের দলপতি গঙ্গাপুরের জমিদার 'মনসারাম, রাজা উপাধি পাইয়া তাঁহারই অধিনে কাশীর রাজা মনোনীত হ'ন। কেহ কেহ বলেন মনসারাম কৌশল ও বিশ্বাস ঘাতকতায় নিজ প্রভু—নবাবের সর্ব্বনাশ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন। ইনি আট বৎসরকাল রাজত্ব করিবার পর ১৭৩৮ খৃঃ অব্দে পরলোকগত হ'ন।

মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিং ১৭৪০ খৃঃ অব্দে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নানা কৌশলে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে মহম্মদ

সাহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আহম্মদ সাহ, সফদরজঙ্গকে উজীরি ও অযোধ্যা প্রদেশ প্রদানকরেন। তখন কাশী-রাজ্য পুনরায় অযোধ্যা-সুবার অন্তর্গত হয়। কিন্তু বলবন্তসিং সুবাদার সফদরজঙ্গের অধীনতা স্বীকার না করিয়া অসীম সাহস ও ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে সফদরজঙ্গের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র সুজাউদ্দৌলাও বলবন্তের তেজ খর্ব্ব করিতে বিশেষ যত্নবান হ'ন। এই সময়েই রাজা বলবন্ত আত্মরক্ষার্থে রামনগরে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গলার নবাব মির্জাফরের সহিত পরস্পর বিপদের সময় সাহায্য করিবেন, এইরূপ তাঁহার সন্ধি হয়। ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে বাদসাহ সাহ আলাম কর্তৃক বারাণসী রাজ্য ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অর্পিত হইলে, ১৭৬৬ খৃঃ অব্দে উক্ত কোম্পানী সন্ধিসূত্রে সুজাউদ্দৌলাকে পুনরায় তাহা ছাড়িয়া দেন। কিন্তু সুচতুর বলবন্ত ব্রিটীশ গবর্ণমেন্টের বিশেষ অনুগত হইয়া সুজাউদ্দৌলা হইতে আত্মরক্ষার জন্য বৃটীশের মিত্র-রাজা বলিয়া নিজকে পরিচয় দেন। ১৭৭০ খৃঃ অব্দে ২২শে আগষ্ট তারিখে রামনগরের প্রাসাদে তাঁহার মৃত্যু হয়। রাজা বলবন্তের ঔরসে তাঁহারই এক আশ্রিতা ও অনুগতা দাসীর গর্ভজাত সন্তান চেৎসিংকেই তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। ১৭৭৫ খৃঃ অব্দে

বারাণসী আবার ইংরাজের অধীন হয়। ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক চেৎসিংকে 'রাজা' সনন্দপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু পরে রাজস্ব লইয়া নানা দুর্ঘটনান্তে ওয়ারেণ হেষ্টিংসএর আক্রমণ ভয়ে চেৎসিং আত্মরক্ষা করিবার জন্য 'শিবালয়' নামক বাটী হইতে দুঃসাহসিক ভাবে পলায়ন করিয়া, ১৮১০ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়ারে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ইতিমধ্যে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে হেষ্টিংস বলবন্তসিংএর দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে বেনারসের উত্তরাধিকারী রাজা বলিয়া প্রচার করেন ও জমিদারী সনদ প্রদান করেন। ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র উদিৎনারায়ণ রাজা হন এবং ১৮০৫ খৃঃ অব্দে আবার তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদনারায়ণ রাজা হন।

মহারাজ উপাধিধারী ঈশ্বরীনারায়ণপ্রসাদ পরে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দের দরবারে G. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। ইনি রামনগরেই বাস করিতেন। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে ক্রমে ১৩টী তোপের সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। "(Murray's Hand Book of Bengal 1881,)

১৮৮৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর

(K. C. S. I.) রামনগরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। ইনিই এখন কাশীনরেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

কাশীর রাজাবলীর মধ্যে যতদূর জানা গিয়াছে, অতি সংক্ষেপেই তাহা বিবৃত হইল। ইহাঁরা সকলেই কাশীরাজ্যের শাসক ও পরিচালক লৌকিক রাজা মাত্র। কিন্তু আর্য্যের প্রকৃত রাজা ইহাঁরা নহেন। সেই স্বার্থ-পরতা পরিশূন্য নিষ্ঠাবান ও সাধনতৎপর দেবতুল্য ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিগণই প্রকৃত কাশীর অধিরাজ পদবীবাচ্য। তাঁহারা কেবল কাশীরাজ্যের উপরই তাঁহাদের জীবিত কালের জন্য নিজ নিজ আধিপত্য বিস্তার করেন নাই; তাঁহারা সমগ্র ভারতের সমস্ত আর্য্যজাতির উপর সনাতন ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর বলিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া ত্রিকালের শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। সেই কপিলের 'সাংখ্য' গৌতমের 'ন্যায়' পাণিনীর 'ব্যাকরণ' সমস্তই এই স্থান হইতে প্রচারিত। সেই বাল্মীকি, ব্যাস সেই বুদ্ধ, শঙ্কর প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই পুণ্যতীর্থ কাশীধামের নিত্যশুদ্ধ ধর্ম্ম-সিংহাসন হইতেই ভারতের শিক্ষা দীক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্মের সকল বিধি নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। আমাদিগের এ দুর্দ্দিনেও জগতপূজ্য তুলসীদাস, কবীর, মহাত্মা ত্রিলিঙ্গ বা তৈলঙ্গ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী, কাষ্ঠজিহ্বা স্বামী, অঘোরী বাবা

প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কাশীর সেই পবিত্র আসন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন ও কত মহাপুরুষ গুপ্ত ও ব্যক্ত ভাবে কত স্থানে নিজ নিজ কঠোর সাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া কাশীর সেই মাহাত্ম্য এখনও রক্ষা করিতে-ছেন। বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যঋষিগণের সেই পুণ্য-তপোবন পবিত্র বারাণসী ক্ষেত্র আর্য্যকুলকলঙ্ক নরাধম আমাদিগের দ্বারাই রাজসিক ও তামসিকতার লীলা-নিকেতনে পরিণত হইলেও তাহারই অন্তরালে ঘনমেঘাচ্ছাদিত সবিতাদেবতার মত সনাতন ধর্ম্মের সার সাত্বিকতা নিত্য বিরাজিত রহিয়াছে। কাশীকে যিনি যে চক্ষে দেখিবেন, তিনি সেইরূপেই দেখিতে পাইবেন। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা-রাজ্যের ইহাই বিশেষত্ব। এ রাজ্যের রাজতক্ত কোন নরপতির দ্বারা কখনও শোভিত হইতে পারে না, সেরূপ অনিত্য রাজা মহা-রাজ দুদিনের তরে নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করি-য়াই বিশ্ব-কোতোয়াল কালভৈরবের করাল কবলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, ইতিহাস তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ কাশীপতি রাজ্যেশ্বর চিরসম্রাটরূপে অন্নপূর্ণাসেবিত হইয়া সেই পবিত্র আসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ও তাঁহার চির আদরের বারাণসীরাজ্য সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী পরম ভক্ত সাধুমণ্ডলী কর্ত্তৃক চিরদিন পরিচালনা করিতেছেন। জয় বিশ্বনাথ

অন্নপূর্ণার জয়! জয় পতিতপাবনী গঙ্গা মণিকর্ণিকার জয়!! জয় বিশ্ব-কোতোয়াল কালভৈরবের জয়!!!

কাশীর মন্দির।

সেই পবিত্র পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর শান্তি-শীতল-সলিল-সেবিত ত্রিভুবন-বরেণ্য বিশ্বনাথের বারাণসী রাজ্যে কল্পান্তকালব্যাপী কত শত মন্দির যে বিরাজিত রহিয়াছে কে তাহার গণনা করিবে? কালের করাল পীড়নে, দুষ্ট অসুর দলের বীভৎস তাড়নে, দুরাচারী যবনাধম নৃশংস ও বর্ব্বরগণের যথেচ্ছ অত্যাচারে কত মন্দির, কত মঠ, কত আশ্রম, কত দেবালয় কোথায় যে ধূলিকণারূপে বিলীন হইয়াছে, তথাপি শিবময় কাশীর শিবালয় ও শিবলিঙ্গের হিসাব করা বোধ হয় মানবের গণিত শাস্ত্রেরও অতীত। কাশীর গৃহ প্রাঙ্গণে, অলিন্দ প্রাচীরে, পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে যথায় দেখ তথায়ই শিবলিঙ্গ দেখিতে পাইবে। কাশীর ধূলিকণার মধ্যেও যেন শিবকণা বিরাজিত রহিয়াছে। আহা! সাধক, তুমি এ স্থানে বসিয়া অঙ্গ আর করাঙ্গ ন্যাস করিবে কি? তোমায় শিবকণা-সমাচ্ছাদিত করিয়া বিশ্বনাথ একেবারে যে, ব্যাপক ন্যাস করাইয়া দিয়াছেন। ভক্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের

ত্রিনয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ দেখি, রাজরাজেশ্বরী অন্নপূর্ণা মা আমার বিশ্বনাথের বিশ্বকরে কেমন অলৌকিক ভাবে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন! মায়ের পরম ভক্ত সন্তানগণ সেই অন্নকণা কুড়াইয়া লয়, প্রসাদ পাইয়া তাহাদের চির আকাঙ্খিত ভবজঠর-যন্ত্রণা দূর করে। যিনি মায়ের প্রসাদসেবী এমনই সাধক হইতে পারেন তিনিই ধন্য। তাঁহার চরণপ্রান্তে এ দীনেরও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, ক্রমে কত কল্পান্তরের পূর্ব্বে ও পরে ঐরূপে কত মন্দির, কত মঠ ছিল, কত লয় হইয়াছে, আবার সেই সেই স্থলে কতই না নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! হয়ত কালের গহ্বরে তাহাও একদিন নিক্ষিপ্ত হইবে! কিন্তু কাশী কখনই মন্দিরশূন্য হইবে না। বৈদিক যুগে যাহা ছিল, বৌদ্ধ যুগে তাহার কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই, বৌদ্ধ যুগে হুয়েন্থ সাংএর বিবরণ হইতে ইতিপূর্ব্বে তাহা জানা গিয়াছে ;—সর্ব্ব শুদ্ধ একশতটী প্রধান মন্দির তখন কাশীতে বিদ্যমান ছিল। তন্মধ্যে আবার কুড়িটী মাত্র নগরের মধ্যে উপবন ও তড়াগাদি পরিবেষ্টিত সুন্দর প্রস্তরময় মন্দির ছিল। সে সময় বিশ্বেশ্বরের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সুপ্রাচীন বিরাট মন্দির-মধ্যে প্রায় ষড়ষষ্টি হস্ত (প্রায় একশত ফুট) পরিমিত

কাশীধাম।

দীর্ঘ বিশুদ্ধ তাম্রময় দেবাদিদেব বিশ্বনাথের অতি বিশাল ও পরম পবিত্র অনাদি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহানুভব হুয়েন্ থ সাং স্বচক্ষে তাহা পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সেই গগন-চুম্বিত বিরাট বিচিত্র মন্দির, তাহারই মধ্যে অপূর্ব্ব রত্নবেদীকাশ্রিত সেই অসাধারণ বিশাল গম্ভীর মূর্ত্তি, হতভাগ্য আমরা এ পাপ নয়নে তাহা দর্শন করিতে পারিলাম না! কিন্তু কল্পনার চক্ষে, সেই মন্দির প্রাঙ্গনে সভামণ্ডপের এক প্রান্তে দূরে দণ্ডায়মান হইয়া, সেই আর্য্যঋষি-মুনি-সেবিত, সুরাসুর-বন্দিত, দেবাদিদেব বিশ্বনাথচরণ চিন্তা করিলেও এ দীনের প্রতি রোমকূপ পুলকে পূরিয়া উঠে, শরীর রোমাঞ্চ হয়। ভক্ত পাঠক! পবিত্র ভাবে একবার সেই রূপ চিন্তা করিয়া দেখ, পরম সুখী হইবে। হায়! বিশ্বনাথের সে পবিত্র আদি মূর্ত্তি নাই। কোন্ সনাতন-ধর্ম্মবিদ্বেষী নিষ্ঠুরের হস্তে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে! চর্ম্ম চক্ষে সাধারণের আর তাহা দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু ধ্যানসিদ্ধ সাধকের চক্ষে তাহার বিলয় হয় নাই। তাহা নিত্য বিরাজমান্!

তাহার পর আবার সহস্র সহস্র মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। দুষ্ট কুতবের অত্যাচারে তাহারও সহস্রাধিক পুনরায় বিচূর্ণ হইল। সেই বিরাট তাম্র মূর্ত্তিও বোধ

হয় এইসঙ্গেই বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে! অনন্তর পুনরায় কত নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল—আর্য্যধর্ম্ম-বিদ্বেষী অওরঙ্গজেব আর্য্যগৌরব আমাদিগের পরম পবিত্র বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মন্দিরসহ সেই শত শত মন্দির ও মঠ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল। এ সকল কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। যাহা হউক বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠার বিরাম নাই, আবার সহস্র সহস্র মন্দির প্রতি বর্ষে বিনির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

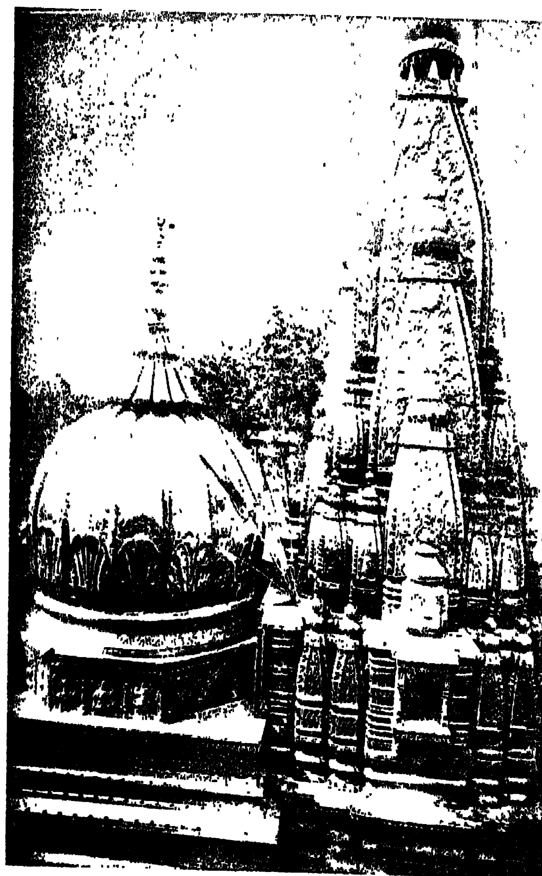
প্রায় ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ জেমশ্ প্রিনসেপ একবার কাশীর এই বর্ত্তমান সহর বেনারসের মন্দিরাদির এক হিসাব পত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠে জানা যায়—তখন কেবল এই সহরের মধ্যেই উল্লেখযোগ্য প্রায় ১০০০এক সহস্র হিন্দুমন্দির ও ৩৩৩টী মুসলমানদিগের মসজিদ্ ছিল। অনন্তর তাহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে এখন হইতে প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মিঃ শেরিং যে হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত মন্দির ও মস্‌জিদের সংখ্যার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনিও বলিয়াছেন এও এক মোটামুটী হিসাব মাত্র। তবে যতদূর সম্ভব তিনি নির্ভুল হিসাব দিবার জন্যই প্রয়াস করিয়াছেন।

মহল্লা।	মন্দির।	মস্‌জিদ্‌।
কোতোয়ালি	... ... ২৬১	... ... ১৯
কাল ভৈরব	... ... ২১৬	... ... ২০
আদমপুরা	... ... ৪৮	... ... ৫৪
জৈৎপুরা	... ... ৩০	... ... ৯৭
চেৎগঞ্জ	... ... ৫৩	... ... ৩২
ভেলুপুরা	... ... ১৫৪	... ... ১৬
দশাশ্বমেধ	... ... ৬৯২	... ... ৩৪
	১৪৫৪	২৭২

ইহার পর ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে এখন হইতে প্রায় ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে বেনারসের একজন প্রাচীন অধিবাসী (পুস্তকে তাহার নাম নাই) "বেনারাস গাইডবুক" নামে যে পুস্তক প্রচার করেন, তাহাতে তিনি ১৫৫০টী মন্দির ও ৩০০ তিনশত মসজিদের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আরও বলিয়াছেন যে, এখন নিত্যই মন্দিরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

এই সকল হিসাব হইতে কাশীর আধুনিক মন্দির-সংখ্যা এক প্রকার অনুমান করা যাইতে পারে। বহু কাশীবাসী শিক্ষিত লোকের মুখে শুনিলাম, আজ কাল মন্দির সংখ্যা এই বারাণসীর মধ্যে প্রায় চারি হাজারেরও অধিক। ইহা অসম্ভব নহে। এসকল

ব্যতীত এমন অনেক ক্ষুদ্র ও সামান্য সামান্য মন্দির আছে, যাহা প্রকৃতই গণনাতীত। কথিত আছে, এক সময় জয়পুরের মহারাজ মানসিংহ;একদিনে এক লক্ষ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প করেন। (মিঃ শেরিংও সে কথার উল্লেখ করিয়াছেন) সেই মন্দির-গুলি একদিনেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহারাজ মানসিংহ্ বহু প্রস্তর-শিল্পীকে তাহা প্রস্তুত করিবার অনুমতি দেন। তাহারা এক এক খণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া তাহারই মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ সমন্বিত মন্দির খোদিত করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে লক্ষ শিবমন্দির নির্ম্মিত হইলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সকল মন্দিরাভাস বেনারসের নানাস্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে বহু মন্দির খোদিত এক-খানি প্রশস্ত প্রস্তর মানমন্দিরের নিকট দশাশ্বমেধঘাটে রক্ষিত আছে। যাহা হউক যে সকল মন্দির ও শিবলিঙ্গ নিত্য পুষ্পাক্ষত-গঙ্গাজলে পূজিত হয়, তাহা বোধ হয়, কাশীবাসী জনমণ্ডলীর সংখ্যারও তিন চারি গুণ অধিক হইবে।



বিশ্বেশ্বর মন্দির। (৪৯ পৃষ্ঠা)

বিশ্বেশ্বর-মন্দির।

এই মন্দিরসমূহের মধ্যে বিশ্বেশ্বর মন্দিরই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক বিশ্বেশ্বরের ভূতপূর্ব্ব মন্দির ধ্বংস হইবার পর, প্রাতঃস্মরণীয়া অমর-কীর্ত্তিবতী ইন্দোরেশ্বরী শ্রীমতি অহল্যাবাই বিশ্বেশ্বরের এই বর্ত্তমান মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইহার উচ্চতার পরিমান ৫১ ফিট। অনন্তর পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহার চূড়াগুলি স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, মহারাজ যাহাকে এই কার্য্যের ভার দিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, তিনি সম্পূর্ণ স্বর্ণের পরিবর্ত্তে তাম্রমণ্ডিত করিয়া তাহার উপর সূক্ষ্ম স্বর্ণ স্তবক মাত্র বসাইয়া দিয়াছেন ও অবশিষ্ট অর্থ আত্মসাৎ করিয়া অসি-সঙ্গম সন্নিধে নিজের এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক সেই অবধি বিশ্বেশ্বরের এই মন্দিরকেঁ সকলেই (বিশেশতঃ য়ুরোপীয়গণ) 'Golden temple' বা স্বর্ণ-মন্দির বলিয়া আসিতেছেন।

বিশ্বেশ্বর শব্দের ব্যুৎপত্তি ধরিয়া "Hand book of Bengal"এর রচয়িতা Edward B. Eastwick, তাহার পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠায় এক বিচিত্র অর্থ

লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বের+ঈশ্বর= বিশ্বেশ্বর না বলিয়া বিষ ও ঈশ্বর বিশ্বেশ্বর অর্থাৎ সমুদ্রমন্থনকালে শিব বিষ খাইয়াছিলেন, সেই কারণ বিশ্বেশ্বর হইয়াছেন, ইত্যাদি বলিয়াছেন। বিশ্বেশ্বরের এ এক বিচিত্র অর্থ নহে কি?

ভারতের অন্যান্য তীর্থ হইতে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করিলে এক বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এ স্থানে দর্শকের নিকট হইতে কোনরূপ দর্শনী বা 'tax' আদায় করিবার কড়াকড়ি নিয়ম নাই। আমাদের কালীঘাটের কালী-মন্দির বা অন্যান্য বহু মন্দিরের দ্বারদেশে সাক্ষাৎ কালের অনুচর-স্বরূপ যেমন একজন ব্রাহ্মণ দ্বাররক্ষক দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের নিকট হইতেই প্রত্যেকবার মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে পয়সা আদায় করে, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। যাহার যতবার ইচ্ছা বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া আসিতে পারেন, কেহ কোন বাধা আপত্তি করিবেন না। মন্দিরমধ্যে পূজারী বা পাণ্ডার লোকজনও পূজা ও দক্ষিণার জন্য কোনরূপ জিদ্ করেন না। যাহার যাহা অভিরুচি তিনি তাহাই দিতে পারেন, কিছু না দিলেও কেহ কোন কথা বলে না। বহু ব্যক্তি কেবল গন্ধাক্ষতবিল্বপত্রেই বাবার পূজা করিয়া আসিতেছে।

বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডাবংশে এখন কোন পুরুষ জীবিত নাই, কেবলমাত্র দুইটী বিধবা রমণীই লোকজন রাখিয়া বিশ্বনাথের সেবায়েতরূপে সেবা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তাঁহাদেরই কোনও দূর আত্মীয়ের হস্তে মন্দিরের পরিদর্শন ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

বিশ্বনাথের মন্দিরমধ্যে একটী চতুষ্কোণ গহ্বর আছে, উহা দৈর্ঘ্য বিস্তারে দুই হস্ত এবং গভীরতায় প্রায় এক হস্ত পরিমিত হইবে। উহা কখন কখন সমৃদ্ধিশালী জনমণ্ডলীকর্ত্তৃক নানা রত্ন ও অলঙ্কার অথবা টাকা, কড়ি বা পয়সায় পূর্ণ করিয়া বিশ্বনাথকে উৎসর্গ করেন। শুনিতে পাওয়া যায়, কেবল মাত্র মহারাজ রণজিৎ সিংহই উহাতে সুবর্ণ-মুদ্রায় বা মোহরে পূর্ণ করিয়া দিয়া ছিলেন, কয়েক ব্যক্তি রজত মুদ্রা বা টাকায় পূর্ণ করিয়া ছিলেন এবং অনেকে তাম্র মুদ্রা বা পয়সা দ্বারাও পূর্ণ করিয়া নিজ নিজ অর্থের সৎব্যবহার করিয়াছিলেন!

বিশ্বেশ্বরের সেবায় বহু ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি নিত্য নিযুক্ত রহিয়াছেন, কেহ মন্দির ধৌত ও পরিষ্কারের জন্য, কেহ নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য, কেহ চামর, কেহ ঘণ্টা, কেহ শিঙ্গা, কেহ শঙ্খ, ঢক্কা প্রভৃতি বাজাইবার জন্য, কেহ বা পূজা, কেহ আরত্রিকাদি নানা কার্য্যের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছেন।

বহু স্থানে দেব বিগ্রহের পুজা ও আরতি দেখিয়াছি, কিন্তু বিশ্বনাথের আরতি প্রকৃতই এক অদ্ভূত ও দেখিবার জিনিষ। তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে, ঠিক বুঝিবার উপায় নাই। সেই প্রাণ-মন-মোহিতকর পবিত্র স্তোত্র—কেমন একস্বরে বিশুদ্ধ তাল লয়ে, নাগরা ও ঘণ্টা ধ্বনির সহিত তালে তালে মিলিত হইয়া গীত হইতেছে, সেই সঙ্গে সঙ্গেই বাবা বিশ্বনাথের চারিধারে কত সন্ন্যাসী, সাধু, ব্রাহ্মণ, পুজারী একাগ্রচিত্তে ভক্তি ভরে সেই স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে আরতি-প্রদীপ হস্তে বাবাকে আরতি করিতেছে। সে ভাব দর্শকের হৃদয়ে সেই অল্পক্ষণের জন্য যেন উন্মত্ত করিয়া তুলে, অতি পাষণ্ডেরও হৃদয় তাহা দেখিয়া বিগলিত হইয়া যায়। বাস্তবিক সে ভাব বর্ণনা করা বোধ হয় মনুষ্যের ভাষাতীত।

বিশ্বনাথের এই মন্দির ও নাট মন্দির আশানুরূপ যথেষ্ট বিস্তৃত নহে, পূর্ব্ব মন্দিরের এক চতুর্থাংশ হইতেও ইহা ক্ষুদ্র। স্থানাভাবই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্ব মন্দির কলুষিত ও বিনষ্ট হইবার পর, নিকটে সম্ভবতঃ সেরূপ বিস্তৃত স্থান একেবারেই পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ ভক্তবৃন্দ বাবার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই স্থানেই তাঁহার আবির্ভাব

অবগত হইয়াছিলাম। অতএব এই স্বল্প বিস্তৃত স্থানেই তাঁহার মন্দির বিনির্ম্মিত হইয়াছে।

মন্দির মধ্যে যে সকল ঘণ্টা দোদুল্যমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও কারুকার্য্য বিশিষ্ট সেটী নেপাল মহারাজকর্ত্তৃক উৎসর্গিত হইয়াছে। মন্দির মধ্যে রাণী অহল্যাবাই কর্ত্তৃক একটী লিঙ্গমূর্ত্তি মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিব-সভা।

এই মন্দিরের পশ্চিমোত্তর প্রদেশে একটী স্বতন্ত্র দ্বারবিহীন গৃহমধ্যে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে একত্র রহিয়াছে। স্থানীয় লোক ইহাকে শিব-সভা বা শিবের কাছারী বলিয়া অভিহিত করে। এই সকল শিবলিঙ্গ ও দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্যে এরূপ বহুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সম্পূর্ণ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেগুলি দেখিলে বহুকালের প্রাচীন লিঙ্গ বলিয়া মনে হয়। অনেকে বলেন, প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দির কুতব কর্ত্তৃত বিচূর্ণ হইবার সময় পাণ্ডা ও পূজারী-গণ এই মূর্ত্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া ছিল। পরে এই শিব-সভায় রক্ষা করিয়াছে। ইহার মধ্যে একটী দীর্ঘ্য শ্মশ্রু বিশিষ্ট মূর্ত্তি অনেক দিন হইল

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেটী বিশ্বনাথের একজন ভক্ত সন্ন্যাসী পূজারীর প্রতিমূর্ত্তি। পূজা করণান্তর শিব-মন্ত্র জপ করিতে করিতে তাঁহার শিবত্ব লাভ হয়।

জ্ঞানবাপী।

বিশ্বনাথের মন্দিরের ঠিক উত্তর পার্শ্বে বিস্তৃত ক্ষেত্রে এক প্রকাণ্ড কুপ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাকেই সকলে জ্ঞানবাপী বা জ্ঞানকুপ বলে। ইহার গভীরতা জলের উপর পর্য্যন্ত প্রায় ৫৫ ফিট হইবে, কুপের মধ্যে নামিবার এক সোপানশ্রেণী আছে। কিন্তু তাহার দ্বার সততঃ তালা বন্ধ থাকে, কথন কথন কুপ পরিষ্কার করিবার জন্য তাহার ব্যবহার হয়। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। কথিত আছে, কোন কালে একাধিক্রমে দ্বাদশ বর্ষ বা এক যুগ ব্যাপী অনাবৃষ্টি হওয়ায় কাশী-রাজ্য বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তথন একজন মহাতপা ঋষি অন্যান্য বহু সহস্র ঋষিকে সমবেত করিয়া শিবের আরাধনা করেন ও আরাধনায় সিদ্ধ হইলে, শিবের আদেশ অনুসারে এই কুপ খনন করান, তাহাতে কাশীরাজ্যবাসীর জীবন রক্ষা হয়। সেই অবধি প্রবাদ আছে, দেবাদিদেব শিব চির দিনই

এই স্থানে অবস্থান করিবেন ; সেই ভক্তের নিকট তিনি এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

কাশীখণ্ডে ৩৩ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, "রুদ্ররূপী ঈশান ত্রিশূল দ্বারা এই স্থানের ভূমি খনন করিয়া একটী কুণ্ড নির্ম্মান করতঃ জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপী মহালিঙ্গকে সেই কুণ্ড হইতে সহস্র কলস জল লইয়া স্নান করাইলেন, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া রুদ্রকে বর দিলেন যে, আমার শিব শব্দের অর্থ জ্ঞান, সেই জ্ঞানই এখানে জলরূপে দ্রবীভূত হইয়াছে, এই-জন্য এই তীর্থ জ্ঞানদ নামে অভিহিত হইবে। এই তীর্থ স্পর্শে সর্ব্ববিধ পাপ বিনষ্ট ও আচমন করিলে অশ্বমেধ এবং রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হইবে। ইহার নাম যথাক্রমে শিব তীর্থ, জ্ঞান তীর্থ, তারক তীর্থ ও মোক্ষ তীর্থ। এই তীর্থ-জলে শিবলিঙ্গ স্নান করাইলে সর্ব্ব তীর্থের ফল লাভ হয়। আমি এই স্থানে জ্ঞান স্বরূপ দ্রবমূর্ত্তিতে জীবের জড়তা বিনাশ করিয়া জ্ঞানোপদেশ প্রদান করি।" পরবর্ত্তী ৩৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, "দণ্ডনায়ক এই জ্ঞানবাপীর জল দুর্ব্বৃত্তগণ হইতে রক্ষা করিতেছেন। সুভ্রম ও বিভ্রম নামক গণদ্বয় দুর্ব্বৃত্তগণের ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছে, শাস্ত্রে মহাদেবের যে অষ্টমূর্ত্তির বিষয় উক্ত আছে, জ্ঞান-ব্যাপী তাহারই অন্যতম জলময়ী মূর্ত্তি।"

এতদ্ব্যতীত যখন দুষ্ট যবন বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির নষ্ট করে, তখন একজন পাণ্ডা বিশ্বনাথের পবিত্র মূর্ত্তি কলুষিত হইবার আশঙ্কায় গোপনে এই কূপমধ্যে তাহা নিক্ষেপ করেন। কেহ কেহ বলেন কালাপাহাড় কাশীর দেব মন্দির গুলি ধ্বংস করিবার সময় বিশ্বেশ্বর এই জ্ঞানব্যাপীর জলে বিলীন হইয়াছিলেন, অনন্তর বিশ্বনাথের পরম ভক্ত নারায়ণ ভট্ট নামক দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ জ্ঞানব্যাপীর দক্ষিণে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নব বাণলিঙ্গ স্থাপন করেন। ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডের মতানুসারে ভগবান বিশ্বনাথ সেই বাণলিঙ্গে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

এই সকল কারণে জ্ঞানবাপী ভক্তের অতি পূজার্হ। এখনও লোকে বিশ্বনাথের উদ্দেশে এই কূপমধ্যে পুষ্প চন্দন বিল্বপত্র দিয়া পূজা করিয়া থাকে। নিত্য পুষ্প ও পত্রাদি পড়িয়া কূপের জল দুর্গন্ধ হইয়া যায়, সেই কারণ উহার উপর লৌহের জাল দিয়া এক্ষণে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছে ও একখণ্ড বস্ত্র সততঃ তাহার উপর বিস্তৃত থাকে। যাহা কিছু ফুল পত্র তাহারই উপর পতিত হয়। ইহাতে কূপের জল সেরূপ দূষিত হইতে পারে না। যাত্রীগণ ভক্তিভরে এই জল বিশ্বনাথের চরণামৃত বোধে পান করে।

এই পবিত্র কুপের উপর ১৮২৮ খৃঃ অব্দে গোয়ালিয়ারপতি মহারাজ দৌলৎরাও সিন্ধিয়ার বিধবা মহিষী পুণ্যবতী মহারাণী বৈজাবাই একটী বিস্তৃত দালান প্রস্তুত করিয়া দেন। দালানের ছাদটী প্রতি সারে দশ দশটী করিয়া, চারি সারে মোট চল্লিশটী অনুচ্চ প্রস্তর স্তম্ভের উপর স্থাপিত। এই দালানের মধ্যে সন্ন্যাসী যাত্রীগণ সর্ব্বদা অবস্থান করেন।

নন্দী বা বিশ্বনাথের ষাঁড়।

পুণ্যসলিল-গর্ভা জ্ঞানবাপীর পূর্ব্ব পার্শ্বে বিশ্বনাথ বাহন এক প্রকাণ্ড প্রস্তর বৃষ উত্তরাস্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহা শায়িত অবস্থাতেও উচ্চে প্রায় সাত ফুট হইবে। নেপালের মহারাজ কর্ত্তৃক এই বৃষ-মুর্ত্তিটী স্থাপিত হয়। কিন্তু কোন মহারাজ কোন সময়ে ইহার স্থাপনা করেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই ; তবে সপ্তদশ শতাব্দীর পুর্ব্বেও যে ইহা স্থাপিত ছিল, তাহা এক কিম্বদন্তী হইতে জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ যখন দুষ্ট যবন কর্ত্তৃক বিশ্বনাথের পূর্ব্ব মন্দির ও মূর্ত্তিসমূহ বিনষ্ট হইতেছিল সেই সময় এই প্রস্তর বৃষ কি এক দেববলে চৈতন্য লাভ করিয়া বিকট নাদে চিৎকার করিয়াছিল। এখনও বৃষের মুখ সেই পূর্ব্ব মন্দিরের প্রতিই বা বর্ত্তমান মসজিদেরদিকেই রহিয়াছে।

হর-পার্ব্বতী।

ইহার নিকটেই শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরে খোদিত এক হর-গৌরি মূর্ত্তি আছে। মিঃ শেরিং বলিয়াছেন ইহা "হায়দ্রাবাদের রাণী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে," কিন্তু 'হ্যাণ্ডবুক অফ বেঙ্গলের' রচয়িতা তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, হায়দ্রাবাদে সেরূপ কোন রাণী কখনই ছিলেন না। কিন্তু আমার বিশ্বাস হায়দ্রাবাদাধিপতি মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রী হিন্দুই হইয়া থাকেন এবং মহামান্য নিজাম কর্ত্তৃক মহারাজ উপাধিতে তিনি সম্মানিত হইয়া থাকেন; সুতরাং মন্ত্রীপত্নী মহারাণী বা 'রাণী' সম্মানে অভিহিত হইয়া থাকেন। কোন সময়ে এইরূপ কোন মন্ত্রীমহিষী 'রাণী' কর্ত্তৃক ইহা যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি?

অক্ষয় বট।

এই বৃষ-মূর্ত্তির সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে, ইহাকে অনেকে অক্ষয় বট বলে। বিশ্বনাথ দর্শনার্থী ভক্তবৃন্দ এই অক্ষয় বৃক্ষকে পূজা করিয়া থাকেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটী স্বতন্ত্র গৃহসংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত বটবৃক্ষ আছে, তাহাও অক্ষয় বট বলিয়া সাধারণের পূজার্হ।



প্রাচীন বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ভগ্নাংশ — ৫৯ পৃষ্ঠা

প্রাচীন বিশ্বেশ্বরের মন্দির বা অওরঙ্গজেব-মস্ক।

উক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের পশ্চিমে, বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত, প্রাচীন বিশ্বনাথের মন্দিরের উপর খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে অওরঙ্গজেব কর্তৃক এই মসজিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্ব মন্দিরের ভগ্নলব্ধ প্রস্তরাদিই এই মসজিদের প্রধানতম উপকরণ—সেই স্তম্ভ, উপান, আলীন্দ, সেই কল্প, কন্দর, উত্তীর্ণ প্রভৃতি আর্য্য-স্থাপত্য-সুলভ প্রস্তরালঙ্কার এখনও মসজিদের পশ্চাৎদিকে অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা দেখিলে বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির যে কত বিস্তৃত, উন্নত ও কত নয়নতৃপ্তিকর ছিল, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়—তাহা দেখিলে এখনও আর্য্য-সন্তান ভক্তের পবিত্র হৃদয় যুগপৎ বিষম বিস্ময়ে, ক্ষোভ ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া যায়—তাহা দেখিলে উদার ও পরম প্রজাবৎসল মোগল সম্রাটকুলের কুলাঙ্গার অওরঙ্গজেবের ঘোর আর্য্য-বিদ্বেষতা ও ঘৃণিত নীচাশয়করণের কথা এখনও স্মরণ হইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষণেকের জন্য চিরশান্তিপ্রিয় হিন্দুর হৃদয় যেন উত্তপ্ত করিয়া তুলে। যাহাহউক সকল বিষয়ে সুসভ্য ইংরাজ রাজ এ প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণে যেরূপ সচেষ্ট, যে

কোনও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রাচীন মন্দির, মঠ ও মসজিদাদির রক্ষাকল্পে তাঁহারা যেরূপ উদার, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

মস্‌জিদের সম্মুখভাগে যে সুবৃহৎ স্তম্ভসমূহ এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তাহা নিকটস্থ বৌদ্ধ বিহারের ভগ্নাবশিষ্ট বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, তাহারা যেন মহা মহিমান্বিত সসাগরা পৃথিবীপতি অশোকের শোকে কাতর হইয়া, তাঁহার কীর্ত্তি কলাপ স্মরণ করিতে করিতে, যবনকরে আত্ম-কলঙ্কিত হইয়া লজ্জায় ঘৃণায় যেন 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাবে অতি সঙ্কুচিতভাবে কোনরূপে কালাতিপাত করিতেছে। সেই স্তম্ভগুলির সেই বিশালতার মধ্যে প্রকৃতই যেন কি এক ম্লান ও কালিমা-ছায়া পরিলক্ষিত হয়, তাহা হৃদয়বান দর্শকবৃন্দ দর্শন মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন। 'এডওয়ার্ড বি, ইষ্টউইক' প্রভৃতি বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ পাশ্চত্য পণ্ডিতও তাহা দেখিয়া স্পষ্টই বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়কে অপমানিত করিবার জন্যই এবং হিন্দু এবং বৌদ্ধের হৃদয়ে চিরদিন আঘাত প্রদান করিবার উদ্দেশ্যেই যেন মন্দির ও বিহারান্তর্গত প্রস্তরালঙ্কার ও তাহার উপাদান রাশিকে অবিকৃত অবস্থায় মসজিদে সন্নিবিষ্ট

করা হইয়াছে। ইহাকে ক্রূরমতির দুষ্ট অভিসন্ধি ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারেন না।"

এই মসজিদ, চারিদিকে প্রায় ৫ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিয়া তাহা মৃত্তিকায় পূর্ণ করতঃ তাহারই উপরে নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই প্রাচীরমধ্যে হিন্দু বৌদ্ধ ও জৈন-স্থাপত্যানুগত বহু প্রস্তরালঙ্কার পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের নিত্য কত নূতন ভাবের উদ্বোধন করিয়া দিতেছে।

এই মসজিদ ও জ্ঞানবাপীর মধ্যস্থিত ভূমি লইয়া বহুদিন ধরিয়া হিন্দু ও মোসলমানের মধ্যে বিষম বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। কতকগুলি দুষ্ট মোসলমান সেই অক্ষয় বটের বা পূর্ব্বোক্ত অশ্বত্থ বৃক্ষের সম্মুখে মসজিদের একটী দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নিত্য গোমাংস বহন করিয়া লইয়া যাইত, গোরক্ত ও গোঅস্থি নিক্ষেপ করিত। শান্তিপ্রিয় হিন্দুদিগের প্রতি ধর্ম্মহানীকর এই সকল আচরণে হিন্দুদিগের হৃদয়ে ক্রমে অশান্তির উদয় হইল, সহিষ্ণুতার সীমা অতীত হইল, তখন তাহারা উন্মত্ত হৃদয়ে মোসলমান-দিগের অত্যাচার নিবারণে বদ্ধ পরিকর হইল—উভয় পক্ষে ভয়ানক দাঙ্গা আরম্ভ হইল। এবার হিন্দু কর্ত্তৃক সেই অওরঙ্গজেব-মস্ক বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঙ্গা

মিটাইয়া দিলেন। মসজিদের সে দ্বার রুদ্ধ হইল, এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে, গোমাংসাদি আনায় বন্ধ হইল, মসজিদের দক্ষিণদিকে রাজপথের সম্মুখে একটীমাত্র দ্বার মোসলমানদিগের যাতায়াতের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিল, পবিত্র অশ্বত্থের একটী পত্রও আর কোন মোসলমানের স্পর্শ করিবার ক্ষমতা থাকিল না, স্বয়ং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মসজিদের রক্ষণভার গ্রহণ করিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষের বিরোধ উপস্থিত মিটিয়া গিয়াছে। এখন আর কোনও গোলযোগ নাই। হিন্দু মোসলমান স্ব স্ব ধর্ম্মানুসারে আপন আপন মন্দির ও মসজিদে নির্ব্বিঘ্নে পূজা ও উপাসনাদি সম্পন্ন করিতেছে।

আদি বিশ্বেশ্বর।

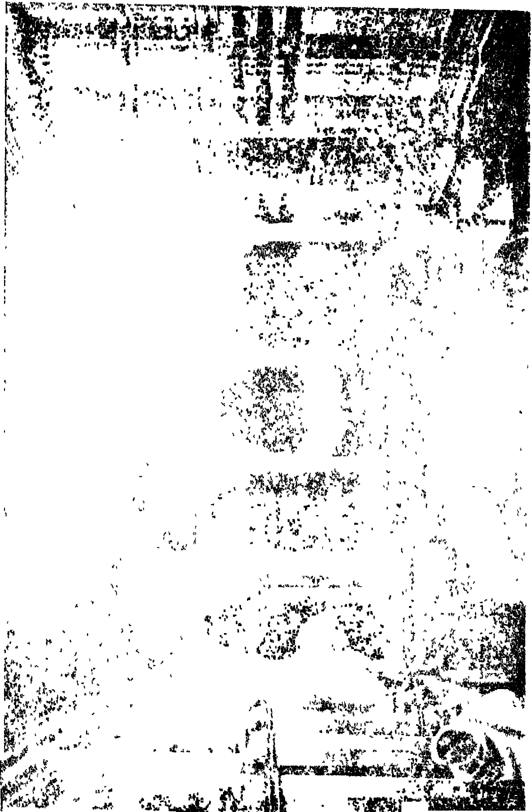
এই মসজিদের কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর পশ্চিম কোণে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। ইহাই বিশ্বনাথের সর্ব্ব প্রাচীন মন্দির বলিয়া সকলের বিশ্বাস। এই স্থানে হিউয়েন্থ সাং প্রায় ৬৬ হস্ত দীর্ঘ সেই বিরাট তাম্রময় শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। লোক-পরম্পরায় তাহাই প্রসিদ্ধ আছে। বোধ হয় ১১৯৪ খৃঃ অব্দে যখন দুর্বৃত্ত কুতব, কাশী-নরেশ মহারাজ জয়চাঁদকে

পরাভূত করিয়া কাশীস্থিত সহস্রাধিক মন্দির ও দেবমূর্ত্তি বিনষ্ট করে, সেই সময় বিশ্বেশ্বরের এই প্রাচীন মন্দিরও বিনষ্ট করিয়া সমভূমি করিয়া দেয়। অনন্তর বিশ্বনাথের দ্বিতীয় মন্দির যাহা এক্ষণে অওরঙ্গজেব-মস্করূপে পরিণত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কুতবের কাশী পরিত্যাগের পর মোসলমানদিগের উৎপীড়ন কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইলে, হিন্দুগণ সমাগত হইয়া পুনরায় পুর্ব্ব মন্দিরের স্থানে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে ও আদি বিশ্বেশ্বর নামে এক সুন্দর শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মহাত্মা শেরিং প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিদ্দিগেরও এইরূপ অভিমত। এই মন্দির প্রায় ৬৫ ফিট উচ্চ, মন্দির চূড়া প্রকাণ্ড গম্বুজাকারে শোভিত। ইহার উপাদানে প্রস্তর অপেক্ষা ইষ্টকাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বহুদিনের সংস্কারাভাবে ইহা ক্রমে জীর্ণ হইয়াছিল, প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্থানীয় এক তামাকু ব্যবসায়ী স্বধর্ম্ম পরায়ণ ধনী হিন্দু কর্ত্তৃক সুন্দররূপে সংস্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে মন্দিরের অবস্থা মন্দ নহে।

অনেক ইংরাজ পণ্ডিত অনুমান করেন, ইহার নিকটেই এক বৌদ্ধবিহার ছিল। এই মন্দিরের এবং সেই বৌদ্ধবিহারের ভগ্নলব্ধ প্রস্তরাদি সহযোগে পার্শ্বস্থ অসম্পূর্ণ এক মস্‌জিদের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

অর্থাভাবে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। তাহার ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদির মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ স্থাপত্যানুগত অলঙ্কার-পারিপাট্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক আদি বিশ্বেশ্বরের এই মন্দির হিন্দুর অতি আদরের বস্তু। ভক্তিবান হিন্দু মাত্রেই তাহা দর্শন করিয়া মন্দিরস্থিত বিশ্বেশ্বরের নিত্য পূজা করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে "বারাণসী" অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, কাশীতীর্থ গঙ্গাতটস্থিত একটী অনুচ্চ পার্ব্বত্যভূমির উপর অবস্থিত। মহাত্মা "কেন" প্রভৃতিরও সেইরূপ অভিমত। প্রাচীন বিশ্বনাথ মন্দিরের স্থান নির্ব্বাচন বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা করিলেও তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। অর্থাৎ বরুণা এবং অসির মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য ভূমিখণ্ডের মধ্যে এই সর্ব্বোচ্চস্থান, অথবা এই বারাণসীর অন্তর্নিহিত সেই অনুচ্চ পার্ব্বতের চূড়ার উপরেই যে বিশ্বনাথের আদি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও সে আদি মন্দির বহুদিন বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার সন্নিধানেই বা সেই স্থানেই আদি বিশ্বনাথের এই বর্ত্তমান মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা কাশীবাসিগণ বংশ-পরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছেন। বিশেষতঃ এই স্থান যথার্থই সহরের মধ্যে এখনও



সর্ব্বোচ্চ দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের প্রধান পথ কাশী মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক যথাসাধ্য সমতলীকৃত হইলেও ক্রমে উভয় দিকে এত অধিক নিম্নগামী হইয়াছে যে, অতি সহজেই তাহা অনুভূত হয়। শুনিতে পাওয়া যায় এই মন্দিরস্থিত বিশ্বনাথ লিঙ্গের গৌরীপট্টটী অতি প্রাচীন। ইহা উৎকৃষ্ট কষ্টি পাথরে নির্ম্মিত। কুতব ও কালাপাহাড় কর্ত্তৃক কাশী বিধ্বস্ত হইবার পর নিকটস্থিত মসজিদের দ্বারদেশে ইহা পতিত ছিল, মোসলমানগণ তাহারই উপর পা দিয়া মসজিদে প্রবেশ করিত। অনন্তর মহারাজ মানসিংহ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রজারঞ্জন সম্রাট আকবরের সহায়তায় সেই গৌরীপট্ট মসজিদ-দ্বার হইতে উঠাইয়া যথারীতি অভিষেকান্তর বর্ত্তমান মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন লিঙ্গটীর কোনও সন্ধান না পাইয়া সেই প্রাচীন গৌরীপট্টের উপরেই আর একটী নূতন লিঙ্গ সংস্থাপিত হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা।

কাশীশ্বরী জগজ্জননী মা অন্নপূর্ণা বিশ্বব্যাপী শিবময়! জীবের বিশ্বকরে নিত্য অন্ন পরিবেশন করিতেছেন। বিশ্বনাথের রাজ্যে মায়ের কৃপায়

কেহই অনশনে জীবন অতিবাহিত করে না। সন্তান অভুক্ত থাকিবে, মায়ের অন্তরে কি তাহা সহ্য হয়? মায়ের আদেশে অসংখ্য অসংখ্য 'ছত্র' চতুর্দ্দিকে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-রূপিণী হিন্দুকুল ললনাগণ অন্নপূর্ণা দর্শন করিতে আসিয়া নিত্য কত যে, অন্ন বিলাইতেছেন তাহারইবা কে গণনা করিবে? মা কাশী-রাণী কাশী-রাজ্যে যেন প্রত্যক্ষই বিরাজমানা। কোন্ অতীত যুগে মায়ের যে প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। কত বিপ্লব কত দুর্ঘটনায় মায়ের সে পবিত্র মন্দির কতবার সমভূমি হইয়াছে, আবার কতবার কত ভক্ত সন্তান কর্ত্তৃক যে, সেই মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে তাহার নিরূপণ করাও বস্তুতঃ দুরূহ! তবে অওরঙ্গজেব কর্ত্তৃক যে মায়ের মন্দির শেষ বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাহার পর ১৭৮০ সম্বতে বা খৃঃ ১৭২৫ অব্দে বাজীরাও পেশোয়া কর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান অন্নপূর্ণা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫৭॥ ফিট এবং প্রস্থে ১৯৫ ফিট হইবে। মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর ও মনোহর। মায়ের প্রস্তরময়ী অতি শীর্ণা আদি-মূর্ত্তি সততই স্বর্ণাবরণে আবৃতা থাকে। দর্শনাভিলাষী ভক্ত সন্তান তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে পূজারীকে

কিছু দক্ষিণা দিতে হয়, তাহা হইলে পূজারী বস্ত্রের কণ্ডার করিয়া গোপনে মায়ের সেই অনাবৃতা মূর্ত্তি দেখাইয়া থাকে। সে মূর্ত্তি দেখিলেই অতি প্রাচীনা বলিয়া মনে হয়, সুতরাং তাহাই যে মায়ের আদিমূর্ত্তি তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। মন্দিরের সভামণ্ডপ ও পার্শ্ববর্ত্তী দালানের মধ্যে সতত বহু সাধু, সন্ন্যাসী, ভক্ত, পূজক ভক্তিভরে গদগদ কণ্ঠে বিবিধ বিশুদ্ধ স্বরলহরীতে নিত্য সপ্তশতী চণ্ডী পাঠ করিতেছেন, কেহ পূজা করিতেছেন, কেহ প্রদক্ষিণ করিতেছেন, কেহ ভিক্ষা দিতেছে, কেহ বা অন্নপূর্ণার সেই নশ্বর গাভীগুলির পরিচর্য্যা করিতেছে। নবরাত্র বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে সে শোভা এতই বৃদ্ধি হয় যে, তাহা দেখিলে বা কিয়ৎক্ষণ মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করিলে প্রকৃতই মনে হয় যেন সহসা কোন পুণ্য ফলে সত্যযুগ-প্রবর্ত্তিত কোনও যজ্ঞস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সে ভাব বস্তুতই চিত্তকে উন্মত্ত করিয়া তুলে, অতি বড় পাষণ্ডেরও চিত্তে কিছুক্ষণের জন্য পবিত্র ধর্ম্মভাব আনাইয়া দেয়, আর্য্য পবিত্রতার সেই অনির্ব্বচনীয় ভাব যেন স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সূর্য্য, গণপতি, গৌরীশঙ্কর এবং হনুমানজীর আরও চারিটী মূর্ত্তি এই মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে।

ভক্তগণ মায়ের নামে কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, অন্ন প্রস্তুতের কত উপকরণরাশি নিত্য যে উৎসর্গ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

শনিমূর্ত্তি।

এই মন্দিরের নিকটে আরও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির ও মূর্ত্তি আছে। তাহার মধ্যে শনিগ্রহের মূর্ত্তিটীই উল্লেখ যোগ্য। অন্নপূর্ণার মন্দির হইতে বাহির হইয়া বিশ্বনাথে যাইবার পথে দক্ষিণদিকে এই মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই।

ঢুণ্ঢিরাজ গণেশ।

অন্নপূর্ণা হইতে পশ্চিমদিকে বাহিরে আসিবার পথে খর্ব্বাঙ্গ স্থূলতনু সিন্দুর-রজত-শোভিত একটী অতি ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্রীগণপতিমূর্ত্তি ঢুণ্ঢিরাজ বিরাজিত আছেন। বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনাভিলাষী ভক্তমাত্রেই সর্ব্বপ্রথমে এই গণপতির পূজা করিয়া যান। কাশী খণ্ডে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছেন :—"ঢুণ্ঢি অর্থে অন্বেষণ, সমস্তই তাঁহার অন্বেষিত, সেইকারণ তিনি ঢুণ্ঢিরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ঢুণ্ঢিরাজকে

পূজায় পরিতুষ্ট করিতে না পারিলে, কেহই কাশীতে আসিতে পারে না। কাশীবাসী যে ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পরে আমায় প্রণাম করে, তাহার আর ইহসংসারে জন্ম হয় না। স্বয়ং কাশীপতি বিশ্বনাথকেও এক সময় ঢুণ্ঢির সাহায্যে নিজ পুরীর অন্বেষণ করিয়া লইতে হইয়াছিল। এই কারণে কাশী-যাত্রা করিতে হইলেও সর্ব্বপ্রথমেই ঢুণ্ঢিরাজের পূজা করিতে হয়।

মুক্তিমণ্ডপ।

মুক্তিমণ্ডপ—ইহা বিশ্বনাথ-মন্দিরের সমীপবর্ত্তী জ্ঞানবাপীসংলগ্ন প্রসিদ্ধ মণ্ডপগৃহ। ইহাকে নির্ব্বাণমণ্ডপ বলিয়াও অনেকে উল্লেখ করেন। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে, ইহাই বিশ্বনাথের মোক্ষলক্ষ্মীবিলাস নামক প্রাসাদের দক্ষিণস্থিত সভামণ্ডপ। সভামণ্ডপের অর্থ মূল মন্দিরের সংলগ্ন দালান, নাট্যমন্দির বা নাট্‌-মন্দির। বোধ হয় পূর্ব্ববর্ত্তী বিশ্বনাথমন্দির, অর্থাৎ অধুনা যাহা অওরঙ্গজেবমঙ্ক বলিয়া পরিচিত, এই মণ্ডপটী সেই প্রাচীন মন্দিরের দক্ষিণস্থিত নাট্য অথবা সভাগৃহে ছিল। এই স্থানটী কাশীপুরীর মধ্যে অত্যন্ত পবিত্র ও পুণ্যময়। কথিত আছে,

যে কেহ স্থিরচিত্তে পবিত্র হৃদয়ে ক্ষণমাত্রও এখানে উপবেশন করেন, তাঁহার শতবর্ষ যোগাভ্যাসের ফল হয়; যিনি একটীমাত্রও বেদমন্ত্র এখানে উচ্চারণ করেন, তাঁহার সমগ্র বেদ পাঠের অভিজ্ঞতা লাভ হয় এবং যে ভক্ত সাধক পূতচিত্তে বিশ্বনাথ মহাদেবের ষড়াক্ষর বীজ জপ করেন, তাঁহার কোটি রুদ্রজপসম পুণ্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে যোগী ঋষি সিদ্ধ সন্ন্যাসিগণ এই স্থানে বসিয়া নানা নিগূঢ় শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, বেদাদির শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন। কাশী-যাত্রীগণ এখনও এই স্থানে আসিয়াই প্রথমে সংকল্প করিয়া থাকেন।

তারকেশ্বর।

বিশ্বনাথমন্দিরের পূর্ব্বদিকে তারকেশ্বরের এক প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত। অন্তিমকালে এই তারকেশ্বরই প্রত্যেক কাশীবাসীকে তারকব্রহ্ম-মন্ত্র প্রদান করিয়া থাকেন। মণিকর্ণিকার সম্মুখেও আর একটী তারকেশ্বর মন্দির অবস্থিত আছে। এইটীই আদি তারকেশ্বর বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। অনেকে বলেন, মণিকর্ণিকা-ঘাটে একটী অন্তঃসলিলা প্রবাহ আছে, সেই হেতু শেষোক্ত তারকেশ্বরমন্দিরের কিয়-

দংশ ভূমিগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়, ঊর্দ্ধাংশ ক্রমেই বিকৃত হইতে থাকে। কাশীবাসী ভক্তমণ্ডলী তাহা দেখিয়া আশঙ্কিত হন ও সন ১৭৯০।৯১ খৃঃ অব্দে ঘাট হইতে কিঞ্চিৎ উপরে ও পূর্ব্ব মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করতঃ তাহাতেই তারকেশ্বর-দেবকে স্থানান্তরিত করিয়া অভিষিক্ত করেন।

দণ্ডপাণি মহাদেব।

বর্ত্তমান বিশ্বনাথমন্দিরে প্রবেশ করিতেই সম্মুখে যে নাটমন্দির দেখিতে পাওয়া যায় বা যাহার উপর দিয়া যাইয়া বিশ্বনাথ দর্শন করিতে হয়—তথায় এক শিবলিঙ্গ আছেন। তিনি বৈকুণ্ঠনাথেশ্বর বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহারই বামদিকে মন্দিরমধ্যে যে মহাদেব প্রতিষ্ঠিত তিনিই দণ্ডপাণিশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশ্বনাথ দর্শনার্থী যাত্রীগণ যথাক্রমে এই সকল শিবদর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করেন।

ঢুণ্ঢিরাজ গণেশের সম্মুখ দিয়া বাহির হইলে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ অওরঙ্গজেব-মসজিদের দিকে যাইতে পথে আর একটী দণ্ডপাণি দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি দণ্ডপাণি-ভৈরব বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অবিমুক্তেশ্বর।

বিশ্বনাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারে প্রবেশ করিয়াই দ্বারপার্শ্বে দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়, ইনিই অবিমুক্তেশ্বর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই পার্শ্বে প্রত্যেক যাত্রী কিয়ৎক্ষণের জন্য একখানি পাথরের উপর বসিয়া স্থিরচিত্তে নয়ন মুদিয়া শিব-চিন্তা করিয়া থাকেন। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে:—দেবাদিদেব মহাদেব ব্রহ্মার অনুরোধে ও পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ মন্দারের আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া কিয়দ্দিবসের জন্য তিনি সশক্তি কাশীপুরী পরিত্যাগ করিয়া মন্দারে অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহার পরম প্রীতিপ্রদ কাশীপুরী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বা তাহার সংসর্গ বিমুক্ত হইয়া অন্যত্র গমন করা অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া স্বয়ং বিশ্বেশ্বর নিজেই এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও পূজা করেন। সেই কারণ ইঁহার নাম অবিমুক্তেশ্বর ও তখন হইতেই এই স্থানের নাম অবিমুক্ত-ক্ষেত্র। ইহার পূর্ব্বে জগতে আর কেহই শিবলিঙ্গের আকৃতি বা তাহার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না। ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও বশিষ্ঠাদি মহর্ষিগণ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। যাহা হউক এই অবিমুক্তেশ্বর জগতের আদি লিঙ্গ।

অপারনাথ।

পূর্ব্বোক্ত দণ্ডপাণি-ভৈরবের দক্ষিণ দিকে অপারনাথ মহাদেবের একটী বিস্তৃত মন্দির আছে। এটী একটী মঠের অনুরূপ। বহু সাধু সন্ন্যাসী সতত এখানে বসিয়া শাস্ত্রালাপ করেন। প্রবাদ আছে, যখন দিল্লীপতি অওরঙ্গজেবের আদেশে সমস্ত কাশী বিধ্বস্ত হইতেছিল, সেই সময় অপারনাথকেও নষ্ট করিতে আসিলে, মন্দিরমধ্য হইতে সহসা এতাধিক 'ভিমরুল' বহির্গত হইতে লাগিল যে, কাহার সাধ্য তাহার মধ্যে অগ্রসর হয়! মন্দিরধ্বংসকারী যবনসৈন্যগণ বাধ্য হইয়া তখন সরিয়া গেল। অনন্তর স্বয়ং অওরঙ্গজেব বা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্ব্বপ্রধান যবন-কর্ম্মচারী ঘটনা-স্থলে আসিয়া স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া ইহা বিনষ্ট করিতে বিরত হন ও স্মরণার্থ একটী প্রকাণ্ড ডঙ্কা সেই মন্দির-দ্বারে রাখিয়া চলিয়া যান। সেই ডঙ্কা এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। বাস্তবিক এত বড় ডঙ্কা আর কোথাও দেখা যায় না। ইহার চর্ম্ম ফাটিয়া যাইলে সহসা ছাওয়াইবার উপায় নাই। বহু অনুসন্ধানে কোনও সুবৃহৎ উষ্ট্রের চর্ম্ম পাইলেই ইহা পুনরায় ছাওয়াইয়া ব্যবহারোপযোগী করা হয়।

মার্কণ্ডেশ।

অপারনাথের উত্তরদিকে মার্কণ্ডেশের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। পূর্ব্বে এখানে একটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল, কালে তাহা জীর্ণ হইয়া যাইলে, মর্ম্মরপ্রস্তরে খোদিত একটী নূতন মার্কণ্ডেশ-প্রতিমূর্ত্তি এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সাক্ষিবিনায়ক।

ঢুণ্ডিরাজ হইয়া দশাশ্বমেধ যাইতে হইলে, সাক্ষি-বিনায়ক-পথের দক্ষিণ পার্শ্বে এই গণপতি মন্দির বিরা-জিত দেখিতে পাওয়া যায়। সন ১৮২৭ সম্বতে বা ১৭৭০ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ এখন হইতে প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে একজন মহারাষ্ট্রীয় মহাত্মা কর্ত্তৃক এই মন্দিরটী পুনরায় সংস্কৃত বা নূতন করিয়াই বিনির্ম্মিত হইয়াছে। পঞ্চক্রোশী ও অন্যান্য যাত্রিগণ যাত্রার পর এই সাক্ষিবিনায়কের পূজা করিয়া থাকেন। অন্তিম-কালে ইনিই কাশীবাসীর সকল পাপ পুণ্যের পরিচয় বা সাক্ষ্য দিয়া থাকেন।

কাশীকর্ব্বট।

কাশীকর্ব্বট, একটী অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ কূপ। ইহা একটি মন্দিরের মধ্যে সযত্নে সুরক্ষিত, আদি বিশ্বনাথের মন্দির হইতে পূর্ব্বদিকে কচুড়ির গলিতে যাইলেই নিকটে কাশীকর্ব্বটের ক্ষুদ্র দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই মধ্যে সেই কর্ব্বট কূপ। এই স্থানের পাণ্ডাগণ যাত্রীদিগকে তাহার মধ্যে লইয়া যাইয়া কতকগুলি অসংলগ্ন সংস্কৃত মন্ত্রের সহিত ও সময় সময় নানাপ্রকার ভয় ও উৎপীড়নদ্বারা বহু অর্থদানের সঙ্কল্প করাইয়া লয়। ধর্ম্মপরায়ণ ও অন্ধবিশ্বাসী যাত্রির দল ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কাশীক্ষেত্র-মধ্যে সঙ্কল্প করিয়া যথাসাধ্য সেই প্রতিশ্রুত অর্থের ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হয়। কোন কোনও প্রাচীন অধিবাসীর মুখে শুনা যায় যে, ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই কর্ব্বটের পাণ্ডাগণ এমনই দুর্দ্দান্ত ছিল যে, তখন ইহার মধ্যে বহু নিরীহ যাত্রীর জীবন-সংহার পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কথিত আছে, এই কর্ব্বটের মধ্যে ডুব দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আর তাহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। এই বিশ্বাসে অনেকে ইহাতে পড়িয়া ডুবিয়া মরিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এই সকল নৃশংস ব্যাপার অবগত হইয়া অধুনা উক্ত কূপের মুখ

বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। কেবল প্রতি সোমবারে এক-বার করিয়া সেই মুখ খোলা হয়। এতদ্ব্যতীত পাণ্ডাদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার দেখিয়া সরকার বাহাদুর সতত একজন পুলিশ-প্রহরী তথায় নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু নিরীহ যাত্রীগণের তথাপি নিস্তার নাই। কূপের মধ্যে কিয়দ্দূর নামিবার জন্য একটী সোপান-শ্রেণী বর্ত্তমান আছে, তদবলম্বনে অবতরণ করিয়া নিম্নে একটী শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম কর্ব্বটেশ্বর মহাদেব। সকল যাত্রীই সেই শিবের পূজা করিতে যান। বহুদর্শী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন, কর্ব্বটের যেস্থলে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তাহাই কাশীপুরীর সুপ্রাচীন সমতল ভূমি বা তলক্ষেত্র। ক্রমে যুগ-যুগান্তরের মৃত্তিকা ও প্রস্তরাদি পতিত হইয়া কাশী-সহর এতাধিক উচ্চতা লাভ করি-য়াছে। এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ‘কর্ব্বট’ এটী হিন্দী শব্দ, ইহার অর্থ পার্শ্বপরিবর্ত্তন করা বা ভূলুণ্ঠিত হওয়া, সেই জন্য যাত্রিগণ এই স্থলে সাষ্টাঙ্গে পতিত ও ভূলুণ্ঠিত হইয়া থাকেন।

কালভৈরব।

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে কপালমোচন-তীর্থের সম্মুখে অথবা বেনারসের টেলিগ্রাফ আফিস ও টাউনহলের পশ্চাতে একটী গলির মধ্যে বিশ্বনাথ-পুরীর 'কোতোয়াল' কালভৈরবের প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির বহুদিন ভগ্নাবস্থায় পতিত ছিল, অনন্তর ১৮২৫ খ্রীঃ অব্দে পুনার রাজা রাও কর্ত্তৃক বর্ত্তমান আকারে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। ইহার গঠন-পারিপাট্য মন্দ নহে। দ্বারদেশে দুইটী দ্বারপাল-মূর্ত্তি ও প্রাচীরগাত্রে নানা দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত। মন্দিরের গৃহটী নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহারই একপার্শ্বে তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র-গর্ভ-গৃহমধ্যে প্রস্তরময় রজতানন চতুর্ভুজ ভৈরবনাথ বা কালভৈরব বিরাজিত। ইহাঁকে দর্শন করিলে, জীবের সকল পাপ দূর হয়। ইনি গাঢ় নীলবর্ণ ও সারমেয়বাহন। ইহাঁর অসীম প্রতাপ। ইনি কাশীরাজ্যের অধিবাসীবর্গের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। বিশ্বনাথ-আদেশে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ইনিই করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য বিশ্বনাথ নিজ কোপাঙ্গ হইতে এক ভৈরব পুরুষের সৃষ্টি করেন, ইনিই সেই কালভৈরব। প্রত্যেক শিব-মন্দিরের সম্মুখে যেমন প্রস্তর-খোদিত বৃষ বা নন্দী

দেখিতে পাওয়া যায়, এই মন্দিরে প্রবেশ করিলেই বামদিকে সেইরূপ এক প্রস্তর-খোদিত প্রকাণ্ড সারমেয় বা কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়।

অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কালভৈরবের নিকট রাত্রি-জাগরণ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। ভক্তি সহকারে কালভৈরবের পূজা করিয়া যে-কোনও কামনা করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধ হয়। কথিত আছে, কাশীবাসাভিলাষী ভক্তগণকে প্রথম ছয় মাস কাল নানা বাধা বিঘ্ন ও অশেষ তাড়না সহ্য করিতে হয়। যিনি সেই সকল তাড়না সহ্য করিয়াও কোনরূপে একাগ্রচিত্তে ছয়মাসকাল অতিবাহিত করিতে পারেন, তিনিই জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্ব্বিঘ্নে কাশীবাস করিতে সমর্থ হন।

কাশীর দুর্গাবাড়ীতে যেমন অসংখ্য বানরের উপদ্রব, ভৈরবনাথের মন্দির-প্রাঙ্গনে সেইরূপ অসংখ্য কুকুর দেখিতে পাওয়া যায়। ভৈরবানুচর বলিয়া যাত্রিগণ এই সকল কুকুরকে নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য দিয়া থাকেন।

কালভৈরবের মন্দিরগাত্রে দশ-অবতারের চিত্র এবং মন্দির-চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে একটী শীতলার ক্ষুদ্র মন্দির অবস্থিত। তাহার প্রাচীরগাত্রে সপ্তমাতৃকার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

কালভৈরবের নিকটেই নবগ্রহ-দেবতার একটী প্রাচীন মন্দির আছে। ইহার মধ্যে আদিত্যাদি নবগ্রহের প্রতিমূর্ত্তি আছে। প্রত্যহ প্রাতে একবার করিয়া এই মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হয়। যাত্রীরা সেই সময়েই সকলে দর্শন ও পূজাদি করিয়া থাকেন।

দণ্ডপাণি ও কালকূপ।

ইতিপূর্ব্বে দণ্ডপাণি-মহাদেব ও দণ্ডপাণি-ভৈরবের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে দণ্ডপাণি-বিনায়ক সম্বন্ধে বলিব।

কালভৈরবের মন্দিরের নিকটস্থিত একটী মন্দির মধ্যে কিঞ্চিদূন প্রায় ত্রিহস্ত পরিমিত বিনায়ক-মূর্ত্তি অবস্থিত। প্রতি রবিবার ও মঙ্গলবার সকলে এই দণ্ডপাণির পূজা দিয়া থাকেন। ইনি 'কাশী-কোতোয়াল' কালভৈরবের সহচর ও সহকারী 'বরকন্দাজ' বলিয়া এখানে প্রসিদ্ধ। শিবের পরমভক্ত 'হরিকেশ' নামক জনৈক যক্ষ, বিশ্বনাথের কৃপায় এই দণ্ডপাণি বিনায়কের পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্ভ্রম ও উদ্‌ভ্রম নামক দুইটী গণ ইঁহার সহায়ক ও অনুগামী। কাশীবাসীর অন্তিম সময়ে ইনিই তাঁহাদের শিব-পরিচ্ছদ প্রদান করেন, অর্থাৎ গলে সুনীল রেখা,

ভালে লোচন, হস্তে সর্পবলয়, পরিধানে কৃত্তিবাস, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটা, সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, কপালে চন্দ্র-কলা ও বহনার্থ বৃষ প্রদান করেন। ইনিই কাশী-বাসীর প্রাণ, অন্ন, জ্ঞান, ও মোক্ষদাতা।

এই মন্দিরের সংলগ্নই প্রসিদ্ধ কালকূপ তীর্থ। এখানে মহাকাল ও পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। এই কূপের জলে স্নান করিলে পিতৃগণের উদ্ধার হয় বলিয়া সকলের বিশ্বাস। কূপটী এমনই ভাবে প্রাচীর ও ছাদ দ্বারা আবৃত যে, ছাদস্থিত একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া ঠিক দ্বিপ্রহর সময়ে সেই কূপমধ্যে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয়। অনেকের বিশ্বাস, সেই কূপস্থিত জলমধ্যে যে ব্যক্তি আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে না পায়, ছয়মাস মধ্যে তাহার মৃত্যু অবধারিত। সেই কারণ অনেকেই নিজ নিজ অদৃষ্ট পরীক্ষার্থ মধ্যাহ্নসময়ে কালকূপমধ্যে আত্ম-প্রতিবিম্ব দেখিতে যান।

বৃদ্ধকালেশ্বর।

কালোদকের অনতিদূরে, বেনারাস মিউনিসিপ্যাল গার্ডেণের উত্তরপূর্ব্বে বৃদ্ধকালের অতি প্রাচীন পবিত্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য ও পাশ্চত্য পুরাতত্ত্ববিদ্-গণ বলেন,—ইহার গঠনদৃষ্টে এই মন্দিরটী অত্যন্ত

প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। অনেকের মতে এক্ষণে কাশীতে যতগুলি শিবালয় আছে, তন্মধ্যে বৃদ্ধকালের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। 'কাশীখণ্ড' প্রভৃতি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সেই সুপ্রাচীন সত্যযুগে দাক্ষিণ দেশস্থিত নন্দিবৰ্দ্ধক নামক প্রদেশে বৃদ্ধকাল নামে একজন নরপতি বাস করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে কাশী-বাসের ইচ্ছায় নিজ মহিষীসহ কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হন ও অনতিকালমধ্যে এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতেই বৃদ্ধ-কালেশ্বর নামে এই প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের ইতিহাস সম্বন্ধে যতদূর বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্বকালে এই অট্টালিকা ও মন্দির দ্বাদশটী প্রাঙ্গণবিশিষ্ট ছিল, এবং ক্রমে ধ্বংস হইতে হইতে উহার ছয়টী মাত্র প্রাঙ্গণ এক্ষণে অবশিষ্ট আছে। সে গুলিরও এরূপ শোচনীয় অবস্থা, কোন সময় যে তাহা সমভূমি হইয়া যাইবে, তাহার ঠিক নাই। বৃদ্ধকালের মন্দিরান্তর্গত সিন্দূর-শোভিত মহাবীরের একটী প্রতিমূর্ত্তি আছে, দক্ষিণ পার্শ্বে কৃষ্ণ-প্রস্তরবিনির্ম্মিত কালী-প্রতিমা এবং চতুরস্র প্রাঙ্গণ সম্মুখে মহাদেবের নন্দী বা বৃষমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালী-প্রতিমার দক্ষিণদিকে গণেশ ও পার্ব্বতীমূর্ত্তি এবং বাম পার্শ্বে ভৈরবনাথ,

হনুমানজী, সূর্য্য, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি অবস্থিত। এই স্থলে একটী কূপ ও একটী ক্ষুদ্র কুণ্ড আছে। কুণ্ডের জল দুরারোগ্য বিবিধ রোগনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ। রোগীগণ এই কুণ্ডে অতি ভক্তি-ভাবে স্নান করিয়া থাকেন। কূপের জল যেমন পবিত্র তেমনি নির্ম্মল, সকলেই তাহা ভক্তিপূত হৃদয়ে পান করিয়া থাকেন।

এই স্থানেই প্রসিদ্ধ অমৃতকুণ্ড। কুণ্ডের পার্শ্বে প্রসিদ্ধ অমৃতেশ্বরলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন।

মৃত্যুঞ্জয় বা অল্পমৃতেশ্বর।

বৃদ্ধকালেশ্বর শিবমন্দিরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই একটী ক্ষুদ্র মন্দির বা গৃহের মধ্যে অল্পমৃতেশ্বর বা অপমৃত্যুহরেশ্বর শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণ ভক্তগণের বিশ্বাস এই অল্পমৃতেশ্বর মহাদেব, অল্পায়ু মানবকে দীর্ঘায়ু প্রদান করেন। সেই কারণ বহু তীর্থযাত্রী এই শিবলিঙ্গ দর্শন ও ভক্তিভরে পূজা করিয়া থাকেন। এই মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবকে তণ্ডুল ও দধিচিঁপিটকাদের ভোগ দেওয়া হয় বলিয়া, নীচ শ্রেণীর গ্রাম্য লোকেরা 'ভাত্ত খাউয়া' মহাদেব বলিয়া ইহাঁকে অভিহিত করে।

—:০:—

নাগেশ্বর।

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরের নিকটেই নাগকুঁয়া মহাল্লায় 'নাগকূপ' নামে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। কথিত আছে, নাগপঞ্চমীর দিবস এই স্থানে ভক্তিভরে নাগ-রাজের পূজা করিলে জীবনে সর্পভয় থাকে না। প্রায় শতাধিকবর্ষ অতীত হইল, একজন ধর্ম্মপরায়ণ রাজা এই কূপের চারিধার প্রস্তরদ্বারা সুন্দররূপে বাঁধাইয়া কূপের পুনঃসংস্কার করিয়াছেন। ইহার চারিদিক উচ্চ প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। তাহারই অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র মন্দির বা গৃহমধ্যে সর্পবেষ্টিত নাগেশ্বর-লিঙ্গ অবস্থিত। বাহিরে সোপানপার্শ্বে স্বতন্ত্র তিনটী সর্পমূর্ত্তি আছে।

এই মহাল্লাতেই মার্কণ্ডেশ্বর ও দক্ষেশ্বর নামে আরও দুইটী শিবলিঙ্গ আছেন। দক্ষেশ্বরমূর্ত্তি অধুনা বৃদ্ধ-কালের মন্দিরের মধ্যেই অবস্থিত।

—:০:—

বাগীশ্বরী।

নাগেশ্বরের অনতিদূরে বাগীশ্বরী দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। মন্দিরমধ্যে অষ্ট-ধাতুবিনির্ম্মিত মনোহারী দেবীপ্রতিমা সুন্দর সিংহোপরি অবস্থান করিতেছেন।

দেবীর মস্তকে সুন্দর সুবৃহৎ রত্নমুকুট, তাহাতে প্রতিমার শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মন্দিরটীও মন্দ নহে, বিবিধ দেবদেবীর চিত্রাবলীতে মন্দির-প্রাচীর চিত্রিত। নবগ্রহ ও রামসীতা প্রভৃতি আরও কয়েকটী প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে রক্ষিত আছে। মন্দিরের এক দিকে প্রস্তর নির্ম্মিত প্রকাণ্ড সিংহ-মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায়, আমেঠী-রাজ কর্ত্তৃক এই সিংহমূর্ত্তি এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাগেশ্বরী।

বৃদ্ধকালেশ্বর মহাল্লার পর ঔসনগঞ্জ নামক মহাল্লায় যাইলে, যাগেশ্বরী দেবীর প্রসিদ্ধ সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে নানা দেব দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ মন্দিরটীও দেখিতে মন্দ নহে। ইহার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিবার ভূমি, উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত আছে।

আলমগির মস্‌জিদ্‌।

অওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৬৫৯ খৃঃ অব্দে হিন্দু-বিদ্বেষী মোসলমানগণ আর্য্যদিগের সেই পবিত্র ও অতি

প্রাচীন কৃত্তিবাসেশ্বর-মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহারই ইষ্টক-প্রস্তরাদি উপাদান-সংযোগে এই আলমগির মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধকালের মন্দির হইতে ইহা প্রায় শতগজ মাত্র ব্যবধান হইবে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের চক্ষে ইহার মর্য্যাদা অত্যন্ত অধিক। ইহার সেই অবিকৃত স্তম্ভ ও উপাদান সকল বাস্তবিকই কত প্রাচীন কথার পরিচয় দেয়। কোন কোন মহাত্মা বলেন, ইহা প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্যের অতি উজ্জ্বল আদর্শ। সেই কারণ অনেকেই অনুমান করেন, ইহা কোনও প্রাচীন বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইবে। বাস্তবিক এরূপ সরল কারুকার্য্য সমন্বিত স্তম্ভাদি দেখিয়া ভারতের অতি প্রাচীন স্থাপত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কেহই ইতস্ততঃ করেন নাই। যাহা হউক মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হইবার পর, ইহারই দক্ষিণদিকে পুনরায় নূতন মন্দিরে কৃত্তিবাসেশ্বর মহাদেবকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম-প্রাণ অন্ধ-বিশ্বাসী সাধারণ মানব মস্‌জিদ্‌সংলগ্ন সেই অবিকৃত স্তম্ভ ও প্রস্তরাদি দর্শন করিয়া এখনও সেই প্রাচীন মন্দিরের মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই; তাহারা মস্‌জিদ্‌মধ্যে প্রবেশাধিকার না পাইলেও, উহার প্রাঙ্গণাভ্যন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরস্তম্ভের উপর পুষ্প-চন্দন সহযোগে পূর্ব্বাধিষ্ঠিতের উদ্দেশ্যে অর্চ্চনা

করিয়া থাকেন। এই স্তম্ভটী একটী ক্ষুদ্র জলকুণ্ডের মধ্যে রক্ষিত আছে। অনেকে সেই স্তম্ভের সম্মুখে কখন কখন পূজার জন্য পয়সা ও অন্যান্য উপাদানও রাখিয়া যায়। মস্‌জিদের রক্ষাকর্ত্তা মোসলমান মোল্লা প্রভৃতি তাহা উঠাইয়া লয়।

—:•:—

কৃত্তিবাসেশ্বর।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কৃত্তিবাসেশ্বর মহাদেবের সেই পূর্ব্বমন্দির নাই, তাহাই আলম্‌গির-মস্‌জিদ্‌রূপে পরিণত হইয়াছে। কাশীখণ্ডের বর্ণনানুসারে জানিতে পারা যায়, পূর্ব্বকালে এই মন্দির অতি প্রকাণ্ড ছিল, বহুদুর হইতে ইহার চূড়া প্রত্যক্ষীভূত হইত। কথিত আছে, দর্শনাভিলাষী ভক্ত দূর হইতেই মন্দিরের সেই পবিত্র চূড়া দর্শন করিবামাত্র কৃত্তিবাসত্ব লাভ করিতেন।

সত্যযুগে অসুরশ্রেষ্ঠ প্রবল পরাক্রান্ত গজাসুর ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রাপ্ত হয় যে, কামপরাজিত স্ত্রী পুরুষ মাত্রেরই সে অবধ্য হইবে। সেই দর্পে জগৎ-সংসার তাহার নিকট তৃণতুল্য বোধ হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাহার ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে; প্রকৃতই ত্রিসংসারে তখন সে একপ্রকার অবধ্য

হইল; কিন্তু মদনবিজয়ী শূলপাণি বিশ্বেশ্বর তাহা জানিয়া জগতের শান্তিস্থাপনার্থে তাহাকে ত্রিশূলবিদ্ধ করিলেন। অসুরপাত তখন অতি কাতরভাবে কত স্তবস্তুতি করিতে লাগিল, শঙ্কর তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদান করিলেন :—"তোমার এই শরীর অবিমুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তিবিধায়ক শ্রেষ্ঠতম লিঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। মহাপাতকনাশক কৃত্তিবাসেশ্বর নামে ইহা পরিচিত হইবে।" দেবাদিদেব দিগম্বর মহাদেব গজাসুরের প্রার্থনা অনুসারে তখন হইতেই তাহার কৃত্তি বা চর্ম্ম চিরদিন উত্তরীয়রূপে পরিধান করিয়া আসিতেছেন। সেই কারণেই তাঁহাকে লোকে 'কৃত্তিবাস' বলিয়া পূজা করে।

বিধিপূর্ব্বক ভক্তিভাবে সপ্তকোটি মহারুদ্রমন্ত্র-জপ করিলে যে ফল, কাশীতে একবারমাত্র কৃত্তিবাসেশ্বর পূজা করিলে সেই ফল হইয়া থাকে। মাঘীকৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি কাশীধামে এই মহালিঙ্গ সমীপে নিশাজাগরণ করিবে, নিঃসংশয়ে তাহার পরম-গতি-লাভ হইবে। চৈত্রীপূর্ণিমায় এই কৃত্তিবাসেশ্বরের সম্মুখে মহোৎসব করিলে, আর তাহার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।

যাহা হউক সেই পবিত্র মন্দির বিধ্বস্ত হইবার পর তাহারই দক্ষিণদিকে রাস্তার উপর, সম্মুখে সামান্য

পুষ্পোদ্যান সমন্বিত এই মন্দির পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। ভক্তমাত্রেরই কাশীতে আসিয়া কৃত্তিবাসেশ্বরের পূজা করা কর্ত্তব্য।

—:০:—

হংসতীর্থ।

উক্ত মন্দিরের অব্যবহিত পশ্চাতে হংসতীর্থ নামক এক প্রসিদ্ধ কুণ্ড অবস্থিত। কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে, পূর্ব্বকথিত গজাসুর ত্রিশূলাঘাতে যে স্থানে পতিত হয়, শূলোৎপাটনকালে সেই স্থানে এই কুণ্ড উৎপন্ন হয়। মানবগণ এই স্থানে স্নান করিয়া কৃত-কৃতার্থ হয়।

কথিত আছে, পুরাকালে একবার বার্ষিকী চৈত্রী-যাত্রা-উপলক্ষে রাশিকৃত অন্ন প্রস্তুত হয়, তদ্দর্শনে বায়-সাদি পক্ষিকুল সমবেত হইলে, গগণমার্গে তাহাদের পরস্পরে যুদ্ধ লাগিয়া যায়, তাহাতে অনেকগুলি কাক বিনষ্ট হইয়া কুণ্ডে পতিত হয় ও কিয়ৎক্ষণ পরে হংসত্বলাভ করে। যাত্রিগণ এই অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া তদবধি এই কুণ্ডকে 'হংসতীর্থ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। সাধারণের ধারণা কাকের সেই ঘোর কৃষ্ণ

মলিনবর্ণসম জীবের অনন্ত পাপকালিমারাশি এ কুণ্ড স্নানে বিধৌত হইয়া হংসবৎ নির্ম্মল ও শুভ্র হইয়া যাইবে।

কয়েকবর্ষ পূর্ব্বে এই কুণ্ডটী রাশিকৃত আবর্জ্জনায় পূর্ণ ছিল, কতকগুলি ধর্ম্মপ্রাণ সদাশয় ব্যক্তির যত্নে ইহার সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়াছে এবং তিন পার্শ্বে উচ্চ ইষ্টক প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বাহ্যিকভাবে ইহা উত্তমরূপে সংস্কৃত হইলেও বহু কালের পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনার দূষিত বিষ এখনও বিনষ্ট হয় নাই। সেই কারণ কুণ্ডেরজল এখনও স্নানের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া রহিয়াছে।

রত্নেশ্বর।

আলমগির-মসজিদ ও কৃত্তিবাসের মন্দিরের মধ্যে রাস্তার উপর দুইটী লোহিত বর্ণের মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়, তন্মধ্যে একটী রত্নেশ্বরের পবিত্র মন্দির। গিরি-রাজ হিমালয় জামাতাকে অত্যন্ত দরিদ্র বিবেচনা করিয়া, বহু রত্নরাজী সমভিব্যাহারে নিজ কন্যা পার্ব্ব-তীকে দেখিতে আসেন, কিন্তু এখানে আসিয়া কাশীর তদপেক্ষা অসংখ্য ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করতঃ লজ্জায় হর-পার্ব্বতীর সহিত আর সাক্ষাৎ না করিয়া

কালভৈরবের উত্তরভাগে সেই সকল রত্নরাজী রক্ষা করিয়া চলিয়া যান। পার্ব্বতী তাহা জানিতে পারিয়া পিতৃপরিত্যক্ত সেই সকল বহুমূল্য স্বুবর্ণ-রত্নাদিদ্বারা রত্নেশ্বরের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেন। বহু গণকর্ত্তৃক সেই মন্দির নির্ম্মিত হইয়া ছিল। বিধর্ম্মী-অত্যাচারে সেই মন্দির বিনষ্ট হইলে, এই বর্ত্তমান মন্দির নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মন্দিরের ভিত্তি খোদিত হয়; তখন মৃত্তিকা হইতে বহু মণিরত্ন বাহির হইয়াছিল। এই মন্দিরটী রাস্তার মধ্যে এমন ভাবে বিনির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহাতে রাস্তার আয়তন ক্ষুদ্র ও তদ্‌সহ বক্র হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, কিছুকাল পূর্ব্বে কোন ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারী ইহাকে স্থানান্তরিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি কি এক অজানিত কারণে তিনি সে অভিলাষ পরে পরিত্যাগ করেন।

দ্বিতীয় মন্দিরটীর মধ্যে হনুমানজী ও আর একটী শিবলিঙ্গ আছে।

গোপাল-মন্দির।

বেনারস টাউনহলের দক্ষিণদিকে গোপলজীর এই প্রকাণ্ড ও প্রসিদ্ধ মন্দির এবং অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত। সহরের মধ্যে এত বড় বড় প্রাঙ্গন ও অসংখ্য গৃহাদি সমন্বিত প্রাসাদসম অট্টালিকা আর নাই বলিলেই হয়, ইহা 'গোপালমন্দির' বলিয়াই পরিচিত। ইহার চারিদিকে ভিন্ন ভিন্ন পথে সাবেকি ধরণে সুবৃহৎ সিংহদ্বার। বল্লভাচারী গোস্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত একজন গোস্বামী এই মন্দিরের অধিকারী। তাঁহারা বংশপরম্পরায় স্ত্রী-পুত্র-কলত্রাদিসহ নানা বিলাসপরিপুষ্ট রাজ-পরিবারের ন্যায় সসম্মানে এই মন্দির বা পুরীমধ্যেই বাস করেন। ইহাঁদের ধন-ঐশ্বর্য্যও নিতান্ত কম নহে। ভূতপূর্ব্ব গোস্বামী মহারাজ বা 'লালবাবার' সহিত সাক্ষাৎ ভাবে আমার পরিচয় ছিল। কাশীধামে যাইলেই তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ না করিলে তিনি দুঃখিত হইতেন। তিনি যেমন সুপুরুষ তেমনি অমায়িক ও সুপণ্ডিত ছিলেন, সর্ব্ববিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার ন্যায় গুণগ্রাহী ব্যক্তি অধুনা সচরাচর দেখা যায় না। রাজসভার অনুকরণে তাঁহার একটী নাতিবিস্তৃত সভা-গৃহ ছিল। তথায় তিনি মকমলের সুকোমল গদির উপর রাজার ন্যায় অথবা

নূতন বরের মত নানা রত্নমালা ও কিংখাপের বস্ত্রাদিতে বিভূষিত হইয়া উপবেশন করিতেন। সভাগৃহের সাজসজ্জাও সম্পূর্ণ রাজোচিত ছিল। সর্ব্ববিষয়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা সভাস্থল উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন। তিনি নিজে একজন অসাধারণ সুবাদক ছিলেন। কাশীর প্রধান প্রধান বৈশ্য, বেণীয়া ও জহুরীগণ গোপাল মন্দিরের শিষ্যমণ্ডলী। তাঁহার সম্মান ও আত্মমর্য্যাদা যথেষ্ট ছিল। গায়কোবাড় প্রভৃতি ভারতের প্রধান প্রধান রাজন্যবর্গও তাঁহাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। প্রায় দুই বৎসর গত হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় লালবাবা নিজেই গোপালজীর অর্চ্চনা করিয়া আরত্রিক করিতেছেন, বহু শিষ্যমণ্ডলী ভক্তিভরে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময় যেমন তিনি আরত্রিক বিধি সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন করিবেন, অমনি তাঁহার শেষ বায়ু গোপালজীর চরণে বিলীন হইয়া গেল। এক্ষণে তাঁহার নাবালক সন্তান এই গোপালমন্দিরের অধিকারী। মন্দিরের অবস্থা দেখিয়া অন্যূন শত বৎসর বা তদপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। গোপালজীর নিত্য যে সমস্ত ভোগ হয়, তাহা মন্দিরের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহপ্রাঙ্গণে পুরী-জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায় নিত্য বিক্রয়

হইয়া থাকে। বহু ব্যক্তি তাহা ক্রয় করিয়া ভোজন করিয়া থাকেন। কাশীদর্শনাভিলাষী বিশেষ বিষ্ণু-উপাসকগণের এই মন্দির অতি অবশ্য দর্শন করা উচিত।

বড়গণেশ।

বেনারাস টাউনহলের উত্তর-পশ্চিম দিকে অথবা মিউনিসিপ্যাল গার্ডেনের ঠিক পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর যাইলেই 'বড়গণেশ-মহল্লা'। এই মহল্লার মধ্যে অনেকগুলি দেবমন্দির বা শিবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বড়গণেশের মন্দিরই প্রধান। এই মন্দিরমধ্যে সম্মুখেই প্রকাণ্ড গণেশমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। চারিদিকে অন্যান্য বহু দেববিগ্রহ ইতস্ততঃ রক্ষিত আছে। সভামণ্ডপে গণপতি-বাহন মূষিকের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নৃসিংহ চতুর্দ্দশীর দিন এখানে একটী মহতী মেলা হইয়া থাকে।

কবির সাহেবের মন্দির।

বর্ত্তমান মিউনিসিপ্যাল আফিসের নিকট 'কবির-চৌরা' মহাল্লায় একটী গলির মধ্যে মহাত্মা কবির সাহেবের মঠ বা মন্দির প্রতিষ্ঠিত। সেই

গলির এক পার্শ্বে একটী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা ক্ষেত্র, চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি গৃহ অট্টালিকা অবস্থিত। এই স্থানই কবিরের গদি বা প্রধান আখড়া বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের প্রধান মোহান্ত ও বহু কবিরপন্থী সাধুসন্ন্যাসী নানা স্থান হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রাঙ্গণমধ্যে পূর্ব্বগত মহান্তগণের কয়েকটী সমাধি-মন্দিরও আছে। উক্ত গলির অন্য প্রান্তে একটী পুষ্প বাটীকা আছে। এটী কবির-পন্থাবলম্বী গৃহস্থগণের জন্য অতিথিশালারূপে ব্যবহৃত হয়। গলির উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাদ্বয় গলির উপরস্থিত একটী ক্ষুদ্র সেতুদ্বারা সংযুক্ত থাকিলেও নিম্নে পরস্পরের স্বতন্ত্র দ্বার আছে।

এই মঠ হইতে কিয়দ্দূরে 'লহরতলাও' বা 'লহর-তারা' মহল্লা পথ, উহারই দক্ষিণ পার্শ্বে এক উচ্চ ভূমি-খণ্ডের উপর একটী সুন্দর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্বে একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী আছে, তাহাই 'লহরতালাও' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ইহা বেনারাস হইতে এলাহাবাদ বা প্রয়াগ যাইবার পথে ৪২৩ সংখ্যক মাইল প্রস্তরের অতি নিকটেই। কথিত আছে, কবির সাহেব শৈশবা-বস্থায় এই কুণ্ডে বা পুষ্করিণী মধ্যেই আবির্ভূত হন।

এতদ্‌সম্বন্ধে 'কাশীর মহাত্মাগণ' অংশে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল। উক্ত মন্দির মধ্যে কবির সাহেবের পাদুকা চিহ্ন রক্ষিত আছে, ভক্ত ও শিষ্য-মণ্ডলী তাহাকেই সাক্ষাৎ কবির সাহেব বলিয়া পূজা-চর্চ্চনা করিয়া থাকেন। অনেকে বলেন ইহাই কবির সাহেবের বৈঠক। এই স্থানে সতত: একজন কবির শিষ্য বা কবিরদাসী অবস্থান করিয়া থাকেন। মন্দির সংলগ্ন ভূমিখণ্ডে কয়েকটী সাধকের সামাধি আছে।

ঈশ্বরগাঙ্গীতলাও।

ঈশ্বরগাঙ্গীতলাও বা কুণ্ড অনাদিকাল হইতেই আছে, এইরূপই শুনিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক এতাধিক পুরাতন পুষ্করিণী এক্ষণে কাশীতে আর নাই। ইহার চারি কোণেও অন্যান্য দুই এক স্থানে অনেক দেব-বিগ্রহ পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে একটী মকরবাহনে গঙ্গামূর্ত্তি ও আর একটী সূর্য্যমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে কয়েকটী গৃহে রামায়ৎ সন্ন্যাসীরা বাস করে এবং তাহারা নিত্য সন্ধ্যার সময় তথায় রামায়ণ গান করিয়া থাকে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাতৃতীয়ায় এই স্থানের হিন্দুস্থানী রমণীগণের একটী মেলা হয়, তাহারা

দলবদ্ধ হইয়া কাশীর সুপ্রসিদ্ধ 'কাজরী-গীত' ঐ দিবস গাইয়া থাকে।

ঈশ্বরগাঙ্গীর নিকটেই যাগেশ্বরের ক্ষুদ্র মন্দির। মন্দিরান্তর্গত যাগেশ্বর মহাদেব ব্যতীত বাহিরে অন্যান্য বহু প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে।

পাতাল-পুরিয়াস্থান।

উক্ত যাগেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বেই পাতাল পুরীয়া-স্থান। ইহার বাহিরে কয়েকটী মোসলমানী সমাধি-স্তূপ ও একটী বিকৃত শার্দ্দুলমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে একটী বাটীতে দশটী সাধু থাকিবার উপযুক্তস্থান আছে। দুই দশজন সাধু যাঁহারা সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকেন, তাঁহারা সকলেই বিষ্ণু-উপাসক সন্ন্যাসী। শিব ও হনুমানজী প্রভৃতির কয়েকটী মূর্ত্তি ব্যতীত ইহার মধ্যে একটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে—ভূমিতলে একটী গহ্বর আছে। কথিত আছে, এই গহ্বর পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহার সীমা নাই। মর্ত্তলোক হইতে পাতালে যাইবার এই পথ, সেই কারণ ইহার নাম পাতালপুরীয়া স্থান। গহ্বরের মুখ সততঃ তালাবদ্ধ থাকে, কেহই তাহার ভিতর দেখিতে পায় না, হয়ত বহুদূর বিস্তৃত কোনও সুড়ঙ্গ থাকিতে পারে।

কর্ণঘণ্টা বা ঘণ্টাক

এ প্রদেশবাসী সাধারণ ব্যক্তি এই ঘণ্টাকর্ণ তীর্থকে করণঘণ্টা বা কর্ণঘটা বলিয়া উল্লেখ করে। প্রাচীন ইতিহাস সকলের মধ্যে ইহা ঘণ্টাকর্ণ হ্রদ বলিয়াও বর্ণিত আছে। ইহা একটী প্রসিদ্ধ প্রাচীন পুষ্করিণী বা কুণ্ড। ইহারই তীরে ঘণ্টাকর্ণ নামক জনৈক গণকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঘণ্টাকর্ণেশ্বর শিবলিঙ্গ আছে। ইহার চারিপার্শ্বস্থ পল্লী 'করণঘণ্টা বা কর্ণ্‌ঘটা মহল্লা' বলিয়া পরিচিত। বর্ত্তমান টাউনহলের অনতিদূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এই মহল্লা অবস্থিত।

ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের তীরেই বেদব্যাসেশ্বর মন্দির। এই মন্দিরমধ্যে বেদব্যাসের মূর্ত্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

ঘণ্টাকর্ণ হ্রদের নিকটেই চিত্রঘণ্টা ও চিত্রঘণ্টেশ্বরীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দিরস্থিত মূর্ত্তি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই সকল তীর্থ দর্শন করিবার জন্য প্রতি শ্রাবণ মাসে এখানে বেশ মেলা হইয়া থাকে।

কাশীদেবী।

পূর্ব্বোক্ত মহল্লার অনতিদূরে কাশীপুরা নামক এক মহল্লা আছে, তথায় একটী বৃহৎ বট-বৃক্ষমূলে কাশীর অধিষ্ঠাত্রী কাশীদেবীর অতি প্রাচীন মন্দির এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কাশী দর্শনাভিলাষী ভক্ত যাত্রীগণ এই শক্তিপীঠ দর্শন করিয়া নিজেদের কৃতার্থ মনে করেন। অনেকের বিশ্বাস, এই কাশীদেবীর মন্দিরই কাশীধামের কেন্দ্রস্থল। এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ উত্তরে ভূত ভৈরবের মন্দির, এইস্থানে বারগণেশ ও জগন্নাথাদি বহু দেবমন্দির অবস্থিত।



মৎস্যোদরী।

কাশী সহর হইতে রাজঘাট যাইবার পথে টাউনহল ছাড়াইয়া উত্তর পূর্ব্বদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই মৎস্যোদরীর প্রাচীন তীর্থ বা কুণ্ড দৃষ্ট হইত। কাশীখণ্ড ও শিবপুরাণাদিতে ইহার বিশেষ উল্লেখ আছে। এই তীর্থে স্নান করিলে মানবের বারম্বার জন্মগ্রহণ জনিত গর্ভযন্ত্রণা বিদূরিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় পুণ্যকামী ভক্তের সে বাসনা পরিতৃপ্তির আর উপায় নাই। বহুদিন হইতে মৎ-

স্যোদরী কুণ্ডের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া সর-কার পক্ষ হইতে তাহা ক্রমে মৃত্তিকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বালককালে মৎস্যোদরীতে সামান্য জল দেখিয়া ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহা প্রায় সমভূমি হইয়া গিয়াছে, সে তীর্থের আর চিহ্নমাত্রও নাই বলিলে হয়। এক্ষণে মাত্র একটী ঘাট বিদ্যমান আছে। এখন আর কাহাকেও তীর্থ বলিয়া তথায় যাইতে দেখা যায় না। উহার নিকটেই একটী অতি জীর্ণ মন্দির রহিয়াছে, তাহার মধ্যে ময়ূরবাহন মৎস্যেশের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মন্দির-মধ্যে নরসিংহেরও একটী মূর্ত্তি আছে। নিকটেই মহর্ষি দুর্ব্বাসারও একটী জীর্ণমূর্ত্তি রহিয়াছে। কাশী-খণ্ডোক্ত প্রসিদ্ধ ওঁকারেশ্বরলিঙ্গের বা প্রণবেশ্বর মহা-দেবের মন্দিরও এই মৎস্যোদরীর উত্তরদিকে গলির মধ্যে অবস্থিত। এই পল্লী ওঁকারেশ্বর মহল্লা বলিয়া পরিচিত।

গঞ্জীসাহিদান মস্ক।

ইহা একটী ক্ষুদ্র প্রাচীন মস্‌জীদ। প্রায় পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে ইহা পুনরায় লোকনয়নের নিকট আবিষ্কৃত হই-য়াছে। রাজঘাটের সন্নিকট জনৈক মুসলমান ভদ্র-

লোকের বাটীর পার্শ্বে তাহারই অধিকৃত কয়েক বিঘা পতিত ভূমি ছিল। এক দিবস তাঁহার ভৃত্য কোনও কার্য্যোপলক্ষে সেই স্থানে যাইলে একটী বড় গর্ত্ত দেখিতে পায় ও অনতিবিলম্বে তাহার প্রভুকে এবিষয়ে সংবাদ দেয়। সেই ভদ্রলোকটী সামান্য মৃত্তিকা উঠাইয়াই নিম্নে একটী গৃহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন। গুপ্ত ধনাগার ভাবিয়া প্রথমে কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া তাহা খনন করিতে থাকেন, পরে এই সুন্দর মসজিদটী বাহির হয়। ৬০টী স্তম্ভ বিশিষ্ট সুন্দর গৃহটী মোসলমানী ধরণে নির্ম্মিত হইলেও তাহার স্তম্ভাদির কারুকার্য্য দেখিলে বৌদ্ধ স্থাপত্যের সুস্পষ্ট আভাস বলিয়া মনে হয়। অনেকেই অনুমান করেন, পূর্ব্বে ইহা কোন বৌদ্ধবিহার ছিল, পরে মোসলমান আধিপত্য সময়ে মস্‌জিদে পরিণত হইয়া থাকিবে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের ইহা দেখিবার বিষয়।

লাটভৈরো।

রাজঘাট ষ্টেসন হইতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্করোড ধরিয়া উত্তর পশ্চিম দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই বেঙ্গল নর্থওয়েষ্ট রেলওয়ের ছোট লাইন দৃষ্ট হইবে, সেই রেল

পথ পার হইয়াই সামান্য উত্তরদিকে যাইলে এই লাটভৈরবের প্রসিদ্ধ স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বেই একটী বিস্তৃত পুষ্করিণী, অথবা উক্ত পুষ্করিণীর উত্তর পাড়েই এই স্তম্ভটী প্রোথিত। এই পুষ্করিণীর বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে এই স্তম্ভের কথাই বলিতেছি—ইহার সহিত একটী বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে। সাধারণের নিকট ইহা লাটভৈরব বলিয়া পরিচিত হইলেও, ঐতিহাসিকগণ ইহাকে কুলস্তম্ভ বলিয়া অভিহিত করেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থেও কুলস্তম্ভের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেকে এই স্তম্ভ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ বলেন, ইহা বৌদ্ধরাজ অশোকের প্রতিষ্ঠিত; কেহ বলেন, তাহা নহে বিক্রমাদিত্যই ইহার প্রতিষ্ঠাতা। যিনিই ইহার প্রতিষ্ঠাতা হউন না, ইহা এক্ষণে সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থস্তম্ভ বলিয়া পূজিত। কাশীবাসী হিন্দুমাত্রের চিরবিশ্বাস ইহাই সনাতন ধর্ম্মের মূলস্তম্ভস্বরূপ। ইহা আছে বলিয়াই এখনও ধর্ম্ম আছে—যে দিন ইহা সমূলে ধ্বংস হইবে সেই দিন এই সনাতন ধর্ম্মও চিরতরে বিলুপ্ত হইবে। সেই কারণ কাশীর প্রত্যেক ধর্ম্মযাজক পাণ্ডাগণ অতি সাবধানে ইহা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, পূর্ব্বে ইহা বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সম্রাট আওরঙ্গজেব যখন সেই মন্দির ধ্বংস করিয়া মস্‌জিদে পরিণত করেন, তখনও ইহা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় ছিল, ইহাদ্বারা মস্‌জিদ প্রাঙ্গণের-শোভা-বর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই ইহাতে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই, বিশেষ ইহা হিন্দুর যে এত আদরের সামগ্রী, হয়ত তাহা সম্রাট বা তাঁহার প্রতিনিধিবর্গের আদৌ জানা ছিল না, সুতরাং মস্‌জিদান্তর্গত হইলেও হিন্দুগণ নিরুদ্বেগে যথারীতি স্তম্ভের পূজা অর্চ্চনাদি করিয়া আসিতেছেন।

ধর্ম্মস্থানাধিকারী যাজক বা পূজারীদিগের অবস্থা সর্ব্বধর্ম্মে সর্ব্বস্থানেই প্রায় একরূপ; অর্থলালসায় এই সকল লোক ক্রমে কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানশূন্য হইয়া ধর্ম্মস্থানের আবর্জ্জনারূপে পরিণত হয়। কোন ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষেই ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থ এমনই অনর্থের মূল! হিন্দু যাত্রীগণ মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণে আসিয়া সেই স্তম্ভের পূজা করে—রীতিমত দর্শনী দেয়—হিন্দু পাণ্ডারই তাহা প্রাপ্য হইলেও সুবিধামত মোল্লাসাহেব ও তদনুচরগণ তাহাতে ভাগ বসাইতে আরম্ভ করিলেন। লালসা ক্রমে বাড়িয়া উঠিল, পূজা দর্শনীর অংশমাত্র লইয়া তাঁহারা আর তৃপ্ত হইতে পারিলেন না—সর্ব্বগ্রাসই তখন তাঁহাদের অভিপ্রেত হইল।

কিন্তু হিন্দুর হৃদয়ে তাহা সহ্য হইবে কেন? দুই এক কথায় অসন্তোষের বহ্নি প্রধূমিত হইতে লাগিল। অনন্তর ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে দৈবদুর্ব্বিপাকে হিন্দুর হোলি ও মোসলমানের মহরম পর্ব্ব একই সময়ে সংঘটিত হয়, উভয় পক্ষই তখন ধর্ম্মোন্মত্ততার আবরণে যেন রণোন্মত্ত। স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য দাঙ্গা হাঙ্গামাও চলিতেছিল—মোসলমানগণ সহসা সহিষ্ণুতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া সেই স্তম্ভের কিয়দংশ ভগ্ন করতঃ গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিল। তাহাতে হিন্দুমাত্রই তখন ক্ষোভে ও রোষে ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠিল, উভয় পক্ষের ভীষণ দাঙ্গায় শত সহস্র ব্যক্তি হতাহত হইল। ক্রোধোন্মত্ত মোসলমানগণকর্ত্তৃক সেই স্তম্ভের মূলোৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল—গোরক্তে হিন্দুর পবিত্র মন্দির সকল কলুষিত হইল। হিন্দুগণও ঘোর প্রতিহিংসাবশে মসজিদসমূহ চূর্ণ ও ভস্ম করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল ঘটনা দেখিয়া শান্তিপ্রিয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, যোগী সন্ন্যাসী, ধর্ম্মপ্রাণ ও ধর্ম্মভীরু আবাল বৃদ্ধ বনিতা পূর্ব্ব ধারণাবশে কুলস্তম্ভের ধ্বংস, দেবালয় ও দেববিগ্রহ-সমূহের এরূপ দুর্দ্দশা দৃষ্টে সনাতন ধর্ম্মের এককালীন বিনাশ ও প্রলয়ের প্রত্যক্ষ পূর্ব্বাভাস বোধে সকলেই পতিতপাবনী গঙ্গাগর্ভে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য অকাতরে ঝাঁপ দিতে লাগি-

লেন। চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। এ এক অপূর্ব্বঘটনা, হিন্দু সতীর জহর-ব্রতের ন্যায় এরূপ সর্ব্বজনীন অদ্ভুত ব্যাপার ভারতের ইতিহাসে আর কখনও ঘটে নাই। এক মুহূর্ত্তমধ্যেই কাশীর সকল সন্তপ্ত হিন্দু প্রজা ধ্বংস হইতেছে দেখিয়া ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী অনতিবিলম্বে বিশিষ্ট ও শাস্ত্রবিদ্ অধ্যাপকগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া গঙ্গাতটে উপস্থিত হইলেন ও বিবিধ বিধানে সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপকগণের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি সকলকে বলিলেন, যথারীতি শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন করিলে বিশ্বনাথের কৃপায় পুনরায় ভারতের ধর্ম্মরক্ষা হইবে, অচিরে সকল গোলযোগ বিদূরিত হইবে এবং বিধর্ম্মীদিগের দ্বারা যাহাতে আর কোনরূপ অত্যাচার না ঘটিতে পারে, সে বিষয় ব্রিটীশ-গবর্ণমেণ্ট বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন, এরূপ ভরসা দিলেন ও প্রতিজ্ঞাও করিলেন। অনতিবিলম্বে এই সকল দুর্ঘটনার শান্তি হইলে পূর্ব্বোক্ত পুষ্করিণীতীরে পুনরায় সেই ভগ্ন কুলস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইল। সেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিন ও তিথি লক্ষ্য করিয়া তখন হইতে প্রতি বৎসর এই স্থানে একটী মহতী মেলা বসিয়া থাকে। সেই ভগ্নস্তম্ভ এক্ষণে তাম্রাবরণে আবৃত আছে। এই স্তম্ভের

নিকটেই মসজিদের ভগ্নাবশেষ বহু প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অনতিদূরে একটী ক্ষুদ্র স্থান মোসলমানগণকর্ত্তৃক অতি যত্নে সংরক্ষিত আছে, তথায় তাহারা নিত্য নেমাজ করিয়া থাকে।

কপালমোচন তীর্থ।

ইতিপূর্ব্বে লাটভৈরবের পার্শ্বে যে পুষ্করিণীর উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই কপালমোচন-কুণ্ড বা তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, আদিকালে ব্রহ্মাও পঞ্চানন বিশিষ্ট ছিলেন, পরে কালভৈরবকর্ত্তৃক তাঁহার পঞ্চম-মস্তক দেহচ্যুত হইলে, তিনি চতুরানন বলিয়া পরিচিত হন। কিন্তু কালভৈরব এই ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাপে লিপ্তহইয়া তাহার অপনোদনজন্য সেই ব্রহ্মা-কপালহস্তে কাপালিক-ব্রত অবলম্বন করিলেন, নানা তীর্থ-পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, কোনস্থলেই তিনি সেই কপাল মোচন করিয়া পাপবিমুক্ত হইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পরম পবিত্র পুণ্যভূমি কৈলাসসম কাশীধামে উপস্থিত হইলেন, কাশী পরিক্রমমধ্যে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার সেই মহাপাপ বিমুক্ত হইল ও হস্ত হইতে সেই ব্রহ্মকপাল নিপতিত হইল। সেই ব্রহ্মকপাল পতিত হইয়াই এই সুবৃহৎ কুণ্ড উৎপন্ন

হইয়াছে। ইহাই কপালমোচন তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাত্রীগণ এখানে আসিয়া স্নান ও পূর্ব্বপুরুষের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

বথরিয়াকুণ্ড।

আলাইপুরা বা বেনারাসসিটী ষ্টেসনের দক্ষিণ-দিকে বথরিয়াকুণ্ড। কাশীখণ্ডে ইহাই বর্করিকুণ্ড বা ছাগকুণ্ড বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই কুণ্ড-টীর জলকর প্রায় ১০।১২ বিঘা হইলেও গ্রীষ্মকালে ইহা অনেকটা শুকাইয়া যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে এক্ষণে মোসলমানদিগের বস-বাসই অধিক, সুতরাং বথরিয়াকুণ্ড-মহল্লা অধুনা একপ্রকার দরিদ্র মোসল-মান-পল্লীরূপে পরিণত। এই কুণ্ডের চারিদিকে নানা আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহার আর সংস্কার হয় না, ক্রমেই তাহা যেন পরিত্যক্ত জঙ্গলে পরিণত হই-তেছে, ন্যূনাধিক দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহার অবস্থা এরূপ ছিল না। সেই অতীত দিবসে ইহার অবস্থার কথা কল্পনারচক্ষে দেখিবার বিষয়, তখন ইহা অতীব সুন্দর পরম শান্তিপ্রদ ও চিত্তবিনোদক ধর্ম্মস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তখন এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে সুন্দর ও মনোহর মন্দির, স্তূপ, চৈত্য ও বৌদ্ধবিহারে

সুশোভিত ছিল। আসিয়াখণ্ডের প্রান্ত-চতুষ্টয় হইতে কত শত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণগণ পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মালোচনায় সততঃ এই কুণ্ডের চারিধার মুখরিত করিয়া রাখিতেন, সে ভাব এখন চিন্তা করিবামাত্র হৃদয় যেরূপ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়, কুণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দেখিলে সেইরূপই গভীর দুঃখ ও পরিতাপে হৃদয় মুহ্যমান হইয়া পড়ে। কুণ্ডের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম কোনদিকেই আর সেই শ্রেণীবদ্ধ সোপানসমূহ নাই, সোপানের উপর প্রস্তরময় সেই বিস্তৃত পথ নাই, পথিপার্শ্বে সেই পবিত্র চৈত্য, স্তূপ, বা মন্দিরাদি নাই, সকলই চূর্ণ বিচূর্ণ দলিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। রাশি রাশি স্তম্ভ ও ইষ্টক-প্রস্তরাদি-উপাদান অপহৃত ও স্থানান্তরিত হইয়াছে। যাহা আছে, তাহা কতক বিধ্বস্ত, কতক ভগ্নাবশেষ প্রস্তর ও আবর্জ্জনা রাশিতে পর্য্যবসিত, আর অবশিষ্ট পল্লীবাসী মোসলমানদিগের আবাসগৃহ ও মসজিদে পরিণত হইয়াছে। বহুরূপী মহাকাল, তুমিই ধন্য; তোমারধর্ম্ম—তোমার ক্রিয়া কলাপাদি কোন কিছুই আমাদের বুঝিবার শক্তি নাই, তুমি পক্ষপাত-পরিশূন্য অনাদি ও অনন্তকাল; তোমার নিকট হিন্দু মোসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টানের, বিভেদ নাই; আবার তুমি যে সাক্ষাৎ আশুতোষ, যে তোমাকে ভক্তি করে, তুমি

তাহারই যে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে যাইয়া তোমায় অনেক সময় তাহারই সেবা করিতে হয়। তাই তোমায় যে যেমন ভাবে সাজাইয়া সুখী হয়, তুমি সেই রূপই ধারণ করিয়া তাহার চিত্ত-বিনোদন কর। ভারতের সেইদিন আর ইহদিন দেখিলে, তুমি মহাকাল, তোমার হয়ত সুখদুঃখ না হইতে পারে, কিন্তু আমরা দুর্ব্বলচিত্ত মানব, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া সন্তপ্ত হই, তোমায় ঠিক ভক্তি-তুষ্ট করিতে পারি না, তবে অক্ষম হৃদয়ের অসন্তোষের ফল তোমায় কলঙ্কিত করিয়াই যেন কথঞ্চিত তৃপ্ত হইয়া থাকি।

কুণ্ডের চারিপার্শ্বস্থ পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও বর্ত্তমান আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি। কুণ্ডের দক্ষিণপার্শ্বে সম্মুখভূমির উপর তিনটী উচ্চ মসজিদ এবং তাহার মধ্যে প্রাচীরবেষ্টিত বহুসংখ্যক সমাধিস্তূপ এবং সম্মুখে কুণ্ডে নামিবার প্রস্তরময় ভগ্ন ও জীর্ণ সোপানশ্রেণীর শেষ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। পশ্চিমদিকের মসজিদ-প্রাঙ্গণে একটী অনুচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখিলে (চিরাক্‌দান) বাতিদান বলিয়া মনে হয়, পল্লীবাসিগণ এখনও তাহার উপরেই সামান্য তৈলের প্রদীপ রাখিয়া কুণ্ড-পার্শ্বস্থিত সেই অসংস্কৃত

পথ আলোকিত করিয়া রাখে। অষ্টস্তম্ভবিশিষ্ট মধ্য-মসজিদটী অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া মনে হয়, বিশেষ উহার পশ্চাতের চারিটী স্তম্ভ যেরূপ ধরণে গভীর-ভাবে খোদিত, তাহাতে উহা যে বারাণসীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন স্থাপত্যের আদর্শ সে বিষয়ে বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ এক বাক্যেই স্বীকার করেন। সম্মুখের স্তম্ভচারিটীর নিম্নদেশ অষ্টপল বিশিষ্ট, মধ্যভাগ ষোড়শ পল বিশিষ্ট এবং ঊর্দ্ধাংশ সম্পূর্ণ গোলাকার। এই আটটী স্তম্ভই বিশাল-দর্শন, কিন্তু অতি অল্পমাত্রই স্থাপত্যা-লঙ্কারে পরিশোভিত। পূর্ব্বপার্শ্বের মসজিদেও চারিটী প্রাচীন স্তম্ভ আছে। চারিটীই প্রায় একরূপ চতুষ্কোণ, কিন্তু একটী অতি সামান্য অলঙ্কারযুক্তভাবে খোদিত। এই মসজিদের প্রবেশদ্বার বিশেষ নয়না-কর্ষক। ইহার কারুকার্য্যগুলি প্রস্তরগাত্রে গভীর-ভাবে খোদিত না হইলেও ইহার সুতীব্র সীমারেখা-সমূহ প্রকৃত সুশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। ইহা দেখিয়া বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য-শিল্প বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। কিন্তু ইহার উপরের অংশের কতক-গুলি কার্য্য দেখিলে আধুনিক অথবা মোসলমানদিগের দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যখন তাঁহারা সেই প্রাচীন মঠ ও স্তম্ভগুলিকে লইয়া মসজিদে পরিণত করিয়াছিলেন, তখনই এই সকল

নূতন কার্য্য তাঁহাদিগেরদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকিবে। দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকের মসজিদটী একটী চতুষ্কোণ চৈত্যের অনুরূপ। ইহার গম্বুজটী মোসলমানীয়, কিন্তু স্তম্ভ চারিটী যে প্রাচীন যুগের, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ইহাদের নিম্নভাগ সরল ও চতুষ্কোণ, কিন্তু উপরের অংশ সারনাথের স্তূপের ন্যায় বিচিত্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট, ইহার পশ্চিমদিকে 'বত্তিসথাম্বা' নামে একটী গম্বুজ-বিশিষ্ট মন্দির আছে। গম্বুজটী বোধ হয় মোসনমান-দিগের দ্বারা আংশিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু স্তম্ভ-গুলি যে সেই অতীত যুগের, তাহা দর্শনমাত্রই সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহার তিনপার্শ্বে তিনটী বারাণ্ডা আছে। ইহার পশ্চিমপার্শ্বে ও উত্তর পশ্চিমদিকে এবং কুণ্ডের পশ্চিমতীরে কয়েকটী মোসলমান ফকিরের সমাধিস্তম্ভ রহিয়াছে। যাহা হউক এই সকল স্থান বহুদিন মোসলমানদিগের অধি-কারভুক্ত রহিয়াছে, সেই কারণেই বোধ হয় কোন পুরাতত্ত্ববিদের দ্বারা মৃদগর্ভস্থিত অন্যান্য অংশ আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। আমাদের মনে হয়—কাশীর সারনাথ স্তূপের পর এরূপ প্রাচীন স্থাপত্য-শিল্প-পরি-পূর্ণ স্থান কাশীর মধ্যে আর নাই। এখনও যে সকল প্রস্তর-স্তম্ভ ও ছাদ স্তূপীকৃত মৃত্তিকায় সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহা দেখিলে ইহা যে বৌদ্ধযুগে একটী শ্রেষ্ঠ

সংঘারাম ছিল, তাহা বুঝিবার পক্ষে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব হয় না। যদিও এই পুণ্যময় প্রাচীন তীর্থ ও সংঘারামের বহুসংখ্যক প্রস্তরাদি-উপাদান অপসারিত ও বিনষ্ট হইয়াছে, যদিও 'বেনারস-কলেজ' ও 'বরুণাব্রীজ' প্রস্তুতকালে ইহা হইতে যথেষ্ট উপদান সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এমন অনেক জিনিস এখনও আছে, যাহাতে কালে প্রাচীন কাশীর অনেক পুরাতত্ত্ব জানিতে পারা যাইবে।

সারনাথ বা সারঙ্গনাথ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে মহামুনি শাক্যসিংহ বা গৌতমবুদ্ধ তাঁহার পবিত্র ধর্ম্মমত এই পুণ্যভূমি কাশীধাম হইতেই প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সেই পঞ্চবিংশতিশত বৎসর পূর্ব্বে, যখন ভারত বিকৃত-বৈদিক-যজ্ঞ ও তন্ত্র-সাধনার ব্যাভিচার-কল্পে সিদ্ধ-সনাতন ধর্ম্মের আবরণে রসনাতৃপ্তি-লালসায় বীভৎস জীবহিংসা-বৃত্তির চরম সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখনই জগৎপ্রতিপালক ভগবান বিষ্ণু নিজ নবমঅবতারে বুদ্ধরূপে ভারতে আবির্ভূত হইলেন ও "অহিংসা পরমোধর্ম্ম" এই মহামন্ত্রের প্রচার করতঃ জগতে পুনরায় শান্তি ও সাময়িক

নূতন ধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। সেই নবপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রথম প্রচার-কার্য্য এই সারনাথ বা সারঙ্গনাথের মন্দির-সমীপবর্ত্তী স্থান হইতেই আরম্ভ হয়। সেই নির্দ্দিষ্ট জনপদস্থিত ভূমিখণ্ড, যথায় ভগবান বুদ্ধ নিজ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজভক্ত শিষ্যমণ্ডলীকে উপদেশ প্রদান করিতেন, যথায় উপবেশন কবিয়া প্রাচীন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী সাধু সন্ন্যাসী ও ধর্ম্মাচার্য্যাদগের সহিত সুগভীর ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনা ও বিচার সিদ্ধান্ত করিতেন, প্রচলিত ধর্ম্মমতের খণ্ডন করিয়া নিজ অভিনব মতের সমর্থন করিতেন, যে শক্তিশালী স্থানের প্রভাবে সমগ্র জগতের অর্দ্ধাধিক মানব-সমাজ এখনও এই ভারতকে অসঙ্কোচে তাহাদের গুরুপীঠ বলিতে আনন্দানুভবকরে,—ভগবান বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের অব্যবহিত পরেই সেই সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর তদীয় শিষ্যমণ্ডলীকর্ত্তৃক তাঁহার একটী অনতিদীর্ঘ স্মারকস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। অনন্তর প্রসিদ্ধ ভারতসম্রাট বৌদ্ধধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ প্রচার-কর্ত্তা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক মহাত্মা অশোক, সেই নির্ব্বাণ-ধর্ম্মোপদেশক বুদ্ধদেবের পূর্ব্ব নির্ম্মিত সেই সংকীর্ণ স্মারকস্তূপ বিচিত্র ও বিরাট আকারে পুনর্গঠিত করাইয়া দেন। তাহাই এক্ষণে 'সারনাথস্তূপ' বা 'ধমেক' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

এই পবিত্রস্তূপ জীর্ণ-দীর্ণ হইয়াও ভারতের কত অতীত ঘটনা, কত জ্ঞান-গৌরব ও প্রিয়দর্শী সম্রাট অশোকের কত অলৌকিক কীর্ত্তি-কলাপ, কত শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জগতের পুরাতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিত-সমাজ ও বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই 'ধমেক' দেখিবার জন্য এই অবিমুক্ত-ক্ষেত্র কাশীধামে সততই আসিয়া থাকেন। 'ধমেক' ইহা এক বিচিত্র শব্দ, সহসা ইহার কোনওরূপ অর্থ বোধ হয় না, তবে ইহা যে, কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রাচীন শব্দের অপভ্রংশ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেককেই এই বিচিত্র শব্দালোচনায় বিশেষ চিন্তা ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। সুপণ্ডিত কানিংহাম প্রভৃতির গভীর আলোচনার ফলে সিদ্ধ হইয়াছে যে, পালী বা পাটলীপুত্রের ভাষায় "ধর্ম্ম" শব্দ 'ধম্ম' এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে, সুতরাং তখন 'ধর্ম্মোপদেশক' 'ধম্মোপদেশক, এইরূপ লিখিত হইত, ক্রমে উহা লোকমুখে সংক্ষিপ্ত হইতে হইতে 'ধম্মোদেশক' পরে 'ধম্মোদেয়ক' অবশেষে 'ধমেয়ক' বা 'ধমেক' এইরূপ সংকীর্ণতম শব্দে পরিণত হইয়াছে। স্তূপ একটী সাধারণ শব্দ, কিন্তু এক্ষেত্রে তাহার বিশেষত্ব রক্ষার জন্য প্রধানস্তূপ, অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান ধর্ম্মচক্র

এই স্থান হইতেই পরিচালিত হইয়াছিল, তাহারই স্মরণার্থ এই ধর্ম্মোপদেশক স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে সেই ধর্ম্মোপদেশকের অপভ্রংশ ধমেক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান কাশীসহরের ঠিক উত্তরদিকে সহরের বাহিরে এই সারনাথস্তূপ বা ধমেক অবস্থিত। ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেসন হইতেও ইহা প্রায় দুই ক্রোশ হইবে। সাধারণ যাত্রীগণ সহর হইতে গাড়ি বা একা-করিয়া সারনাথ দেখিতে যান। কেহবা বেনা-রাস ক্যাণ্টনমেণ্ট-ষ্টেসন হইতে বেঙ্গল-নর্থ-ওয়েষ্ট রেলগাড়িতে চড়িয়া সারনাথ-ষ্টেসনে নামিয়া সার-নাথ দেখিয়া আসেন। স্থানটী বর্ত্তমান সময়ে বেশ নির্জ্জন, নিকটেই একটী সমুচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ, নানাবৃক্ষ-লতায় সমাচ্ছাদিত তপোবন-সদৃশ অতি মনোরম স্থান, মধ্যাহ্নে সেই বিমল ছায়া-শোভিত স্নিগ্ধ তরুমূল বড়ই প্রীতিপ্রদ, বড়ই রমণীয় বলিয়া বোধ হয়। বিশেষ, সেই তরুরাজিমধ্যে সারনাথেশ্বর শিবমন্দির ও তৎসহ সেই অনতিদীর্ঘ বিশ্রাম-গৃহটী যাত্রীগণের নিতান্তই চিত্ত-বিনোদক। অনেকে সহর হইতে আসিয়া এখানে বন-ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রাতে রন্ধনাদির সকল উপাদানসহ এখানে আসিয়া উপস্থিত হন, মধ্যাহ্নে সারনাথ দর্শন করিয়া

ভোজনান্তে বিশ্রাম করণান্তর সায়াহ্নে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সারনাথেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটী অতি প্রাচীন, ইহা কাশীর সাধারণ প্রস্তরগঠিত মন্দিরের অনুরূপ নহে, বরং কতকটা তাম্রলিপ্তের বর্গভীমার মন্দিরের অনুরূপ বলিতে পারা যায়। মন্দিরমধ্যে সারনাথ শিবলিঙ্গ বিরাজিত। কেহ কেহ বলেন, এই সারনাথ ও বখতিয়ার-খিলিজি-বিধ্বস্ত সোমনাথলিঙ্গ একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী পণ্ডিতগণের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে কাশীমাহাত্ম্যবর্ণিত সঙ্ঘেশ্বর মহাদেব এই সারনাথ শিবের নামান্তর। সারনাথের বৌদ্ধপ্রভাব মন্দিভূত হইলে, হিন্দুগণ এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধবিহার বা সঙ্ঘারামের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বোধ হয় এই শিবলিঙ্গটী সঙ্ঘেশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু এই বনাকীর্ণ স্থানটীর অবস্থা দেখিলে ইহা বহু প্রাচীন দেবালয় বলিয়াই বোধ হয়।

এই মন্দিরের পাদমূলে একটী অনতিদীর্ঘ পুষ্করিণী। ইহার জল মন্দ নহে। পুষ্করিণীটী বর্ত্তমান সময়ে ক্ষুদ্রাকার হইলেও পূর্ব্বে ঠিক এমনটী ছিল না, তখন ইহা এক প্রকাণ্ড হ্রদে পরিণত ছিল। সে

হ্রদের এখন চিহ্নমাত্রই আছে, বর্ষায় তাহা সামান্ত জলপূর্ণ হইলেও অন্যান্য ঋতুতে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়, তখন তাহার উপর অনেক স্থলে রীতিমত হলকর্ষণদ্বারা চাষ হইয়া থাকে। সেই কারণ পরবর্ত্তী সময়ে হ্রদ-মধ্য-স্থিত এই পুষ্করিণীটী খোদিত হইয়াছে। এই হ্রদ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঈশীপত্তন অথবা ঋষিপত্তন বলিয়া পরিচিত ছিল। সেই অতীত যুগে ইহা মৃগদাব উপবন বলিয়াও বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, মৃগদাব সম্বন্ধে 'যাতক' ও 'ললিতবিস্তরাদি' বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক কথা লিখিত আছে। সে সকল বিস্তৃত আলোচনা এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবপর নহে। যাহা হউক 'ধমেক' শব্দের ন্যায় 'সারনাথ' শব্দও সারঙ্গনাথ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মৃগদাব উপবনের অধিপতি সারঙ্গনাথ বা সরনাথ মহাদেব বহু প্রাচীনকাল হইতেই ঋষিপত্তনের ঋষিকুলকর্ত্তৃক পূজিত হইতেন, পরে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধশ্রমণ বা ঋষিগণ বুদ্ধদেবকেই সারঙ্গনাথ বা সারনাথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক প্রায় দ্বাদশ শত বৎসরেরও পূর্ব্বে যখন সুপ্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজকগণ সারনাথ পরিদর্শন করেন, তখন ইহার যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা তাঁহাদের ভ্রমণবৃত্তান্তমধ্যে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত রহিয়াছে, এস্থলে সংক্ষেপে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

ভগবান্ বুদ্ধের প্রথম ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনস্থানের উপর সম্রাট অশোক-নির্ম্মিত একশত ফিট উচ্চ পূর্ব্বোক্ত সেই ধমেক স্তূপের ভগ্নাবশেষ-সম্মুখে ৭০ ফিট একটী সুন্দর প্রস্তর স্তম্ভ, উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রায় দুইশত ফিট উচ্চ এক বিরাট বৌদ্ধ-বিহার, প্রস্তর ও ইষ্টকাদি উপাদানে সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। সে সময় বিহারে ১৫০০ দেড় সহস্র বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন। বিহারের চারিদিকে শত শত গবাক্ষ ছিল, আবার সেই সকল গবাক্ষ এক একটী স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তিতে সুশোভিত ছিল। বিহারমধ্যে তাম্রময় একটী সুবৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারাদির চারিদিক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। বাহিরে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে স্বচ্ছ সলিলা তিনটী প্রকাণ্ড সরোবর ছিল। ইহাই পূর্ব্বে সারনাথ হ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখস্থিত হ্রদের শেষচিহ্ন এখনও জলপূর্ণ আছে, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহাই সারঙ্গতাল বা নয়োকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। নয়োকর শব্দ বোধ হয় সরোবরের অপভ্রংশ হইবে। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন হাজার ফিট এবং প্রস্থে এক হাজার ফিট ছিল। ইহার সহিত সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব্বদিকের আর একটী সরোবর আকারে প্রায় সারঙ্গতালের সমান হইবে, তবে ইহার কিনারাগুলি নিতান্ত অসমান; ইহার নাম চন্দোকর,

চন্দ্র-সরোবর বা চন্দ্রাতাল। উত্তরদিকে আর একটী জলাশয় ছিল, তাহার নাম নয়াতাল বা নব-সরোবর ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে, প্রস্থে অন্যূন তিনশত ফিট। নয়াতাল এই নাম শুনিলেই পূর্ব্বোল্লিখিত দুইটী জলাশয় অপেক্ষা ইহা যে পরবর্ত্তীকালে খোদিত, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনানুসারে জানিতে পারা যায়, এই নয়াতালেই পূজ্যপাদ বুদ্ধদেব প্রথম প্রথম স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিতেন।

সারনাথস্থিত বৌদ্ধবিহারে যে সকল ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই উত্তরদিকে যে ক্ষুদ্র পল্লী, তখন হইতেই তাহা বারাহী-গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কেহ কেহ বলেন, ইহার নাম বজ্র-বারাহী হইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই গ্রামে বারাহী-দেবীর কোন প্রাচীন মন্দির ছিল। সেই পল্লী-অধিষ্টাত্রী-দেবীর নামানুসারে ইহা বারাহীগ্রাম বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। সম্প্রতি সরকার পক্ষ হইতে যে সকল প্রস্তরখণ্ড নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে নাতিদীর্ঘ বারাহীদেবীর একটী সুন্দরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা সারনাথ-মিউজিয়ম-গৃহে রক্ষিত আছে দেবী, সপ্ত-বরাহের উপর অধিষ্ঠিতা, তিনি ষড়ভুজা

সায়ুধা ও ত্রি-আনন বিশিষ্ঠা। আননত্রয়ের মধ্যে সম্মুখেরটী সুন্দর ত্রিনয়না ভগবতীরমুখ এবং দুইপার্শ্বের অন্য দুইটী বরাহীরবদন। অতি সুন্দর প্রতিমা। সম্ভবতঃ ইহাই বারাহীগ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবী হইবেন।

পশ্চিমে নয়াতালের বাঁকেরমুখে আর একটী পল্লী ছিল, তাহা গুরুণপুর-গ্রাম বা গুরুপুর-গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোধহয় কোন সময়ে বৌদ্ধ গুরু-মণ্ডলী তথায় বাস করিতেন।

দক্ষিণ পশ্চিমদিকে জৈনদিগের পার্শ্বনাথদেবের একটী আধুনিক মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

যাহাহউক সারনাথের সর্ব্বপ্রধান বিরাট দৃশ্য ধমেক, ইতিপূর্ব্বে তাহা উক্ত হইয়াছে, পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে তাহার বর্ণনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আর কিছু বলিতেছি।

সারনাথের এই বিরাট স্তূপ গম্বুজাকারে নির্ম্মিত। ইহার ব্যাস ৯৩ ফিট এবং উচ্চতায় চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ধ্বংসাবশেষ মৃত্তিকারাশির উপর ১১০ ফিট হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাশীর সাধারণ সমতলভূমি হইতে ১২৮ ফিট উচ্চ। ইহার ভিত্তি বড় বড় ইষ্টক-সাহায্যে ভূমিমধ্য হইতে গ্রথিত। এক্ষণে অন্যান্য বিহার ও ধ্বংসাবশেষ ইষ্টক মৃত্তিকা-দ্বারা উহা প্রায় ২৮ ফিট প্রথিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহার

নির্ম্মাণকালে কেবল ১০ ফিটমাত্র ভূমিমধ্যে অবস্থিত ছিল। ভূমিতল হইতে ইহার প্রায় ৪৩ ফিট কেবল বিন্ধ্যাচলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, এই সকল পাথর আবার পরস্পর লৌহের বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধীকৃত আছে। স্তূপের প্রস্তরগাত্র অতি সুন্দরভাবে বিচিত্র লতা-পাতা ও ভাস্কর্য্যালঙ্কারে খোদিত। সে সকল কারুকার্য্যের জীর্ণ অংশ যাহা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতই অত্যন্ত রুচিবিশুদ্ধ, তাহা দেখিয়া সকলেই বিমোহিত হইয়া থাকেন। উহার উপর অংশ ভিত্তিস্থিত বড় বড় প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত। কিন্তু তাহার বহিরাবরণ ক্রমে জল বায়ুর প্রভাবে জীর্ণ বা বিধৌত হইয়াগিয়াছে। কেবল সেই ধ্বংসোন্মুখ ইষ্টকগুলি শীর্ণ নরকঙ্কালসদৃশ বা শবমুণ্ডস্থিত দন্তপুংক্তির ন্যায় বাহির হইয়া রহিয়াছে। ইহার উপর কোনরূপ চূণ-সুরখীর আবরণ বা ঐরূপ কোন মশলাদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, অথবা খোদিত কারুকার্য্যযুক্ত স্বতন্ত্র প্রস্তরস্তরে আবৃত ছিল, তাহা ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। তবে কেবল ইষ্টকগুলির গাঁথনি দেখিয়া অনুমান করা যায়, ইহার উপর নিশ্চয়ই চূণ সুরখীর আবরণ বা পলেস্ত্রা ছিল। ইহার উপর এখনও ৮ ফিট ব্যাস ও ৪ ফিট উচ্চ একটী ইষ্টকনির্ম্মিত বেদিকা দেখিতে পাওয়া যায়।

তাহা দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বে উহার উপর সছত্র বুদ্ধদেবের কোন প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই স্তূপের নিম্নাংশেও পূর্ব্বে বহু বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, উপস্থিত তাহার কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল স্তূপের চারিদিকে ছয় ইঞ্চি উচ্চ আটটী স্বল্পোন্নত চূড়ার স্থায় গ্রথিত আছে, শুনা যায় তাহার মধ্যেও আটটী বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপিত ছিল।

সারনাথস্থিত বৌদ্ধস্তূপাবলীর যে সকল ধ্বংসাবশেষ আছে, তন্মধ্যে ধমেকই শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বস্তু, দ্বিতীয় জগৎসিংহ-খোদিত ইষ্টক-নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড স্তূপ, যাহার ধ্বংস-চিহ্ন, ধমেক হইতে প্রায় ৫২০ ফিট পশ্চিমদিকে বৃত্তাকার ইষ্টক-প্রাচীর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ১৭৯০ খৃঃঅব্দে বেনারস-মহারাজ চেৎসিংহের দেওয়ান বাবু জগৎসিংহ কর্ত্তৃক খোদিত হয়, এবং তাহার ইষ্টক-প্রস্তরগুলি স্থানান্তরিত করিয়া সহরের মধ্যে তাঁহার নিজের নামে 'জগৎগঞ্জের' বাজার নির্ম্মিত হইয়াছিল। যখন তিনি সেই বাজারের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তরাদি সংগ্রহ-কল্পে সারনাথস্থিত সেই স্তূপাবলীর সংহার-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন, তখন তাহার মধ্য হইতে দুইটী প্রস্তর নির্ম্মিত সিন্দুক পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে

কতকগুলি মানবাস্থি এবং কতিপয় বিকৃত মুক্তাফল, কয়েকখণ্ড সুবর্ণপত্র ও ধনরত্নপূর্ণ স্ফটিক নির্ম্মিত কৌটা আবদ্ধ ছিল। ১৮৩৫ খৃঃঅব্দে জেঃ কানিংহাম যখন এইস্থানে পুনরায় অনু-সন্ধান করেন, সেই সময় একটী বৃদ্ধ, (তাহার নাম শঙ্কর) কানিংহামকে জগৎসিংহ কর্ত্তৃক সেই খোদিত স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। জেঃ কানিং-হাম তাহারই কথানুসারে সেই স্থান পুনরায় খোদিত করিয়া একটী প্রকাণ্ড গোলাকার পাথ-রের টাঁকা বা সিন্দুক দেখিতে পান। তাঁহার অনুসন্ধান-ফলে বহু প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয়। তাহা এক্ষণে কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। অনন্তর মেজর কিটো (Kittoe) সারনাথ ও বথরিয়াকুণ্ডের বহু অংশ অনুসন্ধান করেন। তিনি বেনারাসের কুইন্স-কলেজ প্রস্তুত-কালে বহু সংখ্যক প্রস্তরখণ্ড এস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া ছিলেন। তাহার পরিত্যক্ত ও অব্যবহার্য্য প্রস্তরগুলি বহুদিন অবধি কুইন্স-কলেজের প্রাঙ্গ-নেই পড়িয়া ছিল। পরে কতক লক্ষ্ণৌএর মিউ-জিয়মে ও কতক পুনরায় সারনাথেই নূতন মিউ-জিয়ম-গৃহে রক্ষিত হইয়াছে। অনন্তর ১৯০৫ খৃঃষ্টাব্দে মিঃ এফ, ও, অরটেল (F. O. Oertel)



এবং তদনন্তর মিঃ জে, এচ্, মারস্যাল (J. H. Marshall) প্রভৃতি কতিপয় য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্ বহু অনুসন্ধান করতঃ সারনাথের ভূগর্ভ হইতে অসংখ্য ভাস্করমূর্ত্তি প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ উদ্ধার করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ধমেক ও বিহার ব্যতীত সারনাথের নবোদ্ধৃত অশোক-স্তম্ভটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য বস্তু। দুই বৎসর গত হইল, ইহা গভীর মৃত্তিকা-গর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এমন সুন্দর বিরাট অশোক-স্তম্ভ আমি ইতিপূর্ব্বে আর কোথাও দেখি নাই। স্তম্ভটি সর্ব্বসমেত প্রায় ৫০ ফিট দীর্ঘ। স্তম্ভচূড় বা স্তম্ভের উপর চারিটী বিশাল সিংহের মূর্ত্তি সুন্দরভাবে খোদিত, তাহার নিম্নে একটী গোলাকার বেদিকা, উহারই উপর সিংহ-চতুষ্টয় অবস্থিত। বেদিকা-অঙ্গে ক্ষুদ্রাকারের গজ, সিংহ, বৃষ ও অশ্ব এই চারিটী পশুমূর্ত্তি যথাক্রমে এক একখানি চক্রের ব্যবধানে খোদিত আছে। ইহার নিম্নে একটী কুম্ভালঙ্কার স্তম্ভের উপর নিম্নমুখে খোদিত হইয়াছে। যে প্রস্তরে স্তম্ভ খোদিত হইয়াছে, তাহাও এক অপূর্ব্ব জিনিস, তাহা যেমন মসৃণ, তেমনি দর্পণের ন্যায় চাকৃচিক্যশালী।

ধমেকের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সারনাথের পথের বামপার্শ্বে চৌখণ্ডী নামে একটী স্তূপ দেখিতে

পাওয়া যায়। তাহার উপর দিল্লীশ্বর আকবর কর্ত্তৃক একটী স্মারক-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও উহা বিদ্যমান আছে।

সারনাথস্থিত ভূগর্ভ হইতে যে সকল বস্তু উদ্ধৃত ও আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে সারনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত হইতেছে। সেই সকল ভাস্কর-প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটী প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিটী দেখিতে যেমন বিরাট, তেমনই সুন্দর। অনেক স্থলেই ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটীর মস্তকে একটী বৃহৎ ছত্র ছিল। সেই প্রস্তর নির্ম্মিত ছত্রটীও এক্ষণে তাহারই পার্শ্বে রক্ষিত আছে। অনেকে অনুমান করেন, ইহা খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মহারাজ কণিষ্কের রাজত্ব সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি মিউজিয়মে দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রামসীতা, শিবদুর্গা, বারাহী প্রভৃতি মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিবের তাণ্ডব-নৃত্যের একটী প্রকাণ্ড অসম্পূর্ণ মূর্ত্তি আছে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই এ সকল মূর্ত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে।

যাহা হউক সারনাথের ভগ্নস্তূপোদ্ধৃত মূর্ত্তিসকল দেখিয়া বোধ হয়, মৃগদাব এক সময় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অতি প্রশস্ত লীলা-নিকেতন থাকিলেও, এস্থলে হিন্দু ও

বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে বিশেষ হিংসা দ্বেষ ছিল না। উভয়ে যেন মিলিয়া মিশিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। অধুনা বৌদ্ধধর্ম্ম বলিলে যেমন অনেকের মনে হয়, হিন্দুধর্ম্মের সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই বরং সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম! বাস্তবিক চীন, জাপান, সিংহল ও ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তীয় যে সকল বৌদ্ধ বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের ধর্ম্ম-সংস্কার ও হিন্দুদিগের সহিত তাহাদের আচরণ দেখিলে খ্রীষ্ট বা মোসলেম্ ধর্ম্মের ন্যায় সম্পর্ক-শূন্য বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবসময়ে ঠিক তেমনটি ছিল না। এক্ষণে শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে যে ভাব অথবা আর্য্য-সমাজী বা আদি-ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে যে ভাব, পূর্ব্বে সনাতন হিন্দু ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মধ্যে সেইরূপ ভাবই প্রচলিত ছিল। হয়ত এক পরি-বারের মধ্যেই একভ্রাতা ভগবান বুদ্ধের উপাসক, অন্যভ্রাতা সনাতন বৈদিক-ক্রিয়াভিলাষী ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের জাতীয় বা সমাজিক ধর্ম্ম নষ্ট হইত না। বোধ হয় এই সকল কারণেই ভগবান বুদ্ধ হিন্দুর নবম অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া-ছেন। বারাণসী ও সারনাথ-উপবনের পুরা-কীর্ত্তি আলোচনায় এক্ষণে তাহাই স্পষ্ট জানিতে

পারা যাইতেছে। বিশেষ একই স্থান হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধের এতাধিক দেবমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে দেখিলে, কাহারও আর কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না।

সারনাথের এই সকল বৌদ্ধ-প্রভাব ও কীর্ত্তি-কলাপ পরবর্ত্তী সময়ে যবন হস্তেই বিধ্বস্ত হইয়াছিল এবং যে সকল বৌদ্ধশ্রমণ ও সেবক এইস্থানে থাকিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতেন, তাঁহারাও সেই সময় মোসলমান শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায়, ভারতের বৌদ্ধকুল একেবারেই প্রায় নির্ম্মূল হইয়া ছিল।

গোধূলিয়া ও মহারাণীর মন্দির।

কাশী-বিশ্বনাথের মন্দির হইতে উত্তর-প্রান্ত পর্য্যন্ত কাশীর প্রায় সকল মঠ, মন্দির, মস্‌জিদ ও তীর্থাদির বিষয় সংক্ষেপে এক প্রকার বলা হইল, এক্ষণে বিশ্বেশ্বরের পশ্চিম ও অন্যান্য দিকের মন্দিরাদির বিষয় বলিব।

বিশ্বনাথের মন্দির হইতে নিচী-ব্রহ্মপুরীর মধ্যদিয়া পশ্চিমমুখে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই, বাঁশফটকা মহল্লায় বা কাশীর প্রধান রাজপথে আসিয়া পড়া যায়। এই স্থানেই কৃষ্ণানন্দ স্বামী তাঁহার বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

করিতেছিলেন, কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ তাহা এ পর্য্যন্ত সম্পন্ন বা কার্য্যে পরিণত হয় নাই, মাত্র সেই অসম্পূর্ণ গৃহটী এখনও পথের ধারে পড়িয়া আছে। শুনিতেছি, শ্রীভারতধর্ম্মমহাণ্ডলের পূজ্যপাদ স্বামীজি মহারাজ স্বর্গীয় পরিব্রাজক মহাশয়ের কীর্ত্তি ও তাঁহারা সংকল্প সিদ্ধ করিতে মনোযোগী হইয়াছেন।

এইস্থানে হইতে সামান্য দক্ষিণ দিকে যাইলেই প্রসিদ্ধ গোধূলিয়ার চৌমোহানী। এই চৌমোহানীর সন্নিকটেই বেনারস-মহারাণীর নব-প্রতিষ্ঠিত কালী-মন্দির। মন্দিরটী অতি সুন্দর, বিশেষ ইহার গোপুর বা ফটকটীর প্রস্তর-খোদিত কারুকার্য্য বড়ই মনোরম। আধুনিক এ দেশীয়-স্থপতি ও ভাস্করশিল্পের একটী সুন্দর নিদর্শন। বাস্তবিক এমন কারিকুরি অধুনা প্রায় দেখাযায় না, তাই কিয়ৎক্ষণ তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে! আহা! ভারত, চিরকালই শিল্প-সৌন্দর্য্য লইয়া পাগল! তাহার অস্থি-মজ্জার শিল্পের বিশ্ব-বিমোহিনী মাধুরি পূর্ণ হইয়া থাকিলেও, কেবল এক দুঃসহ জঠরের আশঙ্কাতেই শিল্পের সেই আজন্ম-সম্বন্ধটুকু সে ভুলিতে বসিয়াছে। প্রকৃত শিল্প বা আর্টের আদর এখন নাই, এখন ইউটিলিটী বা কার্য্য-পারিচালন-সমর্থ বিদ্যারই আদর অধিক অর্থাৎ কোনরূপে জঠর-যন্ত্রণা নিবারণ করিয়া কায়ক্লেশে মাথাগুঁজিয়া

দিন কাটাইতে পারিলেই হইল! এখন ত আর আমাদের নিজের নিজস্ব নাই? যাঁহাদের আদর্শে আজ আমরা এত অনুপ্রাণিত, তাঁহাদেরই কার্য্যের ধারা যে এইরূপ! তাঁহাদের কোন কার্য্যেই যে, প্রকৃত শিল্পের বিকাশ বা প্রাচুর্য্য আদৌ নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায়। এখন ভারতের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তিরাও অট্টালিকার গাত্রে বালুকা-চূর্ণ অথবা পঙ্খের কার্য্য না করাইয়া, সরকারি পায়খানার ধরণে অল্প পয়সায় পয়েণ্টিং করাইয়া নিজেরা গর্ব্ব অনুভব করেন। সুতরাং ভারতের এ দুর্দ্দিনে সহসা এমন শিল্প-সোহাগ দেখিলে কাহার হৃদয় না আনন্দানুভব করে! আমরা প্রত্যেক কাশী-যাত্রীকেই গোধূলিয়ায় যাইতে পথের ধারে এই সুন্দর মন্দিরদ্বারটী দেখিতে অনুরোধ করি।

যোগাশ্রম।

উক্ত মন্দিরের অনতিদূরে খোদাইচৌকির থানা। সেই থানার অতি নিকটেই পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ-স্বামীর যোগাশ্রম। অনেক বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী এখানে অবস্থান করেন। উপস্থিত যিনি আশ্রমের পরিচালক, তিনি অতি সজ্জন সাধু। অতিথীসৎকার

তাহার এক প্রধান ব্রত। সকলকেই তিনি সমান ভাবে যত্ন করেন। আমাদের পরিচিত শ্রীমৎ কৃষ্ণবন্ধু ও শ্রীমৎ দীনানন্দ স্বামী প্রভৃতি অনেক সময়—এই যোগাশ্রমেই অবস্থান করেন।

গোধূলিয়ার গির্জ্জা।

গোধূলিয়া-চৌমোহানী হইতে ঠিক পশ্চিমে অনতিদূরে চর্চ্চ মিসনরী-সোসাইটীর প্রকাণ্ড গির্জ্জাগৃহ। ইহা 'গোধুলিয়াকাগির্জ্জাঘর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এস্থানে এখন অ-খৃষ্টান দিগকে খৃষ্ট-ধর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হয়।

সূর্য্যকুণ্ড।

যোগাশ্রম হইতে ক্রমান্বয়ে পশ্চিমদিকে আরাঙ্গা-বাদ বা নারাঙ্গাবাদের পথে যাইলে সূর্য্যকুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। মাঘমাসের রবিবার শুক্লসপ্তমীতে এই সূর্য্যকুণ্ডে একটী মেলা হইয়া থাকে। এই দিবস স্নানান্তে সূর্য্যদেবের মন্দিরে পূজা করিলে যাবতীয় উৎকট রোগের শান্তি হয়। পুষ্করিণীটীর অবস্থা তত ভাল নহে—ইহাতে জলও অতি সামান্য আছে। জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব, কৃষ্ণের অভিশাপে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত

হইলে, এই স্থানে আদিত্য-নারায়ণের আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, কাশীখণ্ডে এই রূপ বর্ণিত আছে। সেইকারণ কাশীখণ্ডে ইহা 'সাম্বকুণ্ড' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।



আরঙ্গাবাদ-সরাই।

সূর্য্যকুণ্ডের অনতিদূরে আরঙ্গাবাদ সরাই অবস্থিত। সাধারণ লোক ইহাকে 'নারঙ্গাবাদ কা সরাই' বলিয়া থাকে। বাদসাহ আওরঙ্গজেবকর্ত্তৃক এই সরাই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বারাণসীর মধ্যে এইরূপ আরও দুইটী সরাই আছে; তাহাদের একটীর নাম কাঁচ্চি-সরাই, অপরটী হড়হা-সরাই। মোসলমানযুগে প্রধান প্রধান সহরে এবং রাজ-পথের ধারে এইরূপ সরকারী সরাই প্রতিষ্ঠিত হইত। হিন্দুদিগের যেমন ধর্ম্মশালা অথবা ইংরাজ আমলে অনেক স্থলে যেমন, ডাকবাঙ্গলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহাও সেই ধরণের। এই সরাইগুলি এক একটী ভাটিয়ারিণের জিম্মায় রক্ষিত হইত। এখনও সেই সকল ভাটিয়ারিণের বংশধরেরা তাহা পৈতৃক সম্পত্তির ন্যায় রক্ষা ও অধিকার করিয়া আছে। উক্ত আরঙ্গাবাদ সরাইয়ে অনেক লোকের

থাকিবার স্থান আছে; অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধভাবে তাহাতে অনেক গৃহ আছে। হিন্দু বা মোসলমান যে কেহ তথায় যাইয়া থাকিতে পারেন। তবে প্রত্যেক গৃহের জন্য ভাটিয়ারিণেরা নিত্য এক পয়সা করিয়া ভাড়া আদায় করে। এ নিয়ম সেই বাদসাহি-আমাল হইতেই প্রচলিত আছে। এই ভাড়ার পয়সা অবশ্য সরকারে কখন জমা হয় না; ইহা সরাই পরিষ্কার রাখিবার জন্য ভাটিয়ারিণের বেতন-স্বরূপ তাহাদেরই প্রাপ্য। এতদ্ব্যতীত যাত্রীর নিকট হইতে তাহারা আরও কিছু পুরস্কার-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলে। ভাটিয়ারিণগণ জাতিতে মোসলমান, সুতরাং আবশ্যক হইলে মোসলমান যাত্রীগণের আহার্য্য-সামগ্রীও তাহারা প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহাতেও তাহাদের কিছু লাভ হয়। হিন্দু-যাত্রী আসিলে, তাহারা হিন্দু 'কাহার'-জাতীয় ভৃত্যের দ্বারা সমস্ত সরবরাহ করাইয়া দেয়। পূর্ব্বে সমস্ত সরাইটী একজন ভাটিয়ারিণেরই অধীনে ছিল, ক্রমে তাহাদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাহারও দুইখানি ঘর, কাহারও চারখানি ঘর, কাহারও বা দশখানি ঘর এইরূপ ভাগ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা পৈতৃক সম্পত্তির মত তাহারই উপসত্ব গ্রহণ

করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করে ও সেই সকল গৃহের আবশ্যক মত সংস্কার করিয়া রাখে।

পিতৃকুণ্ড ও মাতৃকুণ্ড।

সূর্য্যকুণ্ড অথবা আরঙ্গবাদ-সরাইয়ের কিঞ্চিৎ উত্তর-পশ্চিমদিক পিতৃকুণ্ড পুষ্করিণী অবস্থিত। ইহার দুইদিকে পাথরের বাঁধা ঘাট ও ইহা প্রচুর জলে পরিপূর্ণ। এইতীর্থে স্নান করিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিতে হয়। পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে ঘাটের উপর শিবলিঙ্গসহ তিনটী শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

এইকুণ্ডের অব্যবহিত পশ্চিম-পার্শ্বে মাতৃকুণ্ড নামে আর একটী পুষ্করিণী আছে। এই তীর্থে মাতৃ-পিণ্ড প্রদত্ত হইত, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কুণ্ডে নামিবার একমাত্র ভগ্ন প্রস্তর-সোপান ব্যতীত তাহার আর কোনও চিহ্ন নাই। এক্ষণে কেবল মাতৃকুণ্ড বা 'মাতাকুণ্ড' বলিয়া এই মহল্লারটীর মাত্র নামই বর্ত্তমান আছে।

পিশাচ-মোচন তীর্থ।

সূর্য্যকুণ্ড হইতে উত্তর পশ্চিম দিকে আরও কিয়-দ্দূর অগ্রসর হইলে, পিশাচমোচন তীর্থে উপস্থিত

হওয়া যায়। ইহারই পূর্ব্বদিকে হাতোয়া-মহারাণীর প্রকাণ্ড মন্দির ও অট্টালিকা অবস্থিত। পূর্ব্বে পিতৃ ও মাতৃকুণ্ডেই শ্রাদ্ধাদির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল, অধুনা সে স্থানে তাহা কমিয়া গিয়াছে—তৎপরিবর্ত্তে পিশাচমোচন তীর্থেই আজ কাল সকল যাত্রীই সমস্ত শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এই প্রাচীনতীর্থ টী সম্বন্ধে কাশীমহাত্ম্য ও কুর্ম্মপুরানাদি গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে এক পিশাচ কাহারও কোন বাধা আপত্তি না মানিয়া কাশীর ক্ষেত্রমধ্যে প্রবেশ করে—তাহাতে কাশী-কোতোয়াল কালভৈরব, তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন ও তাহার মস্তক ছেদন করিয়া কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের সমীপে সেই মুণ্ড সহ উপস্থিত হন। দুরন্ত পিশাচ দেহবিচ্ছিন্ন হইলেও বাক্‌শক্তিবিহীন হয় নাই। সে তখন বিশ্বেশ্বরের সমীপে সকাতরে প্রর্থনা করে যে, "দেব! আমার এ অবস্থায় আর কোনও অভিলাষ নাই, কেবল দীনের এই নিবেদন, কাশী হইতে আর আমাকে বিতাড়িত করিবেন না।" আশুতোষ কৃপাকরিয়া তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। অনন্তর সে নানা স্তব স্তুতি করিয়া পুনরায় বলে, "ঠাকুর, যখন এ দাসের প্রতি এতই কৃপা করিলেন, তবে অনুমতি

করুন—গয়াযাত্রীগণ কাশী হইতে যাইবার সময়—যেন আমায় দর্শন করিয়া যায়।” বিশ্বনাথ ‘তথাস্তু’ বলিয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। তদনুসারে ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রীগণ এখনও কপালমোচন তীর্থ দর্শন করিয়া গয়াযাত্রা করেন। ভূতভাবন কালভৈরব সেই পিশাচমুণ্ড এই কুণ্ডমধ্যেই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইকারণ ইহা পিশাচমোচন-তীর্থ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

তীর্থ-কুণ্ডটী আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, জলও যথেষ্ট আছে। ইহার ঘাটটী প্রথমে মিরাবাই প্রস্তরদ্বারা বাঁধাইয়া দেন, অবশিষ্টাংশ গোপালদাস সাধুর ব্যয়ে পরে সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কুণ্ডের দক্ষিনাংশ রাজা শিবশঙ্কর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় এবং উত্তরাংশ প্রায় শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে রাজা মুরলিধর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ঘাটগুলির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের অংশ অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কেবল পূর্ব্বদিকের ঘাটটী অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় আছে, এবং এই দিকেই কপালমোচন তীর্থের মন্দিরগুলি বিনির্ম্মিত। এই স্থানে পিশাচের এক প্রকাণ্ড মুণ্ডমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রীগণ এই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

এখানে প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ-শুক্ল-হইতে প্রতি চতুর্দ্দশী তিথিতে পরপর পাঁচটী "লোটাভাণ্টা"র মেলা হয়। তন্মধ্যে প্রথম মেলাটীই সর্ব্বপ্রধান। এই সময় সহস্র সহস্র ব্যক্তি মেলায় উপস্থিত হইয়া পিশাচমূর্ত্তি দর্শন করে। মেলা উপলক্ষে একটী প্রকাণ্ড বাজার বসিয়া থাকে, তাহাতে অতি বৃহৎ আকারের মূলা ও স্থূল ইক্ষুর এরূপ আমদানী হইয়া থাকে যে, তাহাকে মূলা ও ইক্ষুর প্রদর্শণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কৃষকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রের শ্রেষ্ঠ মূলা ও ইক্ষু আনিয়া এই দিবস বিক্রয় করে। মেলা দর্শনার্থী সকলেই কিছু না কিছু তাহা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। বোধহয় পূর্ব্বে খুব বড় বড় বেগুণও এই মেলায় বিক্রয় হইত। হয়ত সেই কারণেই লোটা বা বড় ঘটীর মত ভাণ্টা অর্থাৎ বেগুণের ক্রয় বিক্রয় দেখিয়া সাধারণে এই মেলাকে 'লোটাভাণ্টার' মেলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকিবে।

লক্ষ্মীকুণ্ড।

পূর্ব্বোক্ত সূর্য্যকুণ্ড হইতে সামান্য দক্ষিণ পশ্চিম-দিকে, অথবা পূর্ব্বোক্ত গোধূলিয়া হইতে ঠিক পশ্চিম-দিকে লক্সা যাইবার পথের উত্তরদিকে লক্ষ্মীকুণ্ড নামে

এই প্রসিদ্ধ পুণ্যতীর্থ। কুণ্ডটীর যেমন পরিসর তেমনি তাহার চারিধার পাথরদিয়া সুন্দর ভাবে বাঁধান। পরিষ্কার পুষ্করিণী—অগাধ জলে পরিপূর্ণ, কিন্তু উহারও জল প্রায় এদেশের সাধারণ পুষ্করিণীর ন্যায়ই দুর্দ্দশাপন্ন—বাঙ্গলার সেই স্বচ্ছসলিলা সরোবরের সহিত তুলনাই হয় না। এরূপ হইবার কারণ—বোধহয় কুণ্ডগুলি বহু প্রাচীন, ধর্ম্মপ্রাণ ধনীদিগের এ সকল সংস্কার করিবার প্রবৃত্তি নাই, কেবল নূতন মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াই তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন। অথচ প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মেলা উপলক্ষে এই কুণ্ডে স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহাতেও কুণ্ডসলিল কলুষিত হইয়া থাকে, তাহার উপর বাঙ্গলার ন্যায় এই সকল সরোবর বর্ষে বর্ষে বর্ষাসলিলে ভাসিয়া যাইবার উপায় নাই, তাহাহইলেও পুষ্করিণীজল নির্ম্মল হইতে পারিত। একে এদেশ বাঙ্গলা অপেক্ষা শত শতফুট উচ্চ পার্ব্বত্য ভূমিখণ্ডের উপর স্থাপিত, তাহাতে আবার পর্জ্জন্য দেবের কৃপাও তেমন নাই, সুতরাং পবিত্র তীর্থ-সলিল নব্য-যুগে অপবিত্র বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। সে যাহাহউক এই কুণ্ড বর্ষার জলে পূর্ণ করিবার জন্য লক্ষ্মা হইতে ইষ্টকদ্বারা গ্রথিত একটী সুদীর্ঘ পাকা নল নির্ম্মিত আছে, শুনা যায়

বিজনাগ্রামের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ বহু অর্থব্যয় করিয়া এই নল প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। তাহাতে কেবল বর্ষার জলই যাইবার ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু আজ কাল পাথপার্শ্বস্থিত অশিক্ষিত স্বার্থান্ধ ও কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিরহিত অধিকাংশ গৃহস্থ গোপনে স্ব স্ব গৃহের মলমূত্রের নলও তাহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিয়াছে, ইহাতেও কিয়ৎ পরিমাণে কুণ্ড কলুষিত হইয়াছে। কিন্তু এত অত্যাচারেও কাশীর অন্যান্য পুষ্করিণী অপেক্ষা লক্ষ্মীকুণ্ডের জল উত্তমই আছে, তাহার একমাত্র কারণ ইহার বিশালত্ব। শুনা যায় কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার ইহার আংশিক সংস্কার হইয়াছিল।

কুণ্ডের পার্শ্বে কয়েকটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বারাণসীর মধ্যে ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ। প্রতি ভাদ্র শুক্লাষ্টমী হইতে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী পর্য্যন্ত একপক্ষব্যাপী একটী মহতী মেলা হইয়া থাকে। তাহাতে বহুযাত্রীর সমাবেশ হয়, বিশেষ লক্ষলক্ষ হিন্দু কুললক্ষ্মীগণের এরূপ বিরাট মিলন স্থান আর কোথাও প্রায় দেখা যায় না। তাঁহারা যখন দলে দলে লক্ষ্মীকুণ্ডে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া পূত-হৃদয়ে

লক্ষ্মীমন্দিরে মহালক্ষ্মীর দর্শনাভিলাষে অগ্রসর হন, তখন দূর হইতে স্বর্গের নন্দন-কানন বলিয়া ভ্রম হয়, মনে হয় বুঝি বা দেবকন্যাগণ একত্র জলক্রীড়া করিতে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সুমনোহর পবিত্র বিরাট দৃশ্য বস্তুতই দেখিবার যোগ্য।

মেলা উপলক্ষে এখানে ভাঁড় পুতুল হাতা খুন্তি প্রভৃতি স্ত্রী-ব্যবহার্য্য বিবিধ সামগ্রীর এক প্রকাণ্ড বাজার বসিয়া থাকে। মেলা হইতে ফিরিবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু খরিদ করিয়া থাকেন, তাহা দেখিলে বোধহয় যেন মেলায় কিছু খরিদ না করিলে তাঁহাদের বুঝি তৃপ্তি বা পুণ্য হইবে না।

কুণ্ডের পশ্চিম ঘাটে প্রাচীন বটবৃক্ষমূলে বহুজীর্ণ দেবমূর্ত্তি ও প্রস্তরখণ্ড পতিত আছে, পুরাতত্ত্ববিদের তাহা দেখিবার বিষয়।

কালিকামঠ।

এই কুণ্ডের নিকট কালিকামঠ নামে একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন মঠ আছে। বহু বীরাচারী তান্ত্রিক-সাধক সতত এইস্থানে আসিয়া স্বস্ব শিক্ষা দীক্ষা ও প্রবৃত্তি অনুসারে সাধনা করিয়া থাকেন।

বহু শাক্ত-শিষ্য ইহঁাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছেন। লোকপরম্পরায় শুনা যায়, সাত্বিকতার আবরণে তামসিক আচরণই ইহাদের প্রধান অবলম্ব্য। যাহাহউক এরূপ প্রাচীন শক্তিমঠ শক্তি-উপাসক গণের অবশ্যবরেণ্য।

তুরীয়ামঠ।

ইহার নিকটেই নূতন সংস্কৃত এই ক্ষুদ্র মঠটী সাত্বিক সাধকগণের বিশেষ আদরের স্থান। মন্দিরটী ক্ষুদ্র ও আধুনিক ভাবে নির্ম্মিত। মন্দিরমধ্যে সুন্দর দক্ষিণামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছে। শুনা যায়, তুরিয়ামঠ বহু প্রাচীন, কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় তাহা সমভূমি হইয়াগিয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিলনা, জনৈক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু একটী সামান্য মৃন্ময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে একটী দেবীমূর্ত্তিকে সংগোপনে রক্ষা করতঃ স্থানটীর মর্য্যাদা রক্ষা করিত, পরে একটী ধর্ম্মাত্মা হিন্দু-মহিলা যথা-বিধানে তাহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন, ইহার নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক গুলি মঠ ও মন্দির আছে, বহু সাধু সন্ন্যাসী সতত ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসা করিয়া থাকেন।

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম ও অদ্বৈতমঠ।

লক্ষ্মীকুণ্ডের অনতিদূরে রামকৃষ্ণ সম্প্রদায়ের উদ্যোগে সম্প্রতি একটী বিরাট সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে দীন দুঃখী রুগ্ন ও আতুরদিগকে অতি সমাদরে সেবা করা হয়। এরূপ ব্যবস্থা কাশীতে বাস্তবিকই নূতন। আশ্রমের সেবক সন্ন্যাসীগণ যেরূপ অকাতরে দীনের সেবা-শুশ্রূষা করেন, তাহা দেখিলে হৃদয় আনন্দরসে পরিপ্লুত হয়, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই আশ্রমটী হিন্দু অহিন্দু সকলেরই সমান উপাস্য। কাশী-দর্শনাভিলাষী প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেই একবার এই সেবাশ্রম দেখিতে ও তাঁহাদের যথাসাধ্য সহায়তা করিতে অসঙ্কোচে অনুরোধ করিতে পারা যায়।

ইহার সহিত অদ্বৈতাশ্রম নামক একটী নূতন মঠ রামকৃষ্ণ-সেবক সন্ন্যাসীগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আছে। বহু সন্ন্যাসী তথায় সাধন ভজন করিয়া থাকেন।

ছাতুয়া বাবার মঠ।

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের পশ্চিমদিকে মণিকর্ণিকা-ঘাটস্থিত প্রসিদ্ধ ছাতুয়া বাবার একটী মঠ আছে।

এস্থানে প্রায়ই দুই একজন সন্ন্যাসী স্ব স্ব সাধন ভজন করিয়া থাকেন। এ মঠটী নিতান্ত আধুনিক।

বেদান্তমঠ।

ছাতুয়া বাবার মঠের প্রায় সম্মুখেই পথের উত্তর ধারে বেদান্তমঠের প্রকাণ্ড বাগান ও মঠ। মঠটী দেখিলে প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। বহু সাধু সন্ন্যাসী সতত এই স্থানে অবস্থান করিয়া বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। সময় সময় কোন কোন উচ্চ অধিকারীর সাধকও এখানে আসিয়া থাকেন ও বেদান্তের গভীর উপদেশসমূহ প্রদান করিয়া শিক্ষার্থীদিগকে পরিতৃপ্ত করেন।

শিখগুরুমঠ।

শিখগুরু নানকজী মহারাজের প্রবর্ত্তিত শিখ-সম্প্রদায়ের এই মঠটীও বহুদিন হইল এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মঠ-মধ্যে পবিত্র গ্রন্থ-মহারাজ সিংহাসনোপরি রক্ষিত আছে। বহু শিখ সাধু সতত এই স্থানে বাস করিয়া স্ব স্ব সাধন ভজন করিয়া থাকেন।

থিয়োজফিকেল সোসাইটি বা তত্ত্বসভা

শিখমঠের আরও সামান্য পশ্চিমদিকে প্রসিদ্ধ থিয়োজফিকেল সোসাইটীর ভারতবর্ষীয় প্রধান কার্য্যালয় ও মঠ অবস্থিত। বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া থিয়োজফিকেল সোসাইটীর সেই সকল নানা বিভাগ এখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। শ্রীমতী আনি বেসান্ত ডাঃ রিচার্ডসন প্রভৃতি সোসাইটীর বর্ত্তমান চারিলকগণ এই স্থানে অবস্থান করেন। কাশীদর্শনাভিলাষী থিওজফিষ্টগণ এই স্থানে থাকিয়াই সমস্ত দর্শন করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যেই ভারত-ধর্ম্ম-লজের প্রধান কার্য্যালয় ও মঠ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই থিয়োজফিকেল সোসাইটীর ঠিক সম্মুখে প্রসিদ্ধ গৌরীশঙ্করের বাগান। এই বাগানস্থিত কুঁয়ার জল কাশীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রসিদ্ধ। সহরের অসংখ্য লোক প্রত্যহ এই কুঁয়ার জল পান করিয়া থাকেন।



হিন্দু কলেজ।

থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর পিছনেই অর্থাৎ দক্ষিণদিকে শ্রীমতী আনি বেসান্ত-প্রবর্ত্তিত প্রসিদ্ধ হিন্দু কলেজ ও বোর্ডিং-গৃহ। এই সুন্দর অট্টালিকাটী বেনারস মহারাজ, কলেজের জন্য প্রদান করিয়াছেন।

কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ পরে বহু অর্থব্যয় করিয়া নূতন বোর্ডিং-গৃহ ও অন্যান্য বহু অংশ নির্ম্মাণ করতঃ বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কাশীর মধ্যে ইহাও যে একটী দেখিবার বস্তু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৈদ্যনাথ, বটুক-ভৈরব ও কামাখ্যা দেবী।

হিন্দু কলেজ-বোর্ডিংএর ঠিক পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া যে পথ কিয়দ্দূর দক্ষিণ দিকে গিয়া পরে পশ্চিম মুখে গিয়াছে, সেই পথেই যথাক্রমে বৈদ্যনাথ, বটুক-ভৈরব ও কামাখ্যা দেবীর মন্দিরে যাইতে হয়। পথটী সহরের তুলনায় নির্জ্জন নিস্তব্ধ, অর্থাৎ খুব কম লোকই এ পথে সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন। ইহার পরিসরও অধিক নহে, সাধারণ গলি রাস্তা মাত্র।

এই পথে প্রথমেই বৈদ্যনাথজীর প্রকাণ্ড প্রাচীন মন্দির ও মঠ। বহু সাধু সন্ন্যাসী সতত্ই এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। মঠের মধ্যে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকে শ্রেণীবদ্ধ গৃহ ও বারাণ্ডা বা রক। এই সকল গৃহই সাধু দিগের জন্য ব্যবহৃত হয়। সময় সময় অনেক উচ্চ সাধকেরও এখানে সাক্ষাৎ হইয়া থাকে।

বটুক-ভৈরব ও কামাখ্যা দেবীর মন্দিরদ্বয় প্রায় সংলগ্ন, বৈদ্যনাথ জীর মন্দির হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। মন্দির দুইটী নাতিবিস্তৃত, বেশ শান্তিময় গম্ভীর ও উগ্রশক্তি সমন্বিত! বহু সাধক ও সাধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সময় সময় এখানে আসিয়া সাধন-শক্তি সঞ্চার করিয়া লয়েন। পূর্ব্বে সাধারণ যাত্রীর দল এ স্থানের সংবাদ জানিতেন না। সুতরাং মেলা হিসাবে তেমন ভিড়ও হইত না। এখন অনেকেই এখানে আসিয়া থাকেন। তাহাতে স্থানের উগ্রতা-মাহাত্ম্য সামান্য মন্দিভূত হইলেও এখনও যথেষ্ট শক্তি প্রত্যক্ষ করা যায়। শক্তি-সাধকদিগের ইহা একটী অপূর্ব্ব স্থান। ভক্তি ও ক্রিয়াবান সাধক ব্যতীত তাহা অন্যের উপলব্ধ নহে। বাস্তবিক কিয়ৎক্ষণ এই মন্দিরমধ্যে বসিয়া একাগ্রমনে জপ করিলে সাধারণ ব্যক্তিরও শরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠে। সাধকমুখে শুনা যায়, তন্ত্রোক্ত নিশাপূজার সময়ে তাঁহারা বহু আলৌকিক দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া থাকেন। কখন কখন গভীর নিশাকালে উচ্চতম সাধকগণ আগমন করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। মন্দির-দুইটী দেখিতে নিতান্ত আধুনিক নহে। উভয় মন্দিরই পশ্চিম মুখে যাইতে পথের বাম পার্শ্বে অবস্থিত। দক্ষিণ মানসযাত্রা বিধিতে কামাখ্যা তীর্থে স্নানাদি

করিয়া প্রথমে কামাখ্যা-দেবীর পূজা, পরে বটুক-ভৈরবের পূজা করিয়া রেবাকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে যাইবার উল্লেখ আছে। কাশীযাত্রী ভক্তিবান সাধকের ইহা অবশ্য দর্শনীয় স্থান। এই সকল স্থান 'কামাচ্ছা-মহল্লা' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আমি প্রথমেই বৈদ্যনাথ, পরে বটুক-ভৈরব ও কামাখ্যা-দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বৈদ্যনাথের মন্দির কামাখ্যা-দেবীর মন্দির হইতে আরও পশ্চিমে, সুতরাং হিন্দুকলেজের দিক হইতে বটুকদেবের মন্দিরই প্রথমে পড়ে, পরে কামাখ্যা-দেবী, তদনন্তর বৈদ্যনাথের মন্দির।

শঙ্করাচার্য্য মঠ।

উক্ত কামাক্ষা-দেবীর মন্দির হইতে বৈদ্যনাথের মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া ক্রমে পশ্চিমোত্তর দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল সঙ্কীর্ণ পল্লীপথ ধরিয়া যাইলে ভগবান শঙ্করাচার্য্য-দেবের মঠে উপস্থিত হওয়া যায়। মঠ-মধ্যে মর্ম্মর-প্রস্তর-নির্ম্মিত আদি শঙ্করাচার্য্য-দেবের অতি সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সে পবিত্রমূর্ত্তি দেখিলে হৃদয় আনন্দে গদ গদ হইয়া উঠে। উৎকল-তীর্থ পুরীর গোবর্দ্ধন-মঠেও ঠিক এইরূপ মূর্ত্তি রক্ষিত

আছে। বর্ত্তমান গোবর্দ্ধন-মঠাধীশের মুখে শুনিয়াছি, সে মূর্ত্তিটী এই কাশীর মূর্ত্তিরই অনুকরণে গঠিত। বেনারস সহরের মধ্যেও বিশ্বনাথের মন্দির হইতে দশাশ্বমেধঘাটে যাইবার রাস্তায় ঠিক এইরূপ আর একটী মর্ম্মরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই মঠস্থিত মূর্ত্তিটীই যেন সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। মঠটী বিস্তৃত কাননের মধ্যে অবস্থিত। চতুর্দ্দিকে বিবিধ তরুরাজী-মধ্যে প্রশান্ত শঙ্করমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই পূত শঙ্কর-মঠ ভাব-সৌন্দর্য্যে যেমন গম্ভীর তেমনি প্রকাণ্ড-রূপে বিরাজিত রহিয়াছে। মুক্তিকামী সাধু-সন্ন্যাসিগণ অনেক সময় এই মঠে আসিয়া বাস করিয়া থাকেন। কাননের নানাস্থনে তাঁহারা আসন রচনা করিয়া নির্জ্জনে সাধনা করিয়া থাকেন। সাধারণ লোক-চক্ষুর অন্তরালে, অবিশ্রাম কোলাহলময় সহরের উপকণ্ঠে এমন নির্জ্জন তপোবন-সদৃশ স্থান সাধনাভিলাষীর অবশ্য উপভোগ্য। সাধারণ যাত্রীগণ কাশীধামে আসিয়া বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন ও মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়াই চলিয়া যান, যেন বালকদিগের 'চোর-চোর খেলার' ন্যায় 'বুড়ি-ছুঁইয়াই' নিশ্চিন্ত হন, সুতরাং এ সকল শান্তিময় পবিত্র স্থান সন্দর্শন করিতে তাঁহারা আদৌ অবসর পান না, আবার অনেকেই এ সকল স্থানের

সংবাদও জানেন না। যাঁহাদের অবসর আছে, তাঁহারা কাশীতে বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও মণিকর্ণিকাতীর্থ দর্শনান্তর এই সকল পরিদর্শন করিলে সংসারের চির-কোলাহল-ময় নিত্য-অশান্তির জ্বালামালা হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও যে, পূতশান্তির স্নিগ্ধধারায় সুশীতল হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।



রেবড়ীতলাও ও জয়নারায়ণ-কলেজ।

পূর্ব্বোক্ত হিন্দুকলেজের সম্মুখ দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে কিয়দ্দূর আসিয়া সম্মুখে একটী অসংস্কৃত বৃহৎ পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাই রেবড়ীতলাও বলিয়া প্রসিদ্ধ। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইহা তীর্থ রূপে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণে তাহা আর হয় না। নিকটে মোসলমান ও নীচ হিন্দুদিগেরই বসতি অধিক।

কলিকাতার উপকণ্ঠস্থিত ভূ-কৈলাসের প্রাতঃ-স্মরণীয় মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের প্রবর্ত্তিত স্কুল ও কলেজ ইহার নিকটেই অবস্থিত। মহারাজ নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও কোন ধর্ম্ম বা ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি তাঁহার দ্বেষ অথবা হিংসা ছিল না। তিনি মোসলমানদিগের ধর্ম্মালোচনায় যে রূপ সহায়তা

করিতেন, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগকেও সেইরূপ সকল বিষয়ে সাহায্য করিয়া স্বীয় উদারতার পরিচয় দিতেন। তিনি কাশীতে বহু পুণ্য-কর্ম্ম করিয়া চিরকীর্ত্তি রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার এই কলেজ প্রতিষ্ঠাও অন্যতম। তিনি এই কলেজ স্থাপনা করিয়া খৃষ্টান পাদ্রীদিগের হস্তেই তাহার পরিচালনা-ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যাহাতে হিন্দু, মোসলমান, জৈন ও খৃষ্টানাদি যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী বালকগণ রীতিমত বিদ্যালোচনা করিতে পারে, তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এতদর্থে বহু অর্থ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার কলেজ-বিভাগ এক্ষণে বিলুপ্ত হইলেও স্কুলের এখনও বেশ সুনাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত একটী সংস্কৃত উপাধিবিভাগও আছে, তাহাতেও বহু বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

এই বিদ্যালয়ের সম্মুখে পূর্ব্বে বহু চিত্র-শিল্পির আবাস ছিল। ভারতীয় মোগল-চিত্র-কলায় অর্থাৎ হস্তিদন্ত প্রভৃতির উপর অনুচিত্রে (Mineature Painting) তাহাদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। দুই এক জন আধুনিক প্রতীচ্য-শিল্পেও বেশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু পরিতাপের বিষয় এক্ষণে ইহাদের আর তেমন উন্নতি নাই, ক্রমেই ইহাদের বংশ লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এই শিল্পী-পল্লী হইতে সামান্য উত্তরে আসিলে একখানি প্রাচীন অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা 'দেবকী নন্দনের হাবেলী' বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতবড় পুরাতন বাড়ী কাশীর মধ্যে সচরাচর আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আগাগোড়া ইহা প্রস্তরাবরণে গ্রথিত। মোসলমান যুগের স্থাপত্য-শিল্পের ইহা একটী সুন্দর আদর্শ।

ডঁউরিয়াবীর ও রুণ্ডিকা-দেবী।

কাশীর মধ্যে ডঁউরিয়াবীর একটী প্রসিদ্ধ মহল্লা। রেউড়ীতলাও হইতে দক্ষিণ দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে ডঁউরিয়াবীর মহল্লায় ডঁউরিয়াবীর-দেবতার মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রতি শ্রাবণ মাসে এখানে এক মহতি মেলা হইয়া থাকে। এই মন্দিরের নিকটেই ছাগ বা বথরাব একটী বাজার অর্থাৎ হাট আছে। এই স্থানে বহু ছাগ সর্ব্বদা বিক্রয় হইয়া থাকে। ডঁউরিয়াবীরের নিকটও ছাগবলি হইয়া থাকে।

ডঁউরিয়াবীরের মন্দিরের নিকটেই রুণ্ডিকা দেবীর মন্দির অবস্থিত।

বড়হর-রাণীর মন্দির।

পূর্ব্বোক্ত মন্দিরসমূহ হইতে দক্ষিণদিকে আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে, বড়হর-রাণীর সুন্দর উদ্যান-মধ্যবর্ত্তী নবপ্রতিষ্ঠিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরমধ্যে পঞ্চোপাসক হিন্দুর গণেশাদি পঞ্চ-দেবতার সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি বিগ্রহগুলি অবস্থিত। মন্দিরের এক পার্শ্বে শ্রীমৎভাস্করানন্দ স্বামীর মর্ম্মর-নির্ম্মিত একটী অতি মনোহর মূর্ত্তি আছে। প্রসিদ্ধ স্বামী ভাস্করানন্দ-দেব অনেক সময় এই স্থানেই অবস্থান করিতেন।

গুরুধাম ও ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল।

সহর হইতে দুর্গাবাড়ী যাইবার পথে, দুর্গাবাড়ী থানার ঠিক সম্মুখে প্রকাণ্ড কাননমধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় ভূকৈলাসাধিপতি রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত গুরুধাম অবস্থিত। এই গুরুধাম-মন্দির এক অভিনব সামগ্রী। অষ্টদলাকার মন্দিরমধ্যে সহস্রদল কমলোপরি শুদ্ধ-স্ফটিক-সদৃশ শ্বেতবর্ণ বরাভয়কর দ্বিভুজ স্বপ্রকাশরূপ সশক্তি গুরুমূর্ত্তি অবস্থিত। উপরে স্বতন্ত্র মন্দিরমধ্যে মহারাজের ইষ্ট যুগলমূর্ত্তি পদ্মাসনে বিরাজিত রহিয়াছেন। এমন

ভক্তি ও সুরুচি-সঙ্গত কীর্ত্তিকলাপ দেখিলে মহারাজের অদ্ভূত কল্পনা ও নিষ্ঠাশক্তির যথেষ্ট প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

যত্নাভাবে এতদিন গুরুধামের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। সম্প্রতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎজ্ঞানানন্দ স্বামীজীর প্রবর্ত্তিত শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় এই মন্দির-সংলগ্ন প্রকাণ্ড অট্টালিকামধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। ভূকৈলাসের বর্ত্তমান রাজকুমারগণ ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের জন্য গুরুধামের সমস্ত তত্ত্বাবধান-ভার স্বামিজীর হস্তেই অর্পণ করিয়া পিতৃকীর্ত্তি রক্ষা ও নিজ নিজ অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অনুষ্ঠিত কার্য্যাবলীর আলোচনা এস্থানে সম্ভবপর নহে। তবে সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বী যাঁহারা কাশীধাম দর্শন করিতে যাইবেন, তাঁহাদের উক্ত গুরুধাম ও এই মহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় অতি অবশ্যই দর্শন করা উচিত।

এই গুরুধামের সম্মুখেই মেনকা দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির সকলে দর্শন করিয়া থাকেন।

দুর্গাজীর মন্দির বা দুর্গাবাড়ী।

কাশীর বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণা দর্শন করা ভক্তের যেরূপ আদর ও আকাঙ্ক্ষার বিষয়, দুর্গাবাড়ী দর্শনও সেইরূপ।

প্রায় দেখা যায়, যিনি কাশীতে আসিয়া কিছু না করিবেন অথবা অন্য কিছুই না দেখিবেন, তিনি অন্ততঃ বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও দুর্গাজী অবশ্যই দর্শন করিয়া যাইবেন। নতুবা হিন্দু সন্তানের কাশী-আগমনই বৃথা!

এই দুর্গাবাড়ী কাশীতীর্থের এক প্রান্তে, অসী-সঙ্গম-সমীপে বারাণসীর সেই দক্ষিণ সীমায় ইহা অবস্থিত। প্রাতঃস্মরণীয়া মহাপুণ্যবতী অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরী মহারাণী ভবানী বা রাণী-ভবানী কর্ত্তৃক এই বর্ত্তমান দুর্গামন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরের মোহনটী তৎকালের সুবেদার মহাশয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের কারুকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য মন্দ নহে। মন্দিরমধ্যে কয়েকটী বৃহৎ ঘণ্টা আছে, তন্মধ্যে একটী নেপালরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত এবং শুনিতে পাওয়া যায় অন্যটী জনৈক য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রায় ৮০ আশিবৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণ বিশ্বনাথ মন্দিরকে যেমন Golden Temple বা সুবর্ণ-মন্দির আখ্যা দিয়াছেন, দুর্গাবাড়ীকেও তেমনি Monkey Temple বা কপি-মন্দির বলিয়া উল্লেখ করেন। বাস্তবিক দুর্গাবাড়ীতে এত অধিক সংখ্যক বানরের আশ্রয়স্থল যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাহারা চতুর্দ্দিকে অসঙ্কোচে লাফালাফি

করিতেছে, যাত্রীর কাপড় ধরিয়া খাবার আদায় করিতেছে, যূপকাষ্ঠের নিকট কুক্কুর ও বানর-শিশুগুলি কেমন একত্র মিলিয়া মিশিয়া খেলা করিতেছে, সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! কোন এক ইংরাজ মহিলা তাঁহার কাশীদর্শন পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন—যখন তিনি দুর্গাবাড়ীতে উপস্থিত হন, তখন মন্দিরসংলগ্ন কুণ্ডে জনৈক গোপ স্নান করিতেছিল, কুণ্ডের সোপানোপরি রক্ষিত বস্ত্রমধ্যে তাহার উপার্জ্জিত ৩০৲ ত্রিশটী টাকা ছিল। ইত্যবসরে একটী প্রকাণ্ড বানর আসিয়া টাকাসহ সেই বস্ত্রগুলি লইয়া একটী বৃক্ষে আরোহণ করে। গোপ এই ব্যাপার দেখিয়া তাড়াতাড়ি কুণ্ড হইতে উঠিয়া যে দিকে বানরটী উঠিয়াছিল, সেই দিকে ধাবিত হয়, কলা, ছোলা ও নানাবিধ প্রলোভন দেখাইতে লাগিল, কিন্তু বানর কিছুতেই সেই বস্ত্র পরিত্যাগ করিল না। গোপ বাধ্য হইয়া তখন তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল, ক্রমে লোকের ভিড় হইয়া গেল, অনেকেই বানরের সেই কীর্ত্তি দেখিতে লাগিল, বলা বাহুল্য পূর্ব্বোক্ত ইংরাজ মহিলাও সেই তামাসা দেখিতে ছিলেন। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বানরটী দাঁত দিয়া বস্ত্রগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করতঃ এক একটী টাকা ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিল, গোপ দৌড়াদৌড়ি করিয়া

তাহা সংগ্রহ করিল, কিন্তু দুষ্ট বানর ৩০৲ ত্রিশটীর মধ্যে ১৫৲ পনেরটী কুণ্ডমধ্যে ও ১৫৲ পনেরটী পথে ফেলিয়াছিল। গোপ বহু চেষ্টা করিয়া কুণ্ড হইতে একটী টাকাও উদ্ধার করিতে পারিল না। গোপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বুঝিয়া কাতরচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল। বিবি লিখিয়াছেন, "বোধ হয় গোপ দুগ্ধে আধাআধি জল মিশাইয়া বিক্রয় করিত।

যাহাহউক দুর্গাবাড়ীতে বানরের এইরূপ উপদ্রব পূর্ব্বে প্রায়ই হইত। সময় সময় যাত্রী লোকজনের বস্ত্রাদিও ছিন্ন করিয়া দিত। একসময় জনৈক সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় মহিলার বস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহাতে সরকার পক্ষ বানর মারিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু কাশীবাসী হিন্দুগণের ঘোর প্রতিবাদে তাহাদিগকে না মারিয়া বহুসংখ্যক ধরিয়া দূরে বনমধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন পূর্ব্বের ন্যায় বানরের আর তেমন উৎপাত নাই।

এখানে কালীঘাটের ন্যায়, কাশীর দুর্গাবাড়ীতেও যথেষ্ট ছাগবলি হইয়া থাকে। কাশীবাসী অনেকেই দুর্গা-বাড়ীর সেই প্রসাদী মাংস ক্রয় করিয়া আনেন ও ভক্তিসহকারে ভোজন করেন। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার এখানে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে শ্রাবণ মাসে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা আদি সময়ে ভারি মেলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড সকলের ন্যায় দুর্গাকুণ্ডেরও অবস্থা অতি শোচনীয়, তবে জনশ্রুতি এইরূপ যে, সরকারপক্ষ শীঘ্রই ইহার জল সকল সময় পূর্ণ রাখিবার জন্য গঙ্গার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রাচীন গণপতি-মন্দির আছে। সেই মন্দিরটি সম্বন্ধে কাশীবাসী ঐতিহাসিকগণ বলেন, "আমরা বংশপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, ইহা অপেক্ষা প্রাচীন মন্দির আর নাই, ইহা সেই সত্যযুগের নির্ম্মিত। বাস্তবিক মন্দিরটীর কোন শিল্প পারিপাট্য বা কোনরূপ সৌন্দর্য্য নাই, নিতান্ত সাদাসিধা কয়েকখানি মাত্র পুরাতন প্রস্তরে গ্রথিত। তাঁহাদিগের কথা সত্য হইলে ঐ পুরাতন প্রস্তর কয়খানাই হিন্দু পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের যে অত্যন্ত আদরের বস্তু ও প্রণম্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাস্করানন্দ আশ্রম।

শ্রীশ্রীদুর্গাজীর প্রসিদ্ধ মন্দির ও কুণ্ডের অনতিদূরে পশ্চিম পার্শ্বে পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজির সমাধি ও তাঁহারই নামে নূতন আশ্রম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বহুদিন কাশীবাস করিয়া পরে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন।

তাহা সংগ্রহ করিল, কিন্তু দুষ্ট বানর ৩০৲ ত্রিশটীর মধ্যে ১৫৲ পনেরটী কুণ্ডমধ্যে ও ১৫৲ পনেরটী পথে ফেলিয়াছিল। গোপ বহু চেষ্টা করিয়া কুণ্ড হইতে একটী টাকাও উদ্ধার করিতে পারিল না। গোপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল বুঝিয়া কাতরচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল। বিবি লিখিয়াছেন, "বোধ হয় গোপ দুগ্ধে আধাআধি জল মিশাইয়া বিক্রয় করিত।

যাহাহউক দুর্গাবাড়ীতে বানরের এইরূপ উপদ্রব পূর্ব্বে প্রায়ই হইত। সময় সময় যাত্রী লোকজনের বস্ত্রাদিও ছিন্ন করিয়া দিত। একসময় জনৈক সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় মহিলার বস্ত্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহাতে সরকার পক্ষ বানর মারিবার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু কাশীবাসী হিন্দুগণের ঘোর প্রতিবাদে তাহাদিগকে না মারিয়া বহুসংখ্যক ধরিয়া দূরে বনমধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এখন পূর্ব্বের ন্যায় বানরের আর তেমন উৎপাত নাই।

এখানে কালীঘাটের ন্যায়, কাশীর দুর্গাবাড়ীতেও যথেষ্ট ছাগবলি হইয়া থাকে। কাশীবাসী অনেকেই দুর্গা-বাড়ীর সেই প্রসাদী মাংস ক্রয় করিয়া আনেন ও ভক্তিসহকারে ভোজন করেন। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার এখানে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবে শ্রাবণ মাসে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা আদি সময়ে ভারি মেলা হয়।

পূর্ব্বোক্ত কুণ্ড সকলের ন্যায় দুর্গাকুণ্ডেরও অবস্থা অতি শোচনীয়, তবে জনশ্রুতি এইরূপ যে, সরকারপক্ষ শীঘ্রই ইহার জল সকল সময় পূর্ণ রাখিবার জন্য গঙ্গার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রাচীন গণপতি-মন্দির আছে। সেই মন্দিরটি সম্বন্ধে কাশীবাসী ঐতিহাসিকগণ বলেন, "আমরা বংশপরম্পরায় শুনিয়া আসিতেছি, ইহা অপেক্ষা প্রাচীন মন্দির আর নাই, ইহা সেই সত্যযুগের নির্ম্মিত। বাস্তবিক মন্দিরটীব কোন শিল্প পারিপাট্য বা কোনরূপ সৌন্দর্য্য নাই, নিতান্ত সাদাসিধা কয়েকখানি মাত্র পুরাতন প্রস্তরে গ্রথিত। তাঁহাদিগের কথা সত্য হইলে ঐ পুরাতন প্রস্তর কয়খানাই হিন্দু পুরাতত্ত্ববিদ্‌দিগের যে অত্যন্ত আদরের বস্তু ও প্রণম্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভাস্করানন্দ আশ্রম।

শ্রীশ্রীদুর্গাজীর প্রসিদ্ধ মন্দির ও কুণ্ডের অনতিদূরে পশ্চিম পার্শ্বে পূজ্যপাদ পরমহংস শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজির সমাধি ও তাঁহারই নামে নূতন আশ্রম বা মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি বহুদিন কাশীবাস করিয়া পরে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন।

তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞ সাধু, পরম পূজ্যপাদ প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গ স্বামীর পর আর দেখা যায় নাই। তিনি তৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় সতত নগ্নাবস্থায় নির্ব্বিকারভাবে জীবনকাল অতিবাহিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত উপনিষদব্যাখ্যাদি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ চিরদিন তাঁহার কঠোর সাধনা, পাণ্ডিত্য ও অব্যক্ত ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিবে।

এই সমাধিমন্দির বা আশ্রম স্বামীজির দুইজন শিষ্য কর্ত্তৃক প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে শ্বেত মর্ম্মর-প্রস্তর দ্বারা এমন মনোহর করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে প্রকৃতই নয়নমন তৃপ্ত হয়।

কুরুক্ষেত্র।

পূর্ব্বকথিত দুর্গাকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে প্রাচীন কুরুক্ষেত্র তলাও নামক এই সুবৃহৎ পুষ্করিণী অবস্থিত। ইহারও জল অন্যান্য কুণ্ডেরই অনুরূপ। পরম পুণ্যবতী রাণী ভবানী কর্ত্তৃক এই কুরুক্ষেত্র তীর্থটী একবার ভাল করিয়া সংস্কৃত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ সময়ে এই তীর্থে অনেকেই স্নান করিয়া থাকেন। ইহার উত্তর ও উত্তরপশ্চিম পার্শ্বে নানকপন্থীদিগের একটী আখড়া বা মঠ আছে। নিকটে পঞ্চমন্দির নামে আরও কয়েকটী নূতন মন্দির

নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে রামসীতা, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি অনেক দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কাশীতলবাহিনী গঙ্গাতট।

শিবময় কাশীর ধনুষাকার পবিত্র পাদমূলে উত্তর-বাহিনী পূতসলিলা গঙ্গা কত রঙ্গে ভঙ্গে কেমন তরঙ্গ-বিক্ষেপে প্রবাহিতা। উপরে আনন্দকানন বারাণসীর দক্ষিণ সীমা অসিসঙ্গম হইতে উত্তর প্রান্ত বরুণাসঙ্গম পর্য্যন্ত অসংখ্য সোপানশ্রেণী অঙ্কে ধারণ করিয়া কত স্বর্ণধ্বজ ত্রিশূলশীর্ষ শিবমন্দির, কত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সুন্দর সৌধরাজি ও আকাশচুম্বিত বিশালদৃশ্য মিনারেট-সমূহ কাশীর সেই অদ্ভূত সৌন্দর্য্যকীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে। গঙ্গার সেই সুন্দর সোপানতট নিত্য-স্নাননিরত অগণ্য নরনারী দ্বারা সততই পরিশোভিত, সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে বিবিধ তরণী শ্রেণী ইতস্ততঃ কেমন পরিচালিত, সে স্বর্গীয় শোভা দেখিতে দেখিতে হৃদয় বিমোহিত হইয়া যায়, চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্ম্মান্তর বিশ্বাসী প্রতীচ্চ সুধীমণ্ডলীও তাহাতে অল্প আনন্দানুভব করেন না। তাঁহারাও এই মনোমুগ্ধকর শোভা সন্দর্শনার্থ নিত্য নৌকারোহণে গঙ্গায় বিচরণ করিয়া থাকেন।

প্রত্যুষে যখন অরুণরাগরঞ্জিত পূর্ব্ব গগন গায়ত্রী-শোভিত তরুণ সবিতাদেবতার প্রথম আগমন সমাচার প্রচার করিতে থাকে, যখন তাহার সেই নূতন রশ্মি-ঝলক পশ্চিমপ্রান্তে প্রতিফলিত হইয়া অর্দ্ধগোলাকার কাশীর প্রতি অঙ্গ পুলকিত করিয়া তুলে, তখন গঙ্গা-বক্ষ হইতে সহসা সেই শুভ্রোজ্জ্বল অট্টালিকাশোভিত সমগ্র বারাণসীর প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলে মনে হয়, যেন কাশীপতি বিশ্বনাথ স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত হইয়া অসিবরুণা পর্য্যন্ত উভয় দিকে নিজ বিরাট বাহুদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক উদীয়মান জগজ্জ্যোতি বাল-সূর্য্যকে ক্রোড়ে লইবার জন্যই উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। অহো! সে অলৌকিক পবিত্র নিসর্গশোভা বস্তুতই বর্ণনাতীত, সে অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতে হৃদয় তখন ভরিয়া যায়, আর মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবারও অবসর থাকে না। যে মানব কাশীতে আসিয়া বারাণসীর এ হেন স্বর্গীয় রূপমাধুরী দেখিবার সুযোগ পায় নাই, তাহার বুঝি মানব জন্মই বৃথা! আবার যাঁহারা কাশীধামে আসিয়া নব্যবিলাস রঙ্গে ডুবিয়া যান এবং দিবারাত্রি তাহাতে মধুভাণ্ডে পতিত মক্ষিকার ন্যায় মত্ত হইয়া থাকে, তাঁহারা নিশ্চয়ই কাশীপতির নিতান্ত কৃপাভাজন। বিশ্বনাথ তাঁহা-দিগকে সুমতি প্রদান করুন।

অসিসঙ্গম হইতে বরুণা পর্য্যন্ত প্রায় দুই ক্রোশ-ব্যাপী অর্দ্ধ গোলাকার কাশীর গঙ্গাতট শ্রেণীবদ্ধ সোপানসমূহে সমাদৃত। এমন সোপানবহুল স্নানঘাট ভারতের আর কোন তীর্থেই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল ঘাট কত স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মার কত অর্থ-ব্যয়ে কত কাল ধরিয়া যে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। তবে প্রত্যক্ষ ইতিহাসই এখন তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সে পুণ্যময় অতীতকীর্ত্তির রক্ষাকল্পে আর যেন কাহারও দৃষ্টি নাই। ঘাটের যে অংশ কালের অপ্রতিহত-প্রবাহে ক্রমে জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে, বর্ষার প্রবল গঙ্গাস্রোতে প্রতিহত হইতে হইতে যাহা ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া আসিয়াছে, তাহার সংস্কার-কল্পে আর কাহারও আদৌ লক্ষ্য নাই। ফলে যাহা একবার নষ্ট হইতেছে, তাহা সেইরূপেই থাকিয়া ক্রমে অনেক ঘাটের ধ্বংসেরই পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। পূর্ব্বে কাশীবাসী ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই সকল কার্য্যে তাঁহাদিগের সাধ্যানুসারে প্রভূত অর্থব্যয় করিতেন, আর আজ হিসাববুদ্ধিসম্পন্ন আত্মসুখপরায়ণ সামান্য গৃহস্থ হইতে রাজা মহারাজ পর্য্যন্ত সকলেই ইংরাজী ঢংএ স্ব স্ব আবাস গৃহ নির্ম্মাণ করিতেই তৎপর। পুণ্যতীর্থে আসিয়া বৃদ্ধ বয়সেও অনেকে সাময়িক

বাণপ্রস্থাশ্রম ছাড়িয়া মোহ ও বিলাস পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। হায়! হায়! তাঁহাদের প্রবৃত্তিগুলিও কি এ কালের অধীন, না এ বিভ্রম তাহাদের পূর্ব্ব-সংস্কার দ্বারা পরিপুষ্ট! যাহা হউক, সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি ঘাটসমূহ—যাহা সায়াহ্নে আধুনিক সুসংস্কারধ্বজী বিলাসী বড়লোকদিগের মাত্র বিহার স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রাতে তাহারই পবিত্র সোপান-পথে অসংখ্য নরনারী (আধুনিক শিক্ষিতদিগের মতে ইহারা কুসংস্কারপরায়ণ!) ভক্তি-গদগদ চিত্তে পতিত-পাবনী সুরধুনীর স্নিগ্ধসলিলে স্নান করিয়া তাহাদের জীবন মন কৃতার্থ করে,—পাঠকগণের অবগতির জন্য পূর্ব্বোক্ত মন্দিরাদির ন্যায় সেই ঘাটগুলিরও যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে যথাক্রমে প্রদত্ত হইতেছে।

অসিঘাট।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বারাণসীর দক্ষিণসীমা অসি-নদী। ইহা অতি প্রাচীনকালে একটী ক্ষুদ্র-স্রোত-স্বতী ছিল, কিন্তু অধুনা অসির সে স্বভাবস্রোত নাই। নদী একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, বর্ষাকালে ইহাতে জল পূর্ণ হইলে স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রতীয়মানা হয়। বোধ হয় সেই কারণ অনেকে অসিনালা বলিয়াও ইহার উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ ইহা নালা নহে, বহু



প্রাচীনকাল হইতেই ইহা গঙ্গার একটী প্রসিদ্ধ উপনদী বলিয়া পরিচিত। বারাণসীর দক্ষিণপ্রান্তে গঙ্গার সহিত যে স্থানে ইহা মিলিত হইয়াছে, তাহারই নাম অসিসঙ্গম বা অসিঘাট। ইহা কাশীতলবাহিনী গঙ্গার প্রসিদ্ধ পঞ্চতীর্থের অন্যতম বা সর্ব্ব প্রথম তীর্থ। এই (১) অসিসঙ্গম তীর্থে যাত্রিগণ প্রথমে স্নান করিয়া পরে (২) দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করেন, অনন্তর (৩) বরুণাসঙ্গম, তদনন্তর (৪) পঞ্চগঙ্গা, সর্ব্বশেষে (৫) মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিয়া থাকেন। কাশীস্থ গঙ্গার এই প্রসিদ্ধ পাঁচটী ঘাটই পঞ্চতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পঞ্চক্রোশী যাত্রী-গণও এই স্থান হইতে পঞ্চক্রোশী পথে যাত্রা আরম্ভ করিয়া বরুণাসঙ্গমে আসিয়া পথের যাত্রা শেষ করেন।

অসিঘাট কাশীর অন্যান্য ঘাটের ন্যায় প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত নহে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল, কি না, তাহারও কোন চিহ্ন বা ঐতিহাসিক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় না। তবে এই ঘাটের উপরে অনেক মন্দির, মঠ ও আখড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরটী সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অসি-ঘাটের উপরেই, সামান্য দক্ষিণদিকে, জগন্নাথ প্রভুর প্রকাণ্ড মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার প্রাঙ্গণ, অতিথি-শালা ও গৃহাদি বহু বিস্তৃত। জগন্নাথের স্নানযাত্রা

উপলক্ষে এখানে এক প্রকাণ্ড মেলা হইয়া থাকে। বহু যাত্রী সে সময় প্রভু-দর্শনার্থে এই স্থানে সমবেত হয়। রথযাত্রা পর্ব্বোপলক্ষে জগন্নাথ-মূর্ত্তি মন্দির হইতে অসিঘাটে আনিত ও রথোপরি স্থাপিত হইয়া থাকে। সে সময় এই অসিঘাটে তিন দিবস ধরিয়া প্রকাণ্ড মেলা হয়। সেই মেলায় প্রত্যহ সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম।

জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণে গঙ্গার ধারে শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলের অনুষ্ঠিত 'শ্রীবিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম' প্রাচীন ব্রহ্মচর্য্য রীতির পুনঃপ্রচার জন্য স্থাপিত হই-য়াছে। বহু দ্বিজ-সন্তান তথায় উপনয়নান্তে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদাদি সনাতন-শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিতেছে। সন্ন্যাসী ও গৃহী ধর্ম্মপ্রচারকদিগের শিক্ষার জন্য পূর্ব্বোক্ত 'গুরুধাম' নামক স্থানে মহা-মণ্ডলের "উপদেশক মহাবিদ্যালয়" স্থাপিত হইয়াছে। এখানেও বহু বিদ্যার্থী আর্য্য-দর্শনাদি শাস্ত্রসমূহ পাশ্চাত্য দর্শনের সহিত শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত বাঁশফটকা নামক স্থানে স্বতন্ত্র "বেদ-বিদ্যা-লয়" প্রতিষ্ঠিত আছে। কাশীর প্রায় অধিকাংশ

পাঠশালা ও বিদ্যালয় এই মহামণ্ডলের সহিত সংশ্লিষ্ট। মহামণ্ডল-প্রবর্ত্তিত এই সকল কার্য্য বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় ও প্রশংসনীয়।

লোলার্ক কুণ্ড।

অসিঘাটের বাম পার্শ্বে প্রসিদ্ধ লোলার্ককুণ্ড অবস্থিত। শাকদ্বিপী ব্রাহ্মণগণের লোলার্কশাখা কর্ত্তৃক অতি প্রাচীন কালে এই কুণ্ডটী প্রতিষ্ঠিত। কুণ্ডটী বহুদিন হইতে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল, পরে রাণী অহল্যাবাই, অমৃতরাও ও অন্যান্য কতিপয় জমিদারের যত্নে পুনরায় সংস্কৃত হইয়াছে। ইহা একটী প্রকাণ্ড কূপ ও বাওলী। কূপ বা কুণ্ডস্থিত জলে নামিবার জন্য বাওলী হইতে সুন্দর সোপানশ্রেণী বিন্যস্ত।

সম্বৎসরের মধ্যে এখানে প্রায় সাধারণ যাত্রীর সমাগম দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে বর্ষাকালে এখানে যে লোলার্ক মেলা হয়, তাহাতে বহু নর নারীর সমাগম হইয়া থাকে। বিশেষ স্ত্রীলোকগণ মেলা উপলক্ষে কুণ্ডে স্নান করিয়া পরে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকে। এই কুণ্ডেরই অনতিদূরে ভদ্রেশ্বর

মহাদেবের একটী মন্দির প্রতিষ্ঠিত। কার্ত্তিক মাসে এখানে অলর্ক-চতুর্দ্দশীর মেলা হইয়া থাকে।

লালামিশ্র ঘাট।

অসি হইতে উত্তরদিকে প্রথমেই যে বিরাট প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা রয়লা বা লালামিশ্রের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, মহারাজ রণজীৎ সিংহ যাঁহাকে বিশ্বনাথের মন্দির-চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দিবার জন্য ভার দিয়াছিলেন, তিনি তাহা হইতে ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া নিজ নামে এই ঘাট ও ঘাটের উপর এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অধুনা এই অট্টালিকা ও ঘাট রেঁওয়া মহারাজের সম্পত্তি। সেই কারণ কেহ কেহ রেওয়া ঘাটও বলিয়া থাকেন। কিন্তু এই লালামিশ্র ঘাট নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ইহা ভদনী বা ভদৈনী ঘাট বলিয়া পরিচিত ছিল। কাশীর প্রারম্ভকাল হইতে এইরূপ কত ঘাট যে নির্ম্মিত হইয়াছে, আবার কত ঘাট যে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জিত হইয়াছে, তাহার হিসাব নাই। যখন যে অংশ যে স্বনামধন্য পুণ্যাত্মার অধিকারে আসিয়াছে, তখন তাঁহারই নামে তাহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে। লালামিশ্র ঘাট রেঁওয়াধি-

পতির অধিকারে আসিলেও এ পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট মহারাজের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। এই লালামিশ্রের ঘাটসংলগ্ন আর একটী ঘাট বাজীরাও ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাকেও কেহ কেহ লালামিশ্র ঘাট বলিয়া থাকে। যাহাহউক ইহাও রেঁওয়া মহারাজ কর্ত্তৃক অধুনা অধিকৃত। এই ঘাটদ্বয়ের উপরে দুর্গসদৃশ সুন্দর প্রকাণ্ড সৌধ বিরাজিত রহিয়াছে। সৌধপ্রান্তদ্বয় প্রস্তর নির্ম্মিত বিশাল স্তম্ভ-সমন্বিত।

—:০:—

তুলসীঘাট।

তুলসীঘাট পূর্ব্বোক্ত অট্টালিকার পার্শ্বেই অবস্থিত। হিন্দিভাষার অমর দার্শনিক কবি রামায়ণকার তুলসী-দাসের নামে ইহা প্রসিদ্ধ। পরমভক্ত তুলসীদাস গোস্বামী উত্তরকালে এই স্থানেই আপন সাধন ভজন করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই তাঁহার পূত-লেখনী-প্রসূত রামকথামৃত দোঁহাবলী প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্তকবির স্মৃতি-সৌন্দর্য্য ব্যতীত ঘাটের দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। ঘাটের উত্তরদিকে একটী অতি সাধারণ বাটীর মধ্যে তিনি বাস করিতেন। সে গৃহ এখনও অনেকেই ভক্তিসহকারে দর্শন করিয়া

থাকে। গৃহমধ্যে তাঁহার ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য এখনও অতি যত্নে রক্ষিত আছে। ভক্তিমান রামায়ৎ বৈষ্ণবগণ তাহা দর্শন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন, কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে মহাপুরুষ হিন্দি-ভাষায় এমন অমূল্য রত্নরাজী রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা হিন্দিভাষাবিদ্ সকলেই অতি ভক্তি-গদগদ হৃদয়ে নিত্য পাঠ ও শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই পবিত্র সাধন-পীঠের প্রকৃত সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য এ পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্মাত্মাই কিছু করেন নাই। কাশীবাসী জনসাধারণের এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া অগ্রসর হওয়া বিধেয়।

অসিমাধবাদি কতিপয় প্রাচীন লুপ্ত ঘাট।

তুলসীঘাটের নিকটেই অসিমাধবের ঘাট। কিন্তু এই ঘাটটী অধুনা তুলসীঘাটের নামেই উক্ত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীনকাল হইতে ঘাটের যে সকল নাম ছিল, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অসি হইতে বরুণা পর্য্যন্ত পুরাণ-প্রসিদ্ধ কতিপয় ঘাট ব্যতীত প্রায় সমস্ত গুলির নামই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। অনেকগুলি ঘাট

এরূপে নষ্ট হইয়াছে যে,তাহার ভগ্নাবশেষ ইষ্টক-প্রস্তরাদি চিহ্নসহ তাহার সেই প্রাচীন নামটীও কোথায় বিলুপ্ত হইয়াছে। পরেশনাথ ঘাট, অক্রুর ঘাট, বৈদ্যনাথ ঘাট, নির্জ্জলী ঘাট, নির্ব্বাণী ও হিঙ্গুআদি প্রাচীন ঘাটগুলির কোন চিহ্নই নাই। অথচ তাহাদের স্মরণার্থে এখনও স্থানীয় সামান্য সামান্য মেলা হইয়া থাকে; এবং উপরে কোন কোন ঘাটের নামানুসারে যে সকল মন্দিরাদি আছে, তাহাতেই ইহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ জৈন তীর্থাঙ্কুর পরেশনাথের ঘাট নাই, কিন্তু তাঁহার মন্দির আছে। বৈজনাথের মন্দির আছে, কিন্তু ঘাটের চিহ্ন মাত্র নাই, অথচ শিব-চতুর্দ্দশীর দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। নির্জ্জলীঘাটের নামটী পর্য্যন্ত কালস্রোতে জলাঞ্জলি হইয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে মেলা হয়। পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠমাসে ভৈমী একাদশীর সন্ধ্যার সময়ে এখানে মহতী মেলা হইত, কিন্তু সে মেলা এখন বিস্তৃত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন দশাশ্বমেধ হইতে প্রায় সকল ঘাটে প্রাতঃকাল হইতেই মেলার মাহাত্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এক সময় কাশীতে থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাসে নির্জ্জলা একাদশী করেন, অপরাহ্নকালে তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলে, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে এই ঘাটে আনয়ন

করতঃ স্নান করাইয়া তাঁহার চৈতন্য আনয়ন করেন। সেই কারণ এখানকার লোকে প্রাচীনকাল হইতে এই ভীমসেনী একাদশীতে নির্জ্জলা উপবাস করিয়া সায়াহ্নে এই ঘাটে স্নান করিয়া যাইত। কিন্তু সে ঘাটের বিলোপ হওয়ায় এখন যে কোনও ঘাটে সকলে স্নান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই ঘাটে মেলা উদ্দেশ্যে গঙ্গায় সন্তরণ করিয়া পরপারে যাইবার জন্য ভয়ানক প্রতিযোগিতা হইত। এখনও সে প্রতি-যোগিতা দশাশ্বমেধ ও মুন্সিঘাট আদি হইতেই হইয়া থাকে। হিন্দু মোসলমান সকলেই এই প্রতিযোগিতায় অগ্রসর হয়। অহল্যা ও মুন্সি ঘাট হইতে সে দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম !

কলঘাট।

কলঘাট—এই স্থান হইতে ওয়াটার ওয়ার্কসের (Water works) কয়েকটী সুবৃহৎ পাইপ গঙ্গার সলিলমধ্যে নিমজ্জিত আছে। কাশীর জলের কলের জন্য এই স্থান হইতেই জল গৃহীত হইয়া থাকে। এই জল ভেলুপুরার নিকটবর্ত্তী পম্পিং ষ্টেসনে পরিষ্কৃত হইয়া সহরময় প্রতিগৃহে নিত্য প্রদত্ত হইতেছে। প্রায় ১৭।১৮ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই কল প্রতিষ্ঠিত হয়,

তখন পূর্ব্বোক্ত ঘাটগুলির সহিত রামসীতার মন্দিরদ্বয়ও বিনষ্ট করিবার জন্য কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ মনস্থ করেন এবং সে কার্য্যে তাঁহারা কিঞ্চিৎ অগ্রসরও হন। এই কথা জানিতে পারিয়া কাশীবাসী সাধারণ হিন্দুগণ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং আবাল-বৃদ্ধ যষ্টি ও অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া তখনই মন্দির রক্ষার জন্য মন্দির সমীপে উপস্থিত হয়। এদিকে দুষ্ট ব্যক্তিগণ অবসর বুঝিয়া বেঙ্গলব্যাঙ্ক প্রভৃতি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে, ক্ষণকালের জন্য চতুর্দ্দিকে এক ভীষণ হুলস্থূল পড়িয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় যে সেই ভয়ানক দাঙ্গায় কত যে খুন জখম হইয়াছিল তাহার হিসাব নাই। পরে অতি কষ্টে গবর্ণমেণ্ট সে দাঙ্গা মিটাইয়া দেন ও রামসীতার পবিত্র মন্দির কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হয়। এই কলঘাটের নিকটেই সীতা বা শ্রীজানকীঘাটের নূতন সংস্কার হয়। ঘাটের বহু অট্টালিকা ও শিবালয় শোভিত রহিয়াছে।

বৎস্যরাজঘাট।

পূর্ব্বোক্ত কলঘাট ও জানকীঘাট হইতে অন্য কয়েকটী ভগ্ন ঘাটও অধুনা বৎস্যরাজ ঘাট বলিয়াই উক্ত হইয়া থাকে। এ ঘাটগুলিরও অবস্থা অতি শোচনীয়,

কোনটীর সামান্য অস্তিত্ব আছে, আবার কোনটীর চিহ্নমাত্রও নাই। এখানে ঘাটের সোপানশ্রেণীও অধিকাংশ নাই, ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। জানকী ঘাটের পরেই ছেদীলালের নামে একটী জৈন-মন্দির আছে। তাহার পর অতি জীর্ণ অট্টালিকা ও সোপান-বিশিষ্ট রায়সাহেবের ঘাট, অনন্তর ইমলিয়া ঘাট, প্রভুদাসের ঘাট ও বৎস্যরাজ ঘাট; কিন্তু এই সকল ঘাটই এক্ষণে বৎস্যরাজ ঘাট বলিয়া পরিচিত।

—:•:—

শিবালয়ঘাট।

শিবালয়ঘাট কাশীর ইতিহাসে একটী অতি প্রসিদ্ধ ও স্মরণীয় ঘাট। মহারাজ চেৎ সিংএর্ কাশীস্থিত এই প্রাসাদ অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে বহু শিবমন্দির পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া অদ্যাবধি ইহা শিবালয় নামে উক্ত হইয়া আসিতেছে। অট্টালিকাটী গঙ্গার ধারে উত্তর দক্ষিণে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বাহ্য দৃশ্য দেখিতে কতকটা সে কালের দুর্গের অনুরূপ। উত্তর অংশে বৃহৎ তোরণ সমন্বিত উচ্চ অট্টালিকা। শুনা যায়, এই অংশেই মহারাজ চেৎ সিং সময় সময় কাশীবাস করিতেন। তোরণসম্মুখে সোপানসম্বদ্ধ সুন্দর

ঘাট গঙ্গাগর্ভে ক্রমে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে দুর্গানুরূপ সেই সুদীর্ঘ প্রাচীরপাদে সোপানশোভিত কোনও ঘাটের চিহ্নমাত্রও নাই। কেবল গঙ্গামৃত্তিকাজাত উচ্চ তীরভূমি, তাহাও বর্ষার স্ফীত গঙ্গাজলে প্রতিবৎসর সমাহিত হইয়া যায়। তখন নৌকারোহণে অনেকেই অট্টালিকাপার্শ্বে উপস্থিত হইতে পারেন। বর্ষাকালে সেই সৌধস্থ তোরণপার্শ্বে প্রাচীরসংলগ্ন প্রস্তরখণ্ডে বহু নৌকা বাঁধা থাকে। যখন মহারাজ চেৎ সিংহ দৈব-দুর্ব্বিপাকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস কর্ত্তৃক এই শিবালয়মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন, তখন তিনি অনন্য-উপায় হইয়া আত্মরক্ষার্থে অতি দুঃসাহসিকভাবে এই বাটীর উত্তরস্থিত জানালা হইতে সপরিবারে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নিম্নে কয়েক-খানি নৌকার উপর পতিত হন ও তখনই ছদ্মবেশে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। শিবালয়স্থিত সেই জানালা তিনটী দেখিতে দেখিতে এখনও কত লোকে কত অতীতস্মৃতির কল্পনা করিয়া থাকে। এই সুদীর্ঘ প্রাসাদের উত্তরাংশ যেমন মহারাজ চেৎ সিংহের পলায়ন প্রসঙ্গ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ, সেইরূপ দক্ষিণ প্রান্তস্থিত সৌধাংশও আর এক ঐতিহাসিক ঘটনায় এখনও সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতের শেষ মোসলমান-সম্রাট দিল্লীশ্বরের বংশধর সাজাদাগণ

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া শিবালয়ের এই দক্ষিণ সৌধে বহুদিন হইতে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন। বেনারসের কলেক্টার সাহেব বড় লাটের এজেণ্টরূপে তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। সাজাদাগণের মধ্যে বংশবৃদ্ধি হইয়া বহু অংশে ক্রমেই তাহারা বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, সুতরাং বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি বা ভাতা প্রত্যেকের অংশে এখন এত অল্প হইয়া পড়িয়াছে যে, তাঁহারা নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় এখানে বাস করিয়া দিনাতিপাত করিয়া থাকেন। বিগত দিল্লী-দরবার উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে প্রধান একজন দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য সরকারে আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু বচন-চতুর সম্রাট-প্রতিনিধি কর্জ্জন বাহাদুর নাকি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, যে দরবারে এক সময় আপনাদের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বাধীনভাবে অধিনায়কতা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে আপনারা আজ কোন মুখে নিতান্ত হেয় দর্শকরূপে উপস্থিত হইতে অভিলাষ করিয়াছেন, এরূপ প্রস্তাব মনে উদিত হইবার পূর্ব্বেই আপনাদের লজ্জা অনুভব করা উচিত ছিল। যাহা হউক তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে দুঃখ না করিয়া থাকা যায় না।

বেনারস-মহারাজ শ্রীমান প্রভুনারায়ণ সিং সম্প্রতি বৃটীশ-গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক অর্দ্ধ-স্বাধীনতা বা সামন্তরাজের অধিকারসম্মানে সম্মানিত হইয়াছেন। বৃটিশ আধিপত্যের সূত্রপাত হইতে কোন জমিদারই এপর্য্যন্ত এরূপ সম্মান ও অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। শুনা যাইতেছে, তিনি এই শিবালয় নামক প্রাচীন সৌধটী পুনরায় গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া তাহার সম্পূর্ণ সংস্কার আরম্ভ করিয়াছেন।

এই ঘাটের পরেই কিয়ৎপরিমাণ স্থান এমনই পড়িয়া আছে, তাহাতে কোনরূপ বাঁধা ঘাট নাই। একটী নেপালী পরিবার চিরস্থায়ীরূপে এই স্থানে বসবাস করিবার কারণ কেহ কেহ ইহাকে নেপালী ঘাট বলিয়া ও উল্লেখ করেন।

দণ্ডীঘাট ও হনুমানঘাট।

দণ্ডীঘাট পূর্ব্বোক্ত নেপালী ঘাটের পরেই অবস্থিত। ঘাটটী অতি প্রাচীন, দণ্ডী-সন্ন্যাসীরা এখানে নিত্য স্নান করিয়া থাকেন। ঘাটের উপরে

প্রসিদ্ধ বল্লভাচার্য্যের নামে একটী বাটী আছে। ইহার পরেই অতি প্রাচীন হনুমান ঘাট ও তাহার সোপান-শ্রেণী। ঘাটের উপর নাগাদিগের সুন্দর অট্টালিকা শোভিত রহিয়াছে।

শ্মশানঘাট বা হরিশ্চন্দ্রঘাট।

হনুমানঘাটের পরই কাশীর অতি প্রাচীন শ্মশান ঘাট, মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের ঘাট বলিয়াও ইহা প্রসিদ্ধ। অন্যান্য ঘাটের মত ইহা প্রস্তরদ্বারা সোপানবদ্ধ নহে, এ ঘাটে লোক জনও তত অধিক স্নান করে না, তবে শ্মশানকার্য্যে এখনও ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি কাশীর মধ্যে দুইটী শ্মশান ঘাট, একটী মণিকর্ণিকা অন্যটী এই হরিশ্চন্দ্রঘাট। শুনিতে-পাওয়া যায় এইটীই কাশীর প্রাচীন শ্মশান বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্মশানের সেই চিরপ্রসিদ্ধ সংসার-বৈরাগ্যের গম্ভীরভাবপূর্ণ উন্মুক্ত দৃশ্য মণিকর্ণিকা অপেক্ষা এই স্থানেই অধিক পরিলক্ষিত হয়। মানবের শেষ শান্তির লীলাভূমি—হিংসা, দ্বেষ, গর্ব্ব, অভিমান পরিবর্জ্জিত—উচ্চ, নীচ, ধনী, নির্ধন সকল উপাধির সমন্বয় ক্ষেত্র, ইহা একটী মহান পুণ্যময় প্রাচীন তীর্থ;

বিলাস-আভরণবিহীন এমন পবিত্র স্থান দেখিলে চিত্ত তৎক্ষণাৎ সংসারের সকল ছায়াময়ী খেলা ভুলিয়া যায়, হৃদয় সহসা গভীর পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। শ্মশান মাত্রেই এই অপ্রতিহত অভিনব শক্তি প্রত্যক্ষীভূতা হইলেও মহাশ্মশান হরিশ্চন্দ্রঘাটের বৈচিত্র্য বস্তুতই অদ্ভুত! যে ঘাট সেই স্মরণাতীত সময় হইতে কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া শ্মশানকার্য্যে নিয়োজিত, যে ঘাটের প্রতি অণু-পরমাণুতে কত সাধু মহাজনের পূত-অঙ্গ বিলীন রহিয়াছে, যে স্থলে কত পুণ্যবতী সাধ্বী সরলা সতীত্বের জ্বলন্ত আদর্শ রক্ষা কল্পে প্রজ্জ্বলিত চিতানলে মৃত-পতির পার্শ্বে অবলীলাক্রমে নিজ জীবনলীলা বিসর্জ্জন দিয়াছেন, যাহার অসংখ্য স্মারকস্তূপ যে ঘাটের চতুঃপার্শ্বে এখনও বিরাজিত রহিয়াছে, শত শত সাধ্বী সরলা এখনও সেই ঘাটস্থিত সতী-স্তূপগুলির নিত্য অর্চ্চনা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। এতদ্ব্যতীত আদর্শ সত্যনিষ্ঠ দানবীর পুণ্যশ্লোকঃ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, যাঁহার নাম করিলে মানবের দেহ মন পবিত্র হয়, সেই মহাপুরুষের সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত অলৌকিক ভাগ্য-বিপর্য্যয় সেই প্রসিদ্ধ ও পবিত্র শ্মশান-সম্রাট এই হরিশ্চন্দ্রঘাটের সহিত সংযোজিত। গঙ্গাগর্ভে শ্মশানেশ্বর বা হরিশ্চন্দ্রেশ্বর মহাদেবের সেই সুপ্রাচীন মন্দির দেখিলে, শ্মশানের নিত্য পরিদৃশ্যমান

চিতাগ্নিসমূহের আকাশ পরিব্যাপ্ত ধূমরাশি দেখিলে, এখনও দর্শকের হৃদয়ে সেই শোচনীয় অতীত স্মৃতি জাগাইয়া তুলে, মনে হয়—মহারাজ হরিশ্চন্দ্র সর্ব্বস্ব দান করিয়াও নিজে একমাত্র সত্যব্রত পালনকল্পে স্ত্রী পুত্র বিসর্জ্জন দিয়াও নিষ্কৃতি পাইলেন না ; হায় হায়! পরিশেষে শ্মশানরক্ষক এক নীচ চণ্ডালের হস্তে পৃথিবী-পতিকে তুচ্ছ অর্থবিনিময়ে আত্মবিক্রয় করিতে হইল। পুণ্যবান পরাক্রান্ত ক্ষত্রনরপতি স্বীয় ভাগ্য-চক্রের কি ভীষণ আবর্ত্তনে আজ অস্পর্শীয় চণ্ডালদাস-রূপে অতি ঘৃণিত শ্মশান-রক্ষাকার্য্যে নিয়োজিত! সম্মুখে আলুলায়িত-কুন্তলা পুত্রশোক-কাতরা এক দীনা রমণী শবশিশু ক্রোড়ে লইয়া মর্ম্মভেদী কথায় কত অনুনয় বিনয় করিতেছে—নির্ম্মম চণ্ডালদাস চণ্ডাল হইতেও বুঝি কঠোর! তাহাতে তাহার কিছুমাত্র কর্ণপাত নাই, কেবল প্রভুআজ্ঞা পালনেই সে যেন অবিচলিতচিত্ত—ধীর স্থির, দগ্ধ প্রান্তবিশিষ্ট একটী দণ্ড ধারণ করিয়া গম্ভীরভাবে সে দণ্ডায়মান। হায়! মোহান্ধ মহারাজ, তোমারই প্রাণপ্রিয়া জীবন-প্রতিমা শৈব্যা, তোমারই নয়নতারা আনন্দধারা সর্পাহত রহিতাস্যকে ক্রোড়ে লইয়া উপবিষ্টা, তাহাও কি চিনিতে পারিলে না? হায় সর্ব্বগুণাধার করুণাময় লোক-পাল, কার্য্যে মানুষকে কি এতই আত্ম-বিস্মৃত করে—অথবা একি

মোহমুক্ত শ্মশান-মাহাত্ম্যের পরিচয়! এ দৃশ্যে মানবকে যাহা শিক্ষা দেয় মহারাজ, মানব কোন কর্ম্ম-ফলে তাহা প্রতিক্ষণে ভুলিয়া যায়? পাশবদ্ধ জীব শ্মশান-সৌন্দর্য্য দেখিয়া পাশমুক্তির প্রত্যাশা করে না, ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া শ্মশানপ্রান্ত হইতে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু ভ্রমেও ভাবিয়া দেখে না যে, তাহার শ্মশান-প্রত্যাখ্যানের উপায় নাই!

যাহাহউক এই ঘাটটী প্রকৃতই শ্মশান-সুলভ মানবসাধারণের একেবারেই পরিত্যক্ত। কথিত আছে, ইহাই আদি মণিকর্ণিকা, কিন্তু কালবশে এখন আর কেহই সে নামে ইহার পরিচয় দেয় না। আরও আক্ষেপের বিষয় কোন স্বধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা আজিও যৎসামান্য অর্থ প্রদান করিয়া সে দানবীর অতীতকীর্ত্তি-মহাপুরুষের স্মৃতি অলঙ্কৃত করিতে অগ্রসর হন নাই। হায়, নামের কাঙ্গাল ঐশ্বর্য্যপুষ্ট নর নারি,—এ দানে তোমার নাম হইবে না, তোমার ব্যয়ে সোপানবদ্ধ হইলেও লোকে 'হরিশ্চন্দ্রঘাটই' বলিবে, এই আশঙ্কায় বুঝি এ কার্য্যে অগ্রসর হইতে বিরত হইয়াছ?

অঘোরাচারী কোন কোন কঠোর সাধক সময় সময় এই স্থানে অবস্থান করিয়া স্ব স্ব সাধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ অঘোরীবাবাও এই স্থানে বহুকাল নিজ আসন রক্ষা করিয়া ছিলেন।

লালীঘাট ও ভিজানগরঘাট।

অনতিবিস্তৃত দীর্ঘ সোপানশ্রেণী এই ঘাটের সৌষ্ঠব রক্ষা করিতেছে। কথিত আছে, লালশাহ নামক জনৈক মোসলমান ফৌজদার কর্ত্তৃক এই ঘাটটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। লালশা’ মোসলমান-অধিকারকালে কাশীর প্রান্তে বরুণাসঙ্গমে প্রসিদ্ধ রাজা বানারের কিলা বা কেল্লার অন্তর্গত গড়বদ্ধ স্বীয় প্রাসাদমধ্যে অবস্থান করিয়া নবাবের ফৌজদাররূপে রাজকার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন। কিলান্তর্গত অট্টালিকাসমূহ-মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটী সুন্দর মসজিদ এখনও বর্ত্তমান আছে, লোকে এখন সেই মসজিদটীকেই “লালশাহী গড়” বলিয়া উল্লেখ করে। এই লালীঘাটের পর লক্ষ্মীঘাট ও অন্যান্য কয়েকটী ছোট ছোট ঘাট আছে। তন্মধ্যে ভিজানাগরাধিপতির বিনির্ম্মিত একটী নূতন ঘাট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঘাটটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সুন্দর সোপানশ্রেণী ও অট্টালিকা দ্বারা সুশোভিত।

——:0:——

কেদারঘাট।

কাশীর ঘাটসমূহমধ্যে কেদারঘাটও একটী প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘাট। বিশেষ বাঙ্গালীটোলার সম্মুখে

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম কাশীর অনাদি কেদার-নাথের নিস্কলঙ্ক মন্দিরপাদে এই প্রস্তরনিবদ্ধ সুন্দর ঘাটটী কাশীবাসী বাঙ্গালী মাত্রেরই অত্যন্ত আনন্দপ্রদ আদরের স্থান। কাশীখণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে উজ্জয়িনী প্রদেশে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তিনি হিমগিরি কেদার-খণ্ডান্তর্গত শ্রীকেদারনাথের পরম ভক্ত ছিলেন, প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে তিনি পদব্রজে যাইয়া কেদারনাথ দর্শন করিয়া আসিতেন। ক্রমাগত ৬১ বৎসর ব্রাহ্মণ একভাবে যাইয়া পরবর্ত্তী বৎসরে যখন যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার অত্যন্ত বৃদ্ধাবস্থা দেখিয়া এইবারে তাঁহাকে যাইতে নিবৃত্ত করিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। ভগবান কেদারনাথ ভক্ত-প্রবর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই দৃঢ়তা জানিতে পারিয়া কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন ও ভক্তের ইচ্ছানুসারে কাশীধামে আসিয়া অনাদি-লিঙ্গ-কেদারনাথরূপে অবস্থান করিলেন। শাস্ত্রে আছে—কেদারখণ্ডস্থিত কেদারনাথ-দর্শনে যে ফল হয়, কাশীস্থিত কেদারনাথ-দর্শনে তাহার সপ্তগুণ অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে, কাশীর যত দেবমূর্ত্তি কালা-

পাহাড় প্রভৃতি কর্ত্তৃক সময় সময় সমস্তই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল, কেবল কেদারনাথ শিবলিঙ্গই দৈবক্রমে কোন বিধর্ম্মী কর্ত্তৃক কখনও কলঙ্কিত হয় নাই।

কেদারনাথের মন্দির-গাত্র শ্বেত ও রক্তবর্ণ ঊর্দ্ধ-লম্ব রেখাকারে সুন্দররূপে চিত্রিত। এ ধরণে মন্দির চিত্রিত করা প্রায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না: মূল মন্দির ব্যতীত গণেশ, লক্ষ্মীনারায়ণ, অন্নপূর্ণা, ভৈরবনাথ আদি বহু দেবমূর্ত্তি মন্দিরের চারিদিকে ও ঘাটের উপর স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরমধ্যে অবস্থিত আছেন। সোপানশ্রেণীর নিম্নদেশে একটী ক্ষুদ্র কূপ বা কুণ্ড আছে, তাহা গৌরীকুণ্ড বা মানসতীর্থ বলিয়া অভিহিত। কথিত আছে, পুরাকালে হিম-সুতা গৌরী মানস করিয়া এই কুণ্ডে স্নান করিয়া-ছিলেন, সেই কারণেই ইহা উক্ত নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ত্রিবিধ জ্বরহর এই কুণ্ডের জলে স্নান করিলে শ্রীকেদারকৃপায় তাহার অবশ্যই মুক্তি হইয়া থাকে।

এই কেদারঘাটের নিকটেই তাহিরপুরাধিপতির সুবৃহৎ অট্টালিকায় শ্রীভারত ধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রধান কার্য্যালয় স্থাপিত হইয়াছে।

চৌকিঘাট ও সোমেশ্বরঘাট।

কেদারঘাটের পরই চৌকীঘাট নামে একটী ক্ষুদ্র ঘাট আছে। ঘাটের উপর একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ, বৃক্ষমূল প্রস্তরাদি দ্বারা সুন্দর করিয়া বাঁধান। তাহাতে নাগ-দেবতার মূর্ত্তি আছে।

ইহার পর সোমেশ্বরঘাট। ঘাটের উপর সোমেশ্বর-দেবমন্দির অবস্থিত।

মানসরোবর ও তিলভাণ্ডেশ্বর।

কেদারনাথের মন্দির হইতে উত্তর-পশ্চিমদিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মানসরোবর নামে একটী প্রকাণ্ড সুগভীর জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। সরোবরমধ্যে জল অতি সামান্য, বর্ষাকালে কিছু বাড়িয়া থাকে। মহারাজ মানসিংহ এই সরোবরটী একবার ভাল করিয়া সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আবার উহার অনেক স্থল জীর্ণ ও ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইহার চারিদিকে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি ,মন্দিরে ও বাহিরে পড়িয়া আছে। ইহাদের মধ্যে রাম লক্ষ্মণের মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরপ্রান্তে দত্তাত্রেয়ের

একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি আছে। মহারাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক মানেশ্বর মহাদেব ও তাহার সুন্দর মন্দির এই সরোবরের নিকটেই প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের পশ্চিমে প্রসিদ্ধ তিলভাণ্ডেশ্বরের অতি প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে প্রায় তিন হাত উচ্চ তিল-ভাণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই লিঙ্গমূর্ত্তি প্রত্যহ তিল তিল পরিমাণ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মন্দিরটী অতি প্রাচীন। অনেকে বলেন, প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে কোন হিন্দু নরপতি কর্ত্তৃক ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। মন্দির-গাত্রস্থিত কারুকার্য্য সকল ক্রমে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার নিকটেই এক অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বীরভদ্র নামে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মানবাকৃতি এক প্রকাণ্ড মহাদেব মূর্ত্তি মৃন্মধ্যে অর্দ্ধ প্রোথিত-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার কটীদেশ হইতে কেবল উত্তমাঙ্গই প্রায় তিন হস্ত পরিমাণ হইবে। একটী বাহু একেবারে নাই, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটী দেখিলে নিঃসন্দেহ অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। কেহ কেহ বৌদ্ধ সময়ের খোদিত বলিয়া অনুমান করেন। যাহা হউক এরূপ মূর্ত্তি অধুনা প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্দিরগাত্রেও এই রূপ আর একটী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও

পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তির সমসাময়িক বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইহার নিকটেই মুক্তেশ্বর মন্দিরের পার্শ্বে ঐরূপ আর একটী মূর্ত্তি আছে।

এই মানসরোবরের প্রায় সম্মুখেই গঙ্গার ধারে মানসরোবরঘাট বলিয়া একটী সুন্দর ঘাট মহারাজ মানসিংহ বাঁধাইয়া দিয়া ছিলেন, কিন্তু কালধর্ম্মে এক্ষণে তাহা ধ্বংস ও বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে।

নারদাদি কতিপয় প্রাচীন সাধারণ ঘাট।

ইহার পর রাজা অমৃতরাওঘাট প্রসিদ্ধ। বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বর্ণনা ইহার কিছুই নাই। রাজা অমৃতরাও ঘাট, রাজা বিনায়কঘাট বলিয়াও পরিচিত। ঘাটটী প্রস্তর দ্বারা সোপান সংবদ্ধ। ঘাটের উপর রাজার অতিথীশালা আছে।

এই ঘাটের পর ধোবীঘাট। এখানে কাশীর রজকগণ বস্ত্র ধৌত করিয়া থাকে। ঘাটের সোপান নাই। এখানে কেহই স্নান-আহ্নিক করে না। ইহা রজককুলেরই যেন নিজ সম্পত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে।

ইহার পর অন্নপূর্ণা ঘাট। কেহ কেহ গঙ্গামহল বলিয়া ইহার উল্লেখ করেন। এ ঘাটেরও বিশেষ বর্ণনীয় কিছুই নাই।

উক্ত অন্নপূর্ণাঘাটের উত্তরে পাণ্ডে বা পাঁড়ে ঘাট। এই ঘাটের উপরেই একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। তাহার মূলদেশে বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ বিত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। নিকটেই গঙ্গার ধারে শিবের একটী সুন্দর লোহিত বর্ণে রঞ্জিত মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

চতুঃষষ্ঠী-যোগিনীঘাট।

সাধারণের নিকট ইহা 'চৌষট্টিযোগিনীর' ঘাট বলিয়া পরিচিত। ঘাটটী বহুদূর পর্য্যন্ত পাথর দিয়া বাঁধান। শুনিতে পাওয়া যায়, বঙ্গের শেষ স্বাধীন পরাক্রমশালী নরপতি বীরশ্রেষ্ঠ প্রসিদ্ধ মহারাজ প্রতাপাদিত্য এই ঘাট ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরমধ্যে চতুঃষষ্ঠী-যোগিনী-পরিবৃতা-মহিষমর্দ্দিনী শ্রীশ্রীদুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। শক্তি উপাসক বঙ্গীয় কায়স্থ-কুলরবি প্রতাপাদিত্য যথার্থই শক্তি আরাধনা করিয়াছিলেন, তিনি অন্তরে বাহিরে অকপটে শক্তি-সাধক ছিলেন। তাঁহার রাজধানী যশোহর নগরে তিনি নিজ অভীষ্টদেবী যশোরেশ্বরী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহকর্ত্তৃক প্রতাপ

পরাজিত ও বন্দিকৃত হইলে, মানসিংহ যশোরেশ্বরী কালী-প্রতিমাখানিকে তাঁহার নিজ রাজধানী অম্বরে লইয়া যান ও তথায় যথারীতি দেবীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। কাশীধামের এই চতুঃষষ্ঠী-যোগিনীসহ মহিষ-মর্দ্দিনীমূর্ত্তিটীও প্রতাপাদিত্যের সেই একনিষ্ঠ শক্তি-সাধনার অন্যতম পরিচয় স্থল। বঙ্গগৌরব প্রতাপের জীবনলীলার সঙ্গে সঙ্গে বা তাহার পূর্ব্বেই তাঁহার রাজ্য, রাজধানী, তাঁহার অভীষ্টদেবী ও তাঁহার শত শত কীর্ত্তিকলাপ সমস্তই যেমন কর্পূরের মত কোথায় মিলাইয়া যাইতে লাগিল, চতুঃষষ্টীর দেবোত্তর সম্পত্তিগুলিও যাহা দেবোদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাও পার্শ্ববর্ত্তী প্রবল প্রতিবেশীকর্ত্তৃক তেমনই সহজে অধিকৃত হইল। শুনিতে পাওয়া যায়, উদয়-পুরাধিপতি মহারাণা-বংশের ভূতপূর্ব্ব কোন নরপতির সময়ে পূর্ব্বোক্ত চতুঃষষ্টী-মন্দিরের উত্তরদিকস্থিত কতিপয় দেবত্তর সম্পত্তি, তাঁহাদের রাণামহলের অন্তর্গত হইয়া "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা" এই প্রসিদ্ধ নীতিবাক্যের সার্থকতা করিয়াছে। অধুনা চতুঃষষ্টীর একটীমাত্র যোগিনীও এই মন্দিরমধ্যে পরিলক্ষিত হয় না, দুই একটী রাণামহলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, অবশিষ্টগুলি যে কোথায় যাইল, তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। কেবল মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি যাহা

এখনও মন্দিরের শোভা-সম্পদ রক্ষা করিতেছে, তাহা সেই স্থাপনকাল হইতেই মহারাজ প্রতাপাদিত্য-নির্ব্বাচিত পাণ্ডাগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মন্দির-সংলগ্ন একখানি স্বতন্ত্র বাটীতে পাণ্ডারা বংশ-পরম্পরায় বসবাস করিয়া চতুষষ্ঠী-মন্দিরের উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে।

রাণামহলঘাট।

রাজপুতানাবাসী মহারাণার বংশধর উদয়পুরাধিপতি এই ঘাটটীর বর্ত্তমান অধিকারী। প্রায় ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে উদয়পুরের কোন মহারাজ কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই কারণ ইহা রাণামহলঘাট বলিয়া বিখ্যাত। ঘাটের প্রস্তর বিনির্ম্মিত সোপান-গুলির অধিকাংশ ধ্বংসোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে, কেবল মহল বা রাজ-অট্টালিকার দ্বার-সম্মুখস্থ সোপানটী অপেক্ষাকৃত অক্ষুন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। উদয়পুর রাজের প্রতিনিধি যিনি অধুনা এই সম্পত্তি দেখিবার জন্য এখানে নিযুক্ত আছেন, তিনি কাশীবাসী জন-সাধারণের স্বাক্ষর করাইয়া একখানি আবেদন-পত্র

সম্প্রতি রাজসরকারে প্রেরণ করিয়াছেন,—উদ্দেশ্য, মহারাজ কৃপা করিয়া সাধারণের উপকারার্থে তাঁহার পৈতৃক কীর্ত্তি "রাণামহলঘাটের" পূর্ণ সংস্কার করাইয়া দিবেন।

মুন্সীঘাট বা দ্বারভাঙ্গাঘাট।

বেরারনিবাসী মুন্সী শ্রীধরপ্রসাদ কর্ত্তৃক এই ঘাটটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। অধুনা ইহার দক্ষিণাংশ মহারাজ দ্বারভাঙ্গা কর্ত্তৃক অধিকৃত। ঘাটের সোপান ও তাহার সম্মুখস্থিত প্রাসাদপ্রতিম সুন্দর অট্টালিকাটী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা এখনও দেখিলে সকলেই অনুমান করিতে পারিবেন। শুনিতে পাওয়া যায়, ভূতপূর্ব্ব দ্বারভাঙ্গা-নরেশ মহারাজ লক্ষ্মীপ্রসাদ, নামমাত্র মূল্যে ইহা ক্রয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজ যথেষ্ট স্বধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, ঘাটের দিকে সামান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখিতে বিশেষ লক্ষ্য রাখেন নাই। কাশীবাসী বহু সাধু সন্ন্যাসী ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক নিত্য সন্ধ্যাকালে দশাশ্বমেধঘাট হইতে অহল্যাবাইঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত সোপানের উপর

পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহার পরেই অপরিচ্ছন্নতা হেতু মুন্সীঘাট বা দ্বারভাঙ্গাঘাটে বড় কেহ যাইতে অগ্রসর হন না। এই ঘাটের প্রতি মহারাজের সামান্য দৃষ্টি থাকিলে এটীও সাধারণের বিশেষ প্রীতিপ্রদ স্থানে পরিণত হইতে পারে।

অহল্যাবাইঘাট।

অনন্ত-কীর্ত্তিমতী প্রাতঃস্মরণীয়া ইন্দোরেশ্বরী অহল্যাবাই ১৭৬৪ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁহার রাজত্বসময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে পথ, ঘাট, কুণ্ড, মন্দির, ধর্ম্মশালা ও অন্নসত্র বা ছত্র প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য পুণ্যকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই অহল্যাবাইঘাট সেই সকলেরই অন্যতম। ঘাটটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি পাথর দিয়া সুন্দররূপে বিস্তৃত করিয়া বাঁধান। ঘাটের উপর বহু অট্টালিকা ও মন্দিরের মধ্যে অহল্যাবাইয়ের ধর্ম্মশালা ও নহবৎখানা প্রতিষ্ঠিত। নিত্য সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ সানাইওয়ালা যখন এই নহবৎখানার সম্মুখে বসিয়া গৌরী, শ্রী, পুরবী, পুরিয়া, ইমনকল্যান প্রভৃতি সান্ধ্য-রাগ-রাগিনীগুলির সুন্দর আলাপ করিতে থাকে, শত

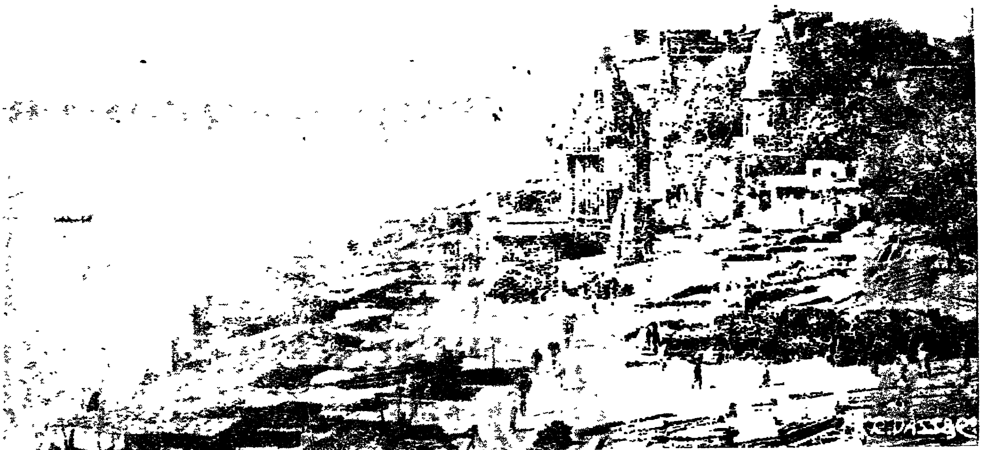
শত সম্ভ্রান্ত শ্রোতা ঘাটের উপর নানা স্থানে বসিয়া বা বিচরণ করিয়া তাহা প্রাণ ভরিয়া শুনিতে থাকেন, তখন মনে হয়, বুঝি বা কোন্ পুণ্যফলে সহসা আজি স্বর্গদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পার্শ্বে কল কল ভাষিনী পতিত-পাবনী গঙ্গা পুণ্যবতী অহল্যাবাইয়ের প্রস্তরগ্রথিত পূত-রম্য-ঘাট স্পর্শকরতঃ যেন সেই সৌভাগ্যবতী রমণীর কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিয়াছেন, উপরে সেই প্রাণ-মন-মুগ্ধকারী বিশুদ্ধ সুরলয়-যুত অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় সানাই-ধ্বনি সততই শ্রবণ-পথে অসীম আনন্দ ঢালিয়া দিতেছে, সন্ধ্যাসমাগমে শুক্ল-রজনীর আগমন-পরিজ্ঞাপক স্নিগ্ধ-করোজ্জ্বল শশধর পূর্ব্বগগনে বিরাজিত, তাহা আবার ভাগিরথীবক্ষে বীচিবিক্ষেপে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন প্রকৃতই অসংখ্য চন্দ্রমায় অপূর্ব্ব উল্লাসভরে নর্ত্তিত, আর গঙ্গার সেই পবিত্র তটে কত সাধুসজ্জন মহাত্মা তন্ময়ভাবে সন্ধ্যা-নিরত। আহা, সে স্বর্গীয় শোভা, সে পূত-আনন্দ দর্শককে নিত্য কত যে, অভিনব পুলকে পূর্ণ করিয়া তুলে, তাহা বস্তুতই অনির্ব্বচনীয়, তাহা উপভোগ ব্যতীত অনুমাত্রও উপলব্ধ হইবার নহে।

——:০:——

শীতলাঘাট।

উক্ত অহল্যাবাইঘাটের সংলগ্ন শীতলাঘাটও অন্য ঘাটগুলি অপেক্ষা অল্প উল্লেখযোগ্য নহে। এ ঘাটটীও পাথর দিয়া সুন্দর বাঁধান। উপরে শুভ্র-ধবলিত একটী মন্দির-গৃহমধ্যে শীতলেশ্বর মহাদেব ও শীতলাদেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন। এই স্থানে কি প্রাতে কি সায়াহ্নে অসংখ্য নর নারীর নিত্য সমাগম হইয়া থাকে, সকলেই ঘাটের ধারে স্নান, সন্ধ্যা, আহ্নিক অথবা এইরূপ কোন নিত্যকর্ম্মে নিরত। উপরে বৃদ্ধ ও প্রবীন অনুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণ মিলিত হইয়া নানা ধর্ম্মালোচনায় বিমল আনন্দ অনুভব করিতেছেন, আবার কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা সংসারের সকল মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া কাশীবাসী হইয়াও তাঁহাদের আজন্ম-পুষ্ট সংস্কারগুলি সম্বরণ করিতে পারেন নাই, ধর্ম্মা-লোচনার অভিনয়ে দ্বেষ, হিংসা, পরচর্চ্চা ও পরকুৎসা প্রচারকল্পে ইহাই যেন তাহাদের কেন্দ্রস্থলরূপে পরিণত হইয়াছে—সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ আলোক ও অন্ধকারের যেন কি এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ক্ষেত্র! অবিচলিত নেত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবলোকন ও পর্য্যালোচনা করিলে এ স্থলে সাধারণের দেখিবার ও শিখিবার সামগ্রী যথেষ্ট আছে।

Benares, *Dashasomedh Ghat*



দশাশ্বমেধঘাট।

কাশীর মধ্যে এই দশাশ্বমেধঘাটটীই যেন কাশীর কেন্দ্রস্থল। অসি-বরণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত বারাণসীর ভিতর এমন সুমনোহর ও জনাকীর্ণ স্থান আর কোথাও নাই। যে কেহ কাশীতে আসিবেন, একবার দশাশ্ব-মেধঘাট তাঁহার দর্শন করা চাইই। এই দশাশ্বমেধ ব্যতীত আর কোন ঘাটের জন্য প্রশস্ত রাজপথ না থাকায়, প্রতীচ্য-প্রদেশবাসী পর্য্যটকগণও নিত্য প্রাতে ও সায়াহ্নে গাড়ি করিয়া আসিয়া এই ঘাট হইতেই নৌকা-বিহারে গঙ্গার সমস্ত ঘাট-শোভা সন্দর্শন করিয়া থাকেন। রাজা, মহারাজা হইতে দীন দরিদ্র ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলকেই এই স্থানে কোন না কোন সময় আসিতেই হইবে। পূর্ব্বোক্ত শিতলাঘাট ও অহল্যাবাইঘাট প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলেও এই ঘাট অতিক্রম করিয়া সকলকে যাইতে হয়। ঘাটের উপর দশাশ্বমেধেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। দশহরেশ্বর মহাদেবও এই ঘাটের উপর অবস্থিত। কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়, এক সময় হরগৌরীর আদেশে ব্রহ্মা কাশীতে প্রকট রূপ ধারণ করিয়া তদানিন্তন কাশীর অধীশ্বর মহাপুণ্যবান দিবোদাসের সহায়তায় এই স্থানে যথাক্রমে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের

অনুষ্ঠান করেন। সেই কারণ ইহা দশাশ্বমেধতীর্থ বলিয়া খ্যাত। ঘাটের উপর দশাশ্বমেধ-কুণ্ড নামে একটী ক্ষুদ্র কূপের অস্তিত্ব আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাকালে এই স্থান "রুদ্রসরোবর" বলিয়া বিখ্যাত ছিল, পরে ব্রহ্মার যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় হইতে দশাশ্বমেধ বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, এই স্থানে স্নান করিলে জীব সর্ব্ব পাপ ও সর্ব্ব রোগ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে এবং স্নানান্তে দশাশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। এই তীর্থে তিনটী মাত্রও আহুতি প্রদান করিলে অগ্নিহোত্র-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মেশ্বর নামে এখানে আর একটী শিবলিঙ্গ আছেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এত শিবলিঙ্গ ও মন্দির আছে যে, সহজে তাহার সংখ্যা করা এক প্রকার অসম্ভব।

দশাশ্বমেধঘাট স্থিরবিশ্বাসী-ধর্ম্মাত্মার যেমন আদরের পুণ্যময় তীর্থ, তেমনি সাধারণ গৃহস্থেরও নিত্য সংসার-পরিচালনার সহায়ক প্রধান স্থান। অর্থাৎ এই ঘাটের উপরেই কাশীর সর্ব্বপ্রধান বাজার ও বিপণিশ্রেণী। কাশীবাসী সকলকেই প্রতিদিন এই স্থান হইতে সমস্ত আহার্য্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হয়। কাশীর মধ্যে দশাশ্বমেধের মত সকল জিনিস পাইবার উপযোগী বাজার আর

নাই। ডাক্তার, বৈদ্য, কবিরাজ, চিকিৎসালয় ও ঔষধালয় প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে এই স্থানটীতে যেমন সুবিধা, বিশেষ কাশীবাসী বাঙ্গালীদের পক্ষে তেমনটী আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দশাশ্বমেধের নিকট হইতেই বাঙ্গালীটোলা আরম্ভ হইয়াছে। সহসা এই স্থল দেখিলে মনে হয়, বুঝি বা বাঙ্গলা দেশেরই কোন প্রধান সহরে আমরা বিচরণ করিতেছি। কাশীর যত পালা-পার্ব্বণ সবই দশাশ্বমেধঘাটে বসিলে দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়া-দশমী উপলক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জনাদিও এই ঘাটে হইয়া থাকে। ঘাটটী পূর্ব্বে যথেষ্ট বিস্তৃত ছিল বলিয়া সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কারণ দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান নিতান্ত অল্প স্থানের মধ্যে সম্ভবপর নহে। সেই অতীত যুগে যখন এই যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই এ স্থান এরূপ দুর্ম্মূল্য ছিল না, এবং পরবর্ত্তী সময়ে নির্ম্মিত ঘাটগুলির কল্পনাও তখন হয় নাই, সুতরাং এখন এ স্থল যেমন বহু মন্দির ও অট্টালিকাদিতে ঘনাবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, সে কালে এরূপ ছিল না, চতুর্দ্দিকেই যজ্ঞানুকুল বিস্তৃত ক্ষেত্র পতিত ছিল। ইংরাজ আধিপত্যের অব্যবহিত পূর্ব্বেও কাশীর ঘাটসমূহের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা কোন কোন প্রাচীন চিত্র হইতে সহজেই

অনুমান করিতে পারা যায়। যাহাহউক এক্ষণে প্রয়াগঘাট ও দশাশ্বমেধঘাট বলিয়া বেনারসসিটি-মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক তুইটী স্বতন্ত্র ঘাটের পরিচয়-ফলক (Sign-board) দেখিয়া অনেকেই নানা কল্পনা ও তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকেন। কিন্তু এ বিষয়ে এরূপ সন্দিহান হইবার কোন কারণ নাই। 'প্রয়াগঘাট' বলিয়া যাহা এক্ষণে পরিচিত হইতেছে, তাহাও যেমন দশাশ্বমেধের একাঙ্গ এবং অধুনা দশাশ্বমেধ (পূর্ব্বে যাহাকে ঘোড়া ঘাট বলিত) তাহাও যে, সেইরূপ দশাশ্বমেধের অন্য অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। ঘোড়াঘাট বা নবনির্ম্মিত দশাশ্বমেধঘাট বহুদিন হইতে ধ্বংস হওয়ায় সাধারণের স্নানাদির পক্ষে অব্যবহার্য্য বোধে পরি-ত্যক্ত হওয়ায়, গো মহিষ ও অশ্বাদির জলপান ও তাহাদের স্নানকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল, সেই কারণ উহা ক্রমে ঘোড়াঘাট নামে পরিচিত হইতে থাকে। পক্ষান্তরে পাণ্ডাগণ যাত্রী-সাধারণকে ক্রমে উহার দক্ষিণাংশে লইয়া গিয়া দশাশ্বমেধের সংকল্প পড়াইতে থাকে, ফলে অধুনা প্রয়াগঘাটনামে পরিচিত দশাশ্বমেধাংশকেই প্রকৃত সমগ্র দশাশ্বমেধ বলিয়া সকলে জানিয়া রাখিয়াছে। প্রয়াগঘাট বলিয়া পূর্ব্বে কোন ঘাট ছিল না, তবে শাস্ত্রে আছে—দশাশ্ব-

মেধের এই অংশে স্নান করিলে প্রয়াগসঙ্গমে স্নানের ফল লাভ হয়, বহু যাত্রী এই স্থানে আসিয়া শিরো-মুণ্ডন ও পিতৃপিণ্ডাদি প্রদান করিয়া থাকে, সেই কারণ ক্রমে ইহা প্রয়াগঘাট বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই উভয় ঘাটই পূর্ব্বে একত্র দশাশ্বমেধঘাট বলিয়া পরিচিত ছিল। নবনির্ম্মিত দশাশ্বমেধ বা পূর্ব্বপরিচিত ঘোড়াঘাটের উত্তরাংশ এখনও অসংস্কৃত অবস্থায় পতিত আছে। এই স্থান এখনও গো অশ্ব ও মহিষাদির স্নানপানজন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার উত্তরে কিয়দংশে পাথরের ব্যবসাদারগণ পাথর নামাইয়া থাকে, সেই কারণ কেহ কেহ ইহাকে পাথরঘাট বলিয়া পরিচিত করে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এই দশাশ্বমেধের সম্মুখস্থিত পথ দিয়া বাঙ্গালীটোলার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রবেশপথে বামদিকে একটী "কালীর মন্দির" এবং সম্মুখে 'কামরূপমঠ'। এই মঠের মঠাচার্য্য বাঙ্গালী, দণ্ডী ধর্ম্মেই ইহাঁরা দিক্ষীত। মঠটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। কয়েকজন দণ্ডীসন্ন্যাসী এই স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। বিখ্যাত ব্রহ্মচারী শ্রীমৎ কেশবানন্দ স্বামীজী এই মঠেরই একজন প্রধান শিষ্য।

এই পথ ধরিয়া বাঙ্গালীটোলার মধ্যে প্রবেশ করিলে 'ভূতেশ্বর' 'পুষ্পদন্তেশ্বর' 'পাতালেশ্বর' প্রভৃতি বিখ্যাত দেবমন্দির সকল দেখিতে পাওয়া যায়।

জঙ্গমবাড়ী।

দশাশ্বমেধঘাট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অসি যাইবার পথে বিখ্যাত জঙ্গমবাবার আশ্রম বা মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। জঙ্গমবাবা দাক্ষিণাত্য নিবাসী শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত মহান্ত। তাঁহার বহু সহস্র শিষ্য-সেবক আছে, তন্মধ্যে সন্ন্যাসী-শিষ্য-পরম্পরায় মহান্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়া এ যাবৎ এই মঠ রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান মহান্তজী সন্ন্যাসী হইলেও অধুনা বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি। কাশীর মধ্যে বিশেষ জঙ্গমবাড়ী-মহল্লায় অধিকাংশ স্থাবর-সম্পত্তি তাঁহারই অধিকৃত। শুনা যায়, এতদ্ব্যতীত তাঁহার এক প্রকার তেজারতি (Banking Business) ব্যবসায়ও আছে। বহু নর নারী শেষ বয়সে যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া কাশীবাসের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়া জঙ্গমবাড়ীর মহান্তজীর নিকট তাহা জমা দিয়া থাকে। মহান্তজী তাহারই কুশীদস্বরূপ মাসিক কিছু কিছু সাহায্য করিয়া সেই সকল ব্যক্তির শেষ কাশীবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দেন।

জঙ্গমবাড়ী বা জঙ্গম-মঠটী বহুবিস্তৃত। বহু শিবলিঙ্গ ও শিবালয় ইহার অন্তর্গত। বোধ হয় দুই সহস্রেরও অধিক শিবলিঙ্গ এই মঠের প্রাঙ্গণে ও তাহার

চতুর্দ্দিকে রক্ষিত আছে, তদ্ব্যতীত এই মঠের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহান্তগণের অনেকগুলি সমাধিও আছে। এ সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ রজতাবরণস্থিত শিবলিঙ্গ সূত্রে গ্রথিত করিয়া যজ্ঞসূত্রের ন্যায় স্কন্ধে ধারণ করিয়া থাকে। বহু সন্ন্যাসী-শিষ্য সতত মঠের মধ্যেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বাসের যেমন উপযুক্ত বন্দোবস্ত আছে, সেইরূপ বহু যাত্রী থাকিবারও সুন্দর ব্যবস্থা আছে। তবে এস্থানে মাদ্রাজী যাত্রীরই অধিক সমাবেশ ও প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক জঙ্গমবাড়ী যে সাধারণের একটী দেখিবার জিনিস সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

মাণমন্দিরঘাট।

পূর্ব্বোক্ত ঘাটের অব্যবহিত উত্তরদিকে মাণমন্দিরঘাট। ঘাটের উপরেই 'মাণমন্দির' নামক প্রসিদ্ধ অট্টালিকা সুশোভিত। অনেকের দৃঢ় ধারণা অম্বরাধিপতি মানসিংহ কর্ত্তৃক এই মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমাত্র। সাধারণের এরূপ ভ্রম হইবার দুইটী কারণ আছে। প্রথমতঃ এই সৌধটী সাধারণভাবে 'মাণমন্দির' বলিয়া পরিচিত,

দ্বিতীয়তঃ জয়পুর বা প্রাচীন অম্বররাজ্যের অধিপতিগণ বংশপরম্পরায় এই প্রসিদ্ধ সৌধটীরও উত্তরাধিকারী। মানসিংহ এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ নরপতি, মহাবীর ও কীর্ত্তিমান পুরুষ, সুতরাং 'মাণমন্দিরে' তাঁহার নামের সৌসাদৃশ্য থাকায়, সাধারণে ইহাও মানকীর্ত্তি বলিয়া সহজেই ধরিয়া লইয়াছে। পাঠকগণের অবগতির জন্য ইহার ঐতিহাসিক বিবরণ অতি সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

অম্বরপতি মানসিংহের মৃত্যু হইলে, তাঁহার অযোগ্য পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে রাজ্য লাভ করিয়া উভয়েই ঘোর পানাশক্তি ও লাম্পট্য দোষজনিত রাজ্য পরিচালনায় অসমর্থ হইয়া অকালে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর দিল্লীসম্রাট জাহাঙ্গীর নিজ রাজপুতনী ভার্য্যা যোধাবাইয়ের প্ররোচনায় স্বর্গীয় মহারাজ মানসিংহের সহোদর জগৎসিংহের পৌত্র জয়সিংহকে অম্বরের সিংহাসনে অভিষেক করেন। জয়সিংহই মহারাজ মানসিংহের উপযুক্ত বংশধর। তিনি অনতিকালমধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া দিল্লী-শ্বরেরও ভীতির উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এক দৈব-দুর্ঘটনায় তাহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামসিংহ পরে বিষণসিংহ অম্বর রাজ্যে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে

তাঁহাদেরও মৃত্যু হইলে ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দ্বিতীয় জয়সিংহ অম্বরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। ইনি শোবে জয়সিংহ বলিয়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও পরাক্রমে একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ নরপতি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাজনীতি, সমরনীতি, ধর্ম্ম, ইতিহাস, জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রভৃতি সকল বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইনিই নিজ নামে জয়পুর রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রাচীন অম্বররাজ্য জয়পুররাজ্যে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

শোবে জয়সিংহ 'বিদ্যাধর' নামক জনৈক বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ উপদেষ্টা বা মন্ত্রীর সাহায্যেই বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্যোতিষাদি বিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তদানিন্তন দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁহার অসাধারণ জ্যোতির্বিদ্যার পরিচয় পাইয়া সাম্রাজ্যমধ্যে পঞ্জিকাসংশোধনজন্য মহারাজের উপরই তাহার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেন। সেই কারণেই তিনি দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা ও বারাণসীতে মাণমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বকৃত আর্য্য-যন্ত্রাদি তাহাতে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে বলা বাহুল্য 'মাণ' অর্থে গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতির পরিমাণমাত্র, অম্বরপতি 'মান' সিংহ নহে! যাহাহউক মহারাজ জয় সিংহের অসাধারণ জ্যোতিষ জ্ঞান সম্বন্ধে পরে ডাঃ হণ্টার, মহাত্মা টড ও অন্যান্য

বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত অসংখ্য প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবদ্দশামধ্যেই তাঁহার সেই প্রতিভা সুদূর প্রতীচ্য প্রদেশেও প্রচারিত হইয়াছিল! পর্ত্তুগাল রাজ্যে সে সময় জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পর্ত্তুগালের অধীশ্বর জয়পুরাধিপতি জয় সিংহের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাহার সভায় সেভিয়ার-ডি-সিলভা নামক একজন পণ্ডিত প্রেরণ করেন, তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য জোতির্ব্বিদ্ ডি-লা হায়ারের জ্যোতিরঙ্ক মহারাণাকে অর্পণ করেন। তিনি তাহা পরীক্ষা করিয়া ডি-লা-হায়ারের বহু ভ্রম প্রদর্শন করেন। এই সময় তুর্কি জ্যোতির্ব্বিদ্ উলুকবেগের উদ্ভাবিত যন্ত্রেরও ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহারাজ নিজ প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র সাহায্যে ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে রাশিচক্রের অক্ষচ্যুতি সম্বন্ধে যাহা গণনা করিয়াছিলেন, মহা-জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত থোদিন তাহার পর-বৎসরে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মহারাজ আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাহায্যে "জয়-প্রকাশ", "রাম-যন্ত্র" ও "সম্রাট-যন্ত্র" নামে তিনটী সুবৃহৎ যন্ত্রের উদ্ধার করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাণমন্দির-গুলির মধ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শেষোক্ত এই দ্বাদশ হস্ত পরিমাণ ব্যাস বিশিষ্ট যন্ত্রটী এতই উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে, হিপার্কাস, টলেমি

প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতও এই যন্ত্রবলেই ভ্রমজনক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রমলব্ধ বড় আদরের মাণমন্দিরগুলিও শ্রীভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রায় হইয়া গিয়াছে। প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে মদীয় সুহৃদ্ স্বনামধন্য অধ্যাপক বাবু মাতাপ্রসাদ এম, এ, কাশীর এই মাণমন্দিরের সংস্কার কল্পে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন, আমরাও তখন তাঁহার সেই উদ্যম ও যত্নে সাধ্যমত সহায়তা করিয়াছিলাম; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় বন্ধুপ্রবর তাঁহার সকল সাধ সকল সদেচ্ছা তাঁহার অনিত্য দেহখানিসহ পরিত্যাগ করিয়া অকালে লোকান্তরে গমন করিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার উপদেষ্টা ও প্রধান সহায়ক জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয়ও ইহ-সংসার ত্যাগ করিয়া যাইলেন। সে সময় দুই লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিলে ইহার সম্পুর্ণ সংস্কার হইতে পারিবে, এইরূপ স্থির হইয়াছিল, সাধারণের নিকট সে বিষয়ে সহায়তা প্রার্থনা করিলে সহজেই তাহা কার্য্যে পরিণত হইতেও পারিত, কিন্তু জয়পুরাধিপতি তাহাতে নাকি বলিয়াছিলেন, উহা আমার পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি, আমি স্বয়ংই উহার সংস্কার করিয়া দিব, কিন্তু অদ্যাবধি তাহার

কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। শুনিতেছি, পুনরায় শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের উদ্যোগে মহারাজ শীঘ্রই উহার সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। যাহাহউক আমরা মাণমন্দিরের পুনরায় উন্নতি দেখিয়া সুখী হইতে অভিলাষ করি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাণমন্দিরস্থিত যন্ত্রাদির সে শ্রী সে সৌন্দর্য্য আর নাই, তবে যাহা আছে, তাহাই সযত্নে রক্ষিত হইতেছে মাত্র। কোন বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিত বা অধ্যাপক নাই, সুতরাং জ্যোতিষ-শিক্ষার্থী সেরূপ মেধাবী ছাত্রও নাই, যাহারা যন্ত্রাদির নিত্য ব্যবহার দ্বারা তাহার পরিচর্য্যা করিবে; তবে জয়পুর রাজ্যের অন্নপুষ্ট কতিপয় ব্যক্তি যেন হস্তপদাদি-বিহীন জগন্নাথসদৃশ সেই সকল যন্ত্রের নিত্যদর্শন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। আর মধ্যে মধ্যে সম্ভ্রান্ত দর্শক আসিলে তাঁহাদিগকে যা' তা' কোনরূপে যন্ত্রগুলির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়া দুই পয়সা উপার্জ্জনের সুবিধা করিয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত তিনটী প্রধান যন্ত্র ব্যতীত ভিত্তিযন্ত্র, চক্রযন্ত্র প্রভৃতি আরও কতকগুলি যন্ত্রের জীর্ণাংশ এখনও বিদ্যমান আছে। সে গুলিও মহারাজ জয়সিংহের আবিষ্কৃত। এই সকল যন্ত্র অধিকাংশই ছাদের উপর অবস্থিত। অট্টালিকার ছাদ যথেষ্ট উচ্চ হইলেও পূর্ব্বদিকের আকাশ ব্যতীত অন্যান্য

দিকের আকাশাংশ দিগ্ বলয় পর্য্যন্ত সুন্দররূপে দেখিবার উপায় নাই, পার্শ্বস্থিত নব-নির্ম্মিত অন্যান্য গৃহাদির দ্বারা তাহা কতক কতক আবৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন ইহার প্রকৃত সংস্কার করিতে হইলে, কোন কোন যন্ত্র আরও উচ্চ-নির্ম্মিত ছাদের উপর রক্ষা করা আবশ্যক হইবে।

মাণমন্দিরের যন্ত্রাদি ব্যতীত উহার স্থাপত্য-সৌন্দর্য্য ও অতীব মনোরম, ইহার গৃহ, প্রাঙ্গণ, স্তম্ভ ও গবাক্ষাদি সমস্তই দেখিবার জিনিস। বিশেষ গঙ্গার তীর হইতে ইহার দৃশ্য বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ। এরূপ না হইবেই বা কেন? যাঁহারা স্বচক্ষে জয়পুর দেখিয়াছেন, তাঁহারা সেই জয়পুর-প্রতিষ্ঠাতা সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ্ জয়সিংহের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া নিশ্চয়ই যে বিমোহিত হইয়া থাকিবেন, সে বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। আরও আনন্দের বিষয় মহারাজের এই সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের মূলাধার আমাদেরই সেই বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ 'বিদ্যাধর', তাঁহারই উদ্ভাবনা ও মন্ত্রণাবলে ভারতের মধ্যে জয়পুর রাজ্য এত সুন্দর, এত নয়ন মনতৃপ্তিকর। বহু শিক্ষিত পাশ্চাত্য পর্য্যটকও একবাক্যে জয়পুরের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। বাস্তবিক জয়সিংহের কীর্ত্তিকলাপ যাহা কিছু আছে সমস্তই যেন অদ্ভুত!

মাণমন্দিরের নিকটস্থ দশাশ্বমেধের প্রধান পথটীর উভয়পার্শ্বস্থিত গৃহাদিও তাঁহারই পরিকল্পনা-সম্ভূত বিচিত্র সমতা-বিশিষ্ট, অর্থাৎ এই পথের উভয় দিকের গৃহগুলি এমনভাবে নির্ম্মিত যে, উভয় দিকেই সেই এক ধরণের খিলান ও একই ধরণের স্তম্ভযুক্ত গৃহগুলি দেখিলে বস্তুতঃই চমৎকৃত হইতে হয়। কিন্তু ক্রমেই বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা তাহা আবশ্যক বোধে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

মাণমন্দিরঘাটের নিকট 'দালভ্যেশ্বর' ও 'সোমেশ্বর' লিঙ্গের মন্দির আছে। সাধারণের বিশ্বাস দালভ্যেশ্বরের অনুগ্রহ হইলে ধরায় সুবৃষ্টি বর্ষিত হয় এবং সোমেশ্বরের কৃপায় জীবের সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সেই কারণ নিত্য বহু ব্যক্তিকে স্ব স্ব রোগমুক্তির আশায় সোমেশ্বর-সমীপে উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

—:০:—

ত্রিপুরভৈরবীঘাট ও মীরঘাট।

মাণমন্দিরের পরেই ত্রিপুরভৈরবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরমধ্যে প্রস্তর-খোদিত দেবীর প্রকাণ্ড আননমূর্ত্তি বিরাজিতা আছেন। মন্দিরস্থিতা এই ত্রিপুরদেবীর নামানুসারেই ঘাটটী ত্রিপুরভৈরবীঘাট

বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। ঘাটের উপর আরও অনেক নূতন ও পুরাতন দেবমন্দির ও অট্টালিকাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পরেই মীরঘাট। এই ঘাটটী তেমন প্রশস্ত না হইলেও ইহার প্রসিদ্ধি আছে। ঘাটের সোপান-গুলি যেমন দৃঢ়ভাবে গ্রথিত, তেমনই ঘাটে নামিবার ও উঠিবার পক্ষে উহা বেশ সুবিধাজনক। ঘাটের উপর বহু সুদৃশ্য দেবালয় ও অট্টালিকা আছে। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমনোহর যুগলমূর্ত্তির মন্দির ও নানক-পন্থী শিখদিগের আশ্রম-মঠটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই ঘাটের সম্মুখস্থ গঙ্গাংশকে কাশীখণ্ডে "বিশাল-গঙ্গা" বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

—:০:—

বিশালাক্ষী ও দিবোদাসেশ্বর।

এই মীরঘাটে যাইবার পথে ধর্ম্মকূপের সম্মুখে কাশীর শক্তি-পীঠ বিশালাক্ষীর মন্দির। অনেকের ধারণা, কাশীতে শক্তিপীঠ—অন্নপূর্ণা, আর বিশ্বনাথ—দেবতা; কিন্তু তাহা ঠিক নহে। বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা এখানকার নিত্য দেবতা। প্রসিদ্ধ ৫১ পীঠের বর্ণনামধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বারাণসীতে এই বিশালাক্ষীই পীঠ-দেবী, এখানে সতীর চক্ষু পতিত হইয়াছিল, কালভৈরব ইহাঁর দেবতা এবং কাশী-মণিকর্ণিকা তীর্থ।

কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়, দেবী বিশালাক্ষী বারাণসীতে পূর্ব্বোক্ত বিশালগঙ্গা বা গঙ্গার বিশাল তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়া এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা তৃতীয়ায় এখানে মেলা হয়। এই দিবস দেবীর সম্মুখে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণানন্তর পরদিন যথারীতি দশটী কুমারী ভোজন করাইয়া পারণ করিলে কাশীবাসের সম্পূর্ণ ফল লাভ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় বহু কাশীবাসীও বিশালাক্ষী দর্শন করেন নাই। কাশীতে আসিয়া কালভৈরব ও বিশালাক্ষী দর্শন এবং মনিকর্ণিকা-স্নান অতি অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিশালাক্ষী মন্দিরের নিকট মীরঘাটের উপরেই প্রসিদ্ধ দিবোদাসেশ্বরের মন্দির। কাশীনরেশ দিবোদাস স্বয়ং এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কালক্রমে সে মন্দির লুপ্ত হইলে পুনরায় তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে দিবোদাসেশ্বর শিবলিঙ্গ ব্যতীত বিংশবাহুক নামে আর একটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই স্থানেরই "ভূপালশ্রী" তীর্থের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

প্রাচীন বিশাল-গঙ্গা তীর্থ অথবা ভূপালশ্রী তীর্থ অধুনা মীরঘাটে পরিচিত হইলেও, অলর্ক-চতুর্দ্দশীতে এখানে আজিও মেলা হইয়া থাকে।

ললিতাঘাট ও রাজসিদ্ধেশ্বরীঘাট।

ইহার পর ললিতা বা লহরিঘাট। এই ঘাটের নিকট লাহোর বা পাঞ্জাব হইতে আগত বহু ক্ষেত্রীর বাস, সেই কারণ এই মহল্লাকে লাহোরী বা লহরিটোলা বলে, এবং এই ঘাটকেও অনেকে লহরিঘাট বলে। পরন্তু ইহা ললিতা দেবীর নামানুসারেই ললিতাঘাট বলিয়া বিখ্যাত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে কামনা করিয়া, দেবীর পূজা করিলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়।

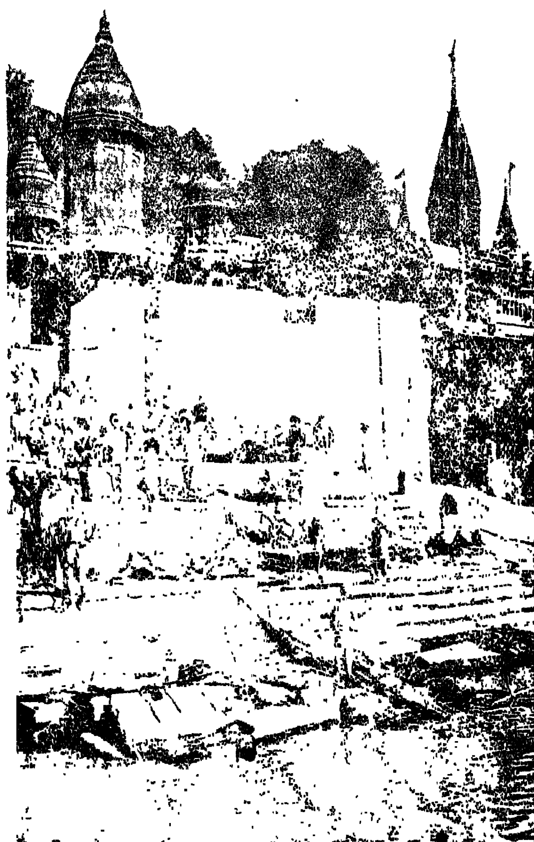
ললিতাঘাটে একটী নেপালী-মন্দির আছে তাহা দেখিবার জিনিস। কাশীতে এ ধরণের মন্দির দ্বিতীয় নাই, ইহা নেপাল দেশীয় মন্দিরের সম্পূর্ণ অনুকরণে নির্ম্মিত। মন্দিরটীর অধিকাংশ স্থল বহু কারুকার্য্য বিশিষ্ট কাষ্ঠ ও ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত, উপরে বিবিধ প্রকার 'খোলা' দ্বারা বিচিত্র ভাবে আচ্ছাদিত। চূড়ায় কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা আবদ্ধ আছে, বায়ু-হিল্লোলে তাহা মধুর বাজিতে থাকে। মন্দিরমধ্যে দেবীমূর্ত্তি অবস্থিতা। শুনা যায় নেপালের কোন রাণী ইহা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ললিতাঘাটের সংলগ্ন রাজসিদ্ধেশ্বরীঘাট। এ ঘাটটীতে এক সময় কোন সিদ্ধ-বাবা আসন স্থাপন

করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে দুই একজন আজিও অবস্থিতি করিয়া থাকেন। এই ঘাটের উপর একটী বৃহৎ ফটক আছে—তাহার মধ্যদিয়া বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবার একটী সোজা গলি পথ আছে, তাহা সরস্বতী-ফটক হইয়া গিয়াছে।

জলশায়ীঘাট ও রাজবল্লভ-মসান।

জলশায়ী বিষ্ণুমন্দিরের নামেই এই ঘাটের নামকরণ হইয়াছে। ঘাটের পার্শ্বেই এই মন্দিরটী এমন ভাবে গঠিত যে, দেখিলেই মনে হয়—মন্দিরটী গঙ্গাবক্ষে যেন ভাসিতেছে। এই ঘাটের সংলগ্ন ওমরাওগীর ঘাট প্রভৃতি আরও কয়েকটী ঘাট আছে, তন্মধ্যে রাজবল্লভ মসান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বোক্ত হরিশ্চন্দ্র-শ্মশান-ঘাটের ন্যায় এটীও বারাণসীর প্রসিদ্ধ শ্মশান। বরং আজকাল এইটীরই প্রাধান্য অধিক। ঘাটটী ক্রমে ধ্বংসোন্মুখ হইয়া গিয়াছে। অধুনা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, মণিকর্ণিকা-মহাশ্মশান, আমরাও বাধ্য হইয়া সাধারণের ভাষায় তাহাই বলিয়াছি, কিন্তু মণিকর্ণিকা ঠিক শ্মশানঘাট নহে। মণিকর্ণিকা মহা-মুক্তিপ্রদ প্রসিদ্ধ তীর্থ, তাহার পার্শ্বেই এই রাজবল্লভ শ্মশানঘাটটী অবস্থিত



জলশায়ীঘাট ও রাজবল্লভ শ্মশান। (২০৮ পৃষ্ঠা)

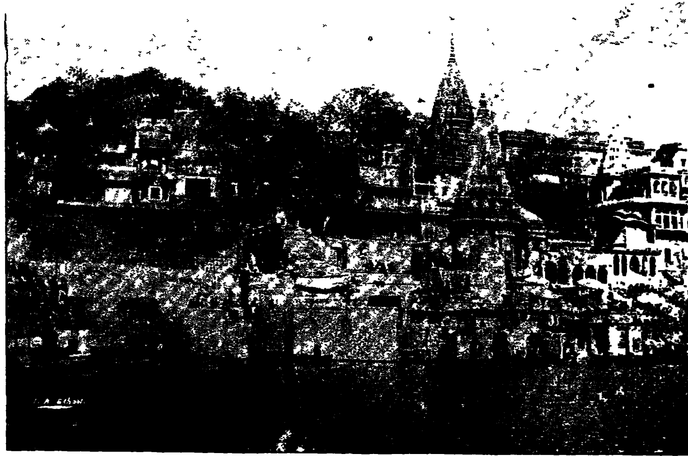
বলিয়া লোকে ক্রমে রাজবল্লভ নাম ছাড়িয়া দিয়া মণিকর্ণিকার সহিত এই শ্মশানটী সংলগ্ন করিয়া লইয়াছে। বস্তুতঃ এটিতে রাজবল্লভ-শ্মশানঘাট বলাই যুক্তিসঙ্গত। যাহা হউক ক্রমে ক্রমে ঘাটটীর সংস্কার আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া আমরা আনন্দিত।

মণিকর্ণিকাঘাট।

তীর্থশ্রেষ্ঠ পূত-মণিকর্ণিকা যে কত প্রাচীন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ, সেই অনাদি বৈদিক যুগ হইতেই ইহার মাহাত্ম্য শ্রুত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব-কথিত শ্মশান-সংলগ্ন এই ঘাট ও কুণ্ডটীই মণিকর্ণিকা মহাতীর্থ বলিয়া জগতে পরিচিত। এমন তীর্থ আর বুঝি দ্বিতীয় নাই—হিন্দুমাত্রেই জীবনে একবার বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন ও একটীবারমাত্র মণিকর্ণিকায় ডুব দিতে পারিলেই যেন পরম কৃতার্থতা লাভ করে। বিশ্ববিশ্রুত এমন পবিত্র ভূমির তুলনা বস্তুতঃই আর আছে বলিয়া মনে হয় না। সম্মুখে ধীর-প্রবাহিনী পতিত-পাবনী সুশীতল গঙ্গা, পার্শ্বে জীবের সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ উদার ও উন্মুক্ত মহাশ্মশান, তথা হইতে অবিরত প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নির ধূমরাশি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া যেন প্রত্যেক যাত্রীকেই অঙ্গুলিসঙ্কেত

সহযোগে সংসারের স্থির-অনিত্যতা ব্যক্ত করিয়া বুঝাইয়া দিতেছে। আবার অনতিদূরে ভগবান বিষ্ণুর মহাতপস্যার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিস্তৃত মর্ম্মরপ্রস্তরের উপর খোদিত তাঁহার "চরণ-পাদুকা" ও সুপবিত্র মণিকর্ণিকাকুণ্ড বিরাজিত রহিয়াছে। কাশীখণ্ড ও বিবিধ পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়,—এই স্থানে বিষ্ণু মহাদেবের জন্য কঠোর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া মহাদেব বিস্ময়ে মস্তক আন্দোলিত করিলে তাঁহার কর্ণ হইতে বিবিধ মণিরত্নখচিত 'মণিকর্ণিকা' নামক কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হয়, সেই কারণ ইহা মণিকর্ণিকা বলিয়া উক্ত হইয়া আসিতেছে। ভগবান বিষ্ণু পূর্ব্বেই নিজ সুদর্শনচক্র দ্বারা এই কুণ্ড খনন করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে তাহাতে মণিকর্ণিকা পতিত হওয়ায় ইহা চক্রতীর্থ বা চক্র-পুষ্করিণী—মণিকর্ণিকা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

শিব পুরাণের মতে বিষ্ণুর মণিকুণ্ডল শিবের সম্মুখে পতিত হওয়ায় মণিকর্ণিকা নাম হইয়াছে। আবার কাশীখণ্ডের অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, আশুতোষ বিশ্বনাথ কাশীবাসী ভক্ত সাধুদিগের কর্ণে এই স্থানেই তারকব্রহ্ম নাম উপদেশ দিয়া থাকেন, সেই কারণ ইহার নাম মণিকর্ণিকা। অথবা এই



মণিকর্ণিকাঘাট। (২০৯ পৃষ্ঠা)

পুণ্যভূমি মুক্তিদেবীর মহাপীঠের মণিস্বরূপ এবং চরণ-কমলের কর্ণিকাস্বরূপ সেইহেতু সকলে ইহাকে মণিকর্ণিকা বলিয়া অভিহিত করে।

কাশীমাহাত্ম্য পাঠে জানিতে পারা যায়, এই মোক্ষভূমি মণিকর্ণিকায় সকলেই অনায়াসে মুক্তি লাভকরিতে পারে। সৌরপুরাণকার বলেন—"বিশ্বে-শ্বরের প্রিয়তম মণিকর্ণিকাতীর্থের তুলনা নাই।" তাই নানা দিক দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী মণিকর্ণিকার পবিত্র বারি স্পর্শ করিবার জন্য ছুটিয়া আইসে।

পশ্চাতে বিবিধ বর্ণের অসংখ্য গগনস্পর্শী মন্দির ও অট্টালিকা সুশোভিত, কত দেশের কত নর নারী অপূর্ব্ব বসন ভূষণ পরিহিত হইয়া সেই বিস্তৃত সোপান পথ অতিক্রম করিয়া পতিতোদ্ধারিণী ভাগিরথীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া তাহাদের জন্ম-জন্মার্জ্জিত পাপ কালিমারাশি বিধৌত করিতেছে। তাহাদের সে পুলকপূর্ণ মুখের ভাব দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহারা যেন পবিত্র হইয়াছে, তাহাদের মানব জন্ম ধারণ করা আজ যেন সার্থক হইয়াছে।

এই ঘাটেই মণিকর্ণিকেশ্বরের মন্দির অনতিদূরে তারকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মণিকর্ণিকাকুণ্ডে

স্নান বা উহার জল স্পর্শ করিলে অর্থললুপ পাণ্ডাগণ যাত্রীগণের প্রতি বিষম অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহাদের সে অত্যাচার দেখিয়া অনেক নিরীহ শিক্ষিত ব্যক্তিই সে দিকে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করেন না। এ বিষয়ে কাশীবাসী জনসাধারণের সামান্য দৃষ্টি থাকিলে যাত্রীগণের বিশেষ উপকার হয়। সরকার পক্ষ হইতে যাত্রীপীড়ক পাণ্ডা ও যাত্রাওয়ালাদিগের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও এখনও সমূহ অত্যাচার নিবারিত হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে অসিঘাট বর্ণনকালে বলা হইয়াছে, কাশীর প্রধান পঞ্চতীর্থমধ্যে মণিকর্ণিকা অন্যতম। এই তীর্থ হইতেই সাধারণতঃ কাশীর সকল যাত্রা আরম্ভ ও সমাপ্ত হইয়া থাকে।

দত্তাত্রেয় ও সিন্ধিয়াঘাট।

মণিকর্ণিকার প্রায় উপরেই দত্তাত্রেয়ের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দিরমধ্যে ভগবান দত্তাত্রেয়ের পাদুকা রক্ষিত আছে। সেই দত্তাত্রেয়-মন্দিরের নামানুসারে মণিকর্ণিকার পার্শ্বে কিয়দংশ দত্তাত্রেয়ঘাট বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

ইহার পরেই সিন্ধিয়াঘাটের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ঘাটটী বহু অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইতেছিল, কিন্তু কি জানি কি দৈব কারণে ইহার প্রস্তুত কার্য্য আর অগ্রসর হইতে পারে নাই, যে যে অংশ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ধ্বসিয়া তীর্য্যক্‌ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। অনেকে বলেন, গঙ্গার কোনও অন্তরস্রোতা উপনদী এই স্থানে আসিয়া মিশিয়াছে, সেই কারণ কোন অট্টালিকা বা ঘাটের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে এই স্থানে স্থায়ী হইতে পারে নাই। আবার ইহাও প্রবাদ আছে, এই ঘাটের নির্ম্মাণ-কর্ত্তা নিজ মাতৃনামে ইহা উৎসর্গ করিতে বাসনা করিয়া, বলিয়াছিলেন, "এতদিনে 'মাতৃ-ঋণ' পরিশোধ করিতে পারিলাম।" ভ্রান্ত মোহান্ধ ব্যক্তি ভাবিতেও পারে নাই যে, মাতৃ-ঋণ পরিশোধ করিবার শক্তি জীবের নাই, জগতে কেহ কখনই সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে নাই, পারিবেও না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও একত্র করিয়া মাতার সেই অপার্থিব স্নেহকণার তুলনায় আসিতে পারে না; সুতরাং উক্ত নির্ম্মাণকর্ত্তার এ ভ্রান্ত গর্ব্বানুষ্ঠান অচিরে শিথিলমূল হইল, ঘাটের বিনির্ম্মিত স্তম্ভ ও উপানদেশ-গুলি জননী জাহ্নবীর প্রবল প্রবাহে হেলিয়া পড়িল, নির্ম্মাণকর্ত্তা বিফল-মনোরথ হইয়া নিজ ভীষণ দাম্ভিকতার ফল—অনুশোচনাক্লিষ্ট তাহার শেষ

জীবন-প্রদীপটী নির্ব্বাপিত হইলে, ঘাটটী এতদিন তদবস্থাতেই তাহার মহাভ্রমের পরিচয় দিতেছিল। সম্প্রতি এক মহাপুরুষ সন্ন্যাসী ভিক্ষালব্ধ প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া ইহার আমূল সংস্কার করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। ঘাটটী প্রস্তুত হইলে কাশীর গঙ্গাতটের অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধিত হইবে।

—:০:—

সঙ্কটাঘাট।

সর্ব্বসঙ্কটবিনাশিনী সঙ্কটাদেবীর নামানুসারেই এই ঘাটের নাম করণ হইয়াছে। সঙ্কটামন্দির কাশীর মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ; হিন্দু-রমণীগণ সংসারে কোন কিছু অনিষ্টের আশঙ্কা দেখিলেই অবিলম্বে সঙ্কটার পূজা দিয়া আসেন। সঙ্কটার মন্দিরটী অতি সুন্দর। মন্দিরের অনতিদূরে পূর্ব্বোক্ত সঙ্কটাঘাট। ঘাটের উপরেই হনুমানজীর এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। নিম্নে একটী সুন্দর ক্ষুদ্র শিবালয় ঘাটের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। বহু বিদ্যার্থী এই মন্দির সমীপে অবস্থান করিয়া বিদ্যার্জ্জন করিয়া থাকে।

—:০:—

গঙ্গামহল বা গোয়ালিয়রঘাট।

বারাণসীর এই বিস্তৃত গঙ্গাতটস্থিত সৌধশ্রেণী-মধ্যে গোয়ালিয়র ঘাটের উপর গোয়ালিয়র-রাজ-

অট্টালিকাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক মুন্সিঘাটের দ্বারভাঙ্গা-রাজবাটী ব্যতীত এমন সুন্দর ও সুদৃঢ় বাটী আর কোন ঘাটের উপরেই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অট্টালিকার সম্মুখেই গোয়ালিয়রঘাট, ইহা আবার 'গঙ্গা-মহল' বলিয়াও প্রসিদ্ধ।

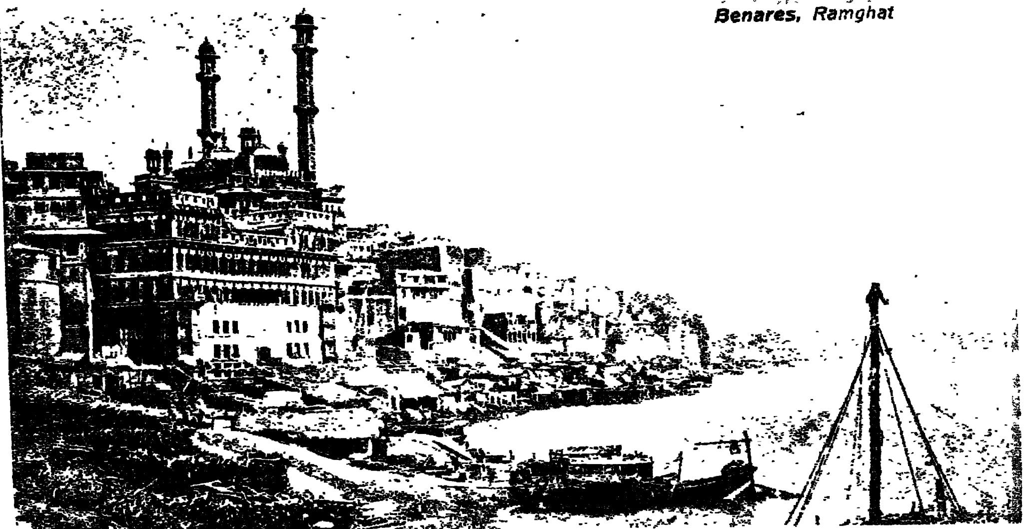
ঘোঁসলাঘাট ও কতিপয় লুপ্তঘাট।

নাগপুরের প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রনায়ক ঘোঁসলা বা ভোঁসলা বংশের কোন অধিপতি এই ঘাট নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ঘাটটী যেমন প্রশস্ত তেমনি দেখিতে সুন্দর। ঘাটের উপর প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। পূর্ব্ববর্ণিত গোয়ালিয়র সৌধের পার্শ্বে এটীও সৌন্দর্য্য-সম্পদে দাঁড়াইবার উপযুক্ত। প্রস্তরবদ্ধ সুদৃঢ় সোপান-পথ গঙ্গাগর্ভ হইতে অট্টালিকান্তর্গত একটী সুন্দর বিচিত্র মন্দির পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার পরেই গণপতি বা গণেশঘাট, এখানে লোকের স্নানাহ্নিক করিবার উপস্থিত বিশেষ সুবিধা নাই, নৌকা ভরা বহুসংখ্যক কাষ্ঠ এই স্থানে আমদানি হয় ও সহরের সর্ব্বত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। এই ঘাটটী এখনও গণেশঘাট বলিয়াই প্রসিদ্ধ।

ইহার নিকটে আরও কতকগুলি লুপ্ত ঘাটের সন্ধান পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যমঘাট ও অগ্নিঘাট উল্লেখযোগ্য। যমঘাট বা যমেশঘাটের সার্থকতা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, এখনও প্রতি ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন এখানে মেলা হইয়া থাকে। "ভায়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা" এই প্রবচনের বিধানানুসারে সকল ভ্রাতা-ভগিনী উক্তদিবস এই ঘাটে স্নান করিয়া ভগিনীকর-প্রদত্ত তিলক গ্রহণকরতঃ আনন্দচিত্তে ভগিনীর বাটীতে উপস্থিত হয় ও ভোজনানন্দ উপভোগ করে, পরে ভগিনীকে সাধ্যমত উপহার দিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে।

ইহার পরেই অগ্নিতীর্থ বা অগ্নিশ্বরঘাট। অগ্নিতীর্থ কাশীখণ্ডের বর্ণনা অনুসারে একটী প্রধান তীর্থ বলিতে হইবে। কিন্তু কালক্রমে তাহার খ্যাতি মন্দীভূত হইয়াছে। এই তীর্থসহযোগেই ঘাটের নাম অগ্নিঘাট হইয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত বহু অনুসন্ধানে ঘাটের অস্তিত্ব বাহির করিতে হয়। ঘাটের উপর অগ্নিশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। আরও অনেক-গুলি মন্দির এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ঘাটের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত একটী প্রাচীন জৈন-মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



Benares, Ramghat

রামঘাট ও অন্যান্য কতিপয় ঘাট।

রামঘাট,—এটীও কাশীর একটী প্রসিদ্ধ ঘাট। এই ঘাটের উপর রামেশ্বর দেবতার মন্দির আছে। বোধ হয় সেই কারণেই ইহা রামঘাট বলিয়া খ্যাত। মন্দিরের মধ্যে আরও বহু দেব দেবী ও শ্রীরামচন্দ্রের অনুচরবৃন্দের অনেক প্রতিমূর্ত্তি আছে। এই স্থানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের বিশেষ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর জড়াওমন্দির-ঘাট ও বাজীরাও-লক্ষ্মণ-বালাঘাট অবস্থিত। জড়াওমন্দিরের পর মহারাষ্ট্র ধুরন্ধর বাজীরাও পেশোয়া-নির্ম্মিত এই ঘাট ও অট্টালিকা দেখিবার বিষয়। দিল্লীসম্রাট ঔরঙ্গজেবের গগনস্পর্শী মিনারেটসমন্বিত প্রসিদ্ধ মস্ক বা মস্‌জিদ্‌টী এই অট্টালিকার সহিত সংলগ্ন।

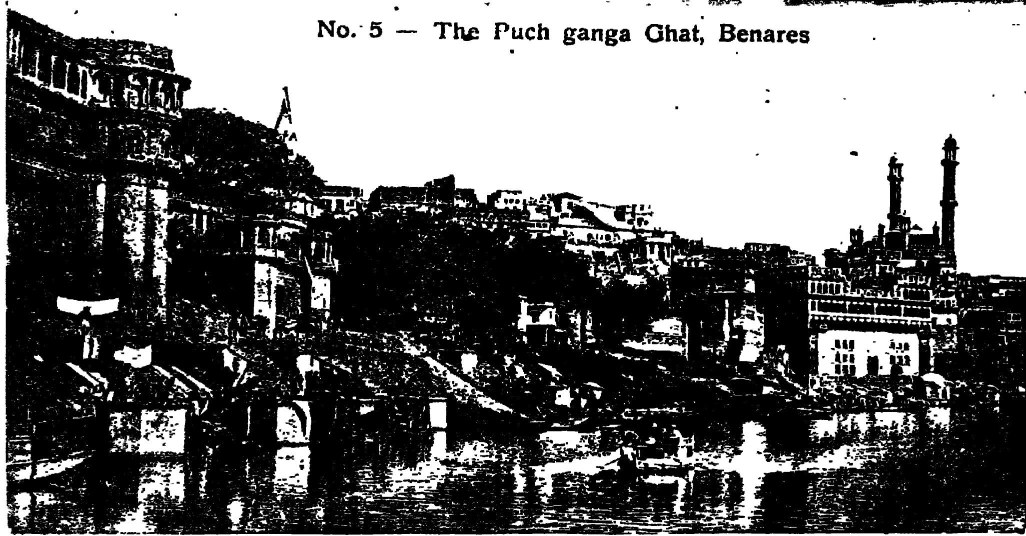
ইহার পরেই চোরাখ্যঘাট বা চোরঘাট অবস্থিত। ঘাটটীর চোর আখ্যা কেন প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। ঘাটের উপর অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। আষাঢ়ী-পূর্ণিমায় ও অগ্রহায়ণ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে এখানে কয়েকটী মেলা হইয়া থাকে।

পঞ্চগঙ্গা ও বেণীমাধবঘাট।

পঞ্চগঙ্গা হইতে পর পর একই ভাবের অনেকগুলি ঘাট এই স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং সেগুলির স্বতন্ত্র নির্দ্দেশ করা দুরূহ। প্রথমেই পঞ্চগঙ্গা অর্থাৎ পঞ্চস্রোতার সম্মিলন। ধুতপাপা, যমুনা, কিরণা, সরস্বতী ও গঙ্গা এই পঞ্চনদী বলিয়া প্রসিদ্ধা। ধুত-পাপা হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত চারিটী অন্তঃস্রোতা ক্ষুদ্র নদী গঙ্গায় আসিয়া মিলিয়াছে। প্রবাদ আছে, বহু পূর্ব্বকালে যখন এ স্থানে প্রস্তরবদ্ধ ঘাট নির্ম্মিত ছিল না, তখন গঙ্গার জল কমিয়া যাইলে উক্ত স্রোত বা ধারাসমূহ পরিলক্ষিত হইত, কালক্রমে তাহা আর দেখিবার উপায় না থাকিলেও, প্রাচীনকালের সেই পঞ্চগঙ্গার নামই প্রসিদ্ধ আছে।

এই পঞ্চগঙ্গার এক অংশ মঙ্গলাগৌরীঘাট বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে, এক সময় মঙ্গলা-গৌরী কঠোর তপশ্চরণ করেন, তাহাতে সূর্য্যকিরণ-জনিত ঘর্ম্ম হইতে একটী স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহা-রই নাম কিরণনদী। সেই কিরণনদীর উপর মঙ্গলা-গৌরীঘাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যাহা হউক এই সম্মিলিত পঞ্চগঙ্গাঘাট, পঞ্চনদ-তীর্থ বা ধর্ম্মনদ-তীর্থ বলিয়াও প্রসিদ্ধ, কাশীর প্রসিদ্ধ পঞ্চতীর্থের মধ্যে ইহাও অন্যতম। কাশীখণ্ডে বর্ণিত



No. 5 — The Puch ganga Ghat, Benares

রাজমন্দিরাদি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘাট।

রাজমন্দির ঘাটটী, "কোটা-বুন্দীর" রাজপরিবার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ঘাটের উপর উক্ত মহারাজের রাজবাড়ী অবস্থিত। অধিকাংশ মাড়োয়ারী ও দেশওয়ালারাই এই ঘাটে স্নানাহ্নিক করে। চৈত্র-তৃতীয়ায় 'গৌ-গৌর' মেলা হয়। তাহাতে বহু মাড়োয়ারি নরনারীর ভিড় হইয়া থাকে। কেহ কেহ ইহাকে শিতলাঘাটও বলিয়া থাকেন।

ইহার পর লালঘাট বা পাক্কাঘাট নামে একটী ঘাট আছে। অনন্তর গায়ঘাট, নারায়ণঘাট, গোলা-ঘাট, প্রভৃতি অনেকগুলি ঘাট বিদ্যমান আছে।

ত্রিলোচনঘাট।

ত্রিলোচনঘাট বা পিলিপিলাতীর্থ। কাশীখণ্ড পাঠে জানিতে পারা যায়, যমুনা, নর্ম্মদা ও সরস্বতী গঙ্গার সহিত যে স্থানে মিলিতা হইয়া হাস্য করিতে-ছেন, তাহারই নাম পিলিপিলাতীর্থ। এই তীর্থে স্নান ও পিতৃপিণ্ড প্রদান করিলে গয়া-পিণ্ডদানের

আর আবশ্যকতা নাই। এই তীর্থে স্নান করিয়া নিকটস্থ ত্রিপিষ্ট-লিঙ্গ দর্শন করিলে জগতের কোটী-তীর্থ দর্শনের ফল লাভ হয়। ত্রিলোচনঘাটটী বহু সুন্দর সুন্দর মন্দির ও অট্টালিকায় সুশোভিত। নিকটেই ত্রিলোচন মহাদেবের প্রাচীন মন্দির ছিল, তাহা জীর্ণ হইয়া যাইলে, পুণার 'নাথুবালা' নামক কোন সধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মাকর্ত্তৃক পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরমধ্যে বহু প্রাচীন শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। মন্দিরটী সুন্দর কারুকার্য্যে শোভিত, দেখিলে নয়ন মন পরিতৃপ্ত হয়। কাশীতে আসিয়া এমন একটী শ্রেষ্ঠ দেবালয় দর্শন না করিলে বাস্তবিক কাশী-দর্শন অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কাশীমাহাত্ম্যে ত্রিলোচন শিবলিঙ্গের এতই প্রশংসা লিখিত আছে যে, সমগ্র বারাণসীপুরী হইতেও বারাণসীস্থিত ত্রিলোচন মহাদেব শ্রেষ্ঠতর।

এই মন্দির ও ঘাটের নিকটেই 'আদিমহাদেবের' একটী স্বতন্ত্র মন্দির আছে। তাহাতে শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসের প্রাচীন আসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতেই নাকি ব্যাসদেব উপবেশন করিয়া বেদ পাঠ করিতেন। ইহার নিকটেই 'পার্ব্বতেশ্বরীর' একটী সুন্দর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, এই মূর্ত্তি কালক্রমে লুপ্ত হইয়াছিল, 'গোরজী' নামক জনৈক

গুজরাটী ব্রাহ্মণ যিনি কাশীখণ্ড পাঠে কাশীর লুপ্ত দেবালয় ও মূর্ত্তিগুলির উদ্ধারমানসে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহারই যত্নে এই নবমূর্ত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তিলিয়ানালাঘাট।

এখানে কোন ঘাট নাই, ঘাটের কোন বিশেষত্বও নাই। তবে কথিত আছে, পুরাকালে এই নালা কোন রাজপুরীর গড়খাই রূপে খনিত হইয়াছিল, কালবশে সে পুরীও নাই, সঙ্গে সঙ্গে সে গড়খাইও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, গঙ্গাসঙ্গমে তাহার সামান্য চিহ্নমাত্র আছে। বর্ষাকালে তাহা সামান্য জলস্রোতে প্রবাহিত হয়। নিকটে প্রস্তর নির্ম্মিত হিন্দু ও বৌদ্ধ অট্টালিকার ভিত্তি, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত স্তম্ভ ও নানা কারুকার্য্য সমন্বিত প্রস্তর খণ্ডগুলি দেখিলে, বহু পুরাকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী-সময়ে তিলিয়ানালার পার্শ্বেই উক্ত প্রস্তর ও স্তম্ভাদি সহ-যোগে "মকদুম সাহেব" নামক মোসলমানদিগের একটী পীরের দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। আরও

কয়েকটী পুরাতন মস্‌জিদ্‌ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পরেই বাঙ্গলা দেশের নূতন পঞ্জিকার মত নয়াঘাট বা নূতনঘাট নামক একটী ঘাটের পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোনও বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা খুলিয়া দেখিলে যেমন তাহাতে সেই সময়ের মুদ্রিত নূতন পঞ্জিকাই দেখিতে পাওয়া যায়, এ ঘাটটীও সেইরূপ; তাহার নির্ম্মাণকালে নূতনঘাট বলিয়া পরিচিত হই-লেও এক্ষণে ইহাকে সম্পূর্ণ পুরাতনঘাট বলাই সঙ্গত। কিন্তু প্রচলিত নামের পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত সহজ-সাধ্য ব্যাপার নহে।

প্রহ্লাদঘাট ও রাজঘাট।

পূর্ব্ববর্ণিত পবিত্র বারাণসীর উত্তর প্রান্তস্থিত এই প্রহ্লাদঘাটটীই শেষ প্রস্তরনিবদ্ধ ঘাট, ইহার পর বরুণাসঙ্গম পর্য্যন্ত প্রস্তর-সোপান-শোভিত আর কোন ঘাট নাই। কাশীর উত্তর প্রান্তস্থিত জনপদের সকল নরনারী এই ঘাটেই তাহাদের স্নান আহ্নিক ও তর্পণাদি নিত্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকে। ঘাটের

উপরেই একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থবৃক্ষ, বৃক্ষমূলে বহু প্রাচীন দেবমূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গ রক্ষিত আছে। নিকটে অনেক সুন্দর সুন্দর শিবালয় অবস্থিত। জগতের নিষ্কাম সাধক-চূড়ামণি বালক প্রহ্লাদের স্মরণার্থে এই ঘাটটী প্রতিষ্ঠিত। ইহাই প্রাচীন প্রহ্লাদতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থান হইতে সমগ্র কাশীর সুন্দর দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

এই ঘাট অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই রাজঘাটের বিশাল রেল-সেতু ও কাশীষ্টেসন দেখিতে পাওয়া যায়। রাজঘাটে স্নানার্থী-দিগের সুবিধাজনক কোন পাথরবাঁধান ঘাট বা তাহার বিশেষ কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই। প্রসিদ্ধ গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এই ঘাটের উপর দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। যখন এখানে লৌহসেতু প্রস্তুত হয় নাই, তখন গঙ্গার উভয় তীরস্থিত সেই সুদীর্ঘ পথ বহুসংখ্যক নৌকা দ্বারা একপ্রকার নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া সংযোগ করিয়া দেওয়া হইত।

রাজঘাটের উত্তর দিকে পূর্ব্বোক্ত রাজা বানার বা বরণার নামধেয় বিখ্যাত কাশীনরেশের প্রকাণ্ড দুর্গ ও রাজভবন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে তাহা মোসলমান আধিপত্য-সময়ে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। লালসাহ নামক জনৈক মোসলমান ফৌজদার কিছুকাল এখানে

গড়বদ্ধ অট্টালিকামধ্যে অবস্থান করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। কাশীধামে ইংরাজ আধিপত্য প্রবল হইলে, এই স্থানটী একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল; পরে সিপাহীবিদ্রোহের সময় এই প্রাচীন গড়ের প্রতি ইংরাজের দৃষ্টি পড়ে। সে সময় বহু ইংরাজ এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিয়া নগর ও আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস এই স্থানে ইংরাজের গোরা-বারিকও ছিল, কিন্তু সে সময় কোন কোন সেনানায়কের বিবেচনায় স্থানটী সেরূপ স্বাস্থ্যকর নহে, এইরূপ স্থির হওয়ায় ক্রমে ইংরাজ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। স্থানটী দুর্গ নির্ম্মাণের পক্ষে বিশেষ অনুকূল ও উপযোগী—এক সময় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এই দুর্গের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

উক্ত দুর্গ ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ব্যতীত হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাকীর্ত্তিরও বহুল আদর্শ এখানে পরিলক্ষিত হয়। যদিও কোন কোন নির্ম্মম মোসলমানের ভীষণ অত্যাচারে সেই সকল প্রাচীন কীর্ত্তি প্রায় সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে, তথাপি সেই ভগ্ন ও চূর্ণাংশের মধ্যেও সেই অতীত যুগের জ্ঞান গবেষণা ও শিল্পনৈপুণ্যের এতই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, তাহা দেখিয়া বহু য়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিদ্‌ও চমৎকৃত না হইয়া থাকিতে পারেন না।

বিগত ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেস ও তৎ-সহযোগে যে বিরাট ভারতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়, সে সমস্তই এই রাজঘাটের এই বিস্তৃত স্থানে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ভারতের জীর্ণ প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দেখিলে যাঁহাদের আনন্দ হয়, তাঁহাদের পক্ষে রাজঘাটের এই সকল স্থান যে বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

বরণা-সঙ্গম।

রাজঘাট ষ্টেসন হইতেই সহরের সকল কোলাহল, সমস্ত বিলাস বৈভব পশ্চাতে ফেলিয়া, অতীত-গৌরব কাশীর সেই প্রাচীন লুপ্ত রাজধানী, প্রসিদ্ধ আদি-কেশব ও সঙ্গমেশ্বরের পবিত্র মন্দিরপাদ স্পর্শ করিয়া ভাগীরথীর প্রবল প্রবাহ বরণা-সঙ্গমে চলিয়াছেন। বরণা বারাণসীর উত্তর-সীমা-নির্দ্দেশক গঙ্গার বিখ্যাত উপনদী। ইন্দ্রাদি দেবগণ কাশী-ক্ষেত্র-বিঘ্নকর দুরাচারদিগের মুক্তি ও সহসা তাহাদের প্রবেশ নিবারণের জন্য বিশ্বেশ্বর মন্দির হইতে তিন যোজন পশ্চিমস্থিত পুষ্পপুর নামক গ্রাম হইতে এই বরণানদীর আবির্ভাব করিয়াছেন। বরণা অধুনা ক্ষীণাঙ্গী হইলেও এক সময় ইহা প্রবলা ছিল, তাহা পূর্ব্বেও উক্ত

হইয়াছে। হায়, বৃদ্ধা বরণা সেই সকল অতীত-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শোকে শীর্ণদেহে কোনরূপে যেন আত্ম-জীবন ধারণ করিয়া আছে। সেই জনাকীর্ণ নগর, সেই সৌধরাজি কোথায় বিলুপ্ত,—তাহার চিহ্নস্বরূপ সেই সকলের জীর্ণাবশেষ ইষ্টকপ্রস্তর স্থানে স্থানে সমাহিত হইয়া আছে, আর অযত্নবর্দ্ধিত তরু-গুল্ম তাহারই উপর যেন সিংহাসন পাতিয়া বিশাল অরণ্য-রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, বন্য পশুপক্ষীরাও অবসর বুঝিয়া আনন্দ-কলরবে সেই অরণ্যপ্রান্ত মুখ-রিত করিয়া রাখিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া প্রাচীনা বিগতবৈভবা বরণা, যেন ভয়ে ভয়ে আসিয়া গঙ্গার স্নিগ্ধ সলিলমধ্যে জীবন অর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে।

গঙ্গা-বরণার এই পবিত্র সঙ্গমের অধিপতি 'সঙ্গমেশ্বর মহাদেব' প্রাচীন মন্দিরমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন। বরণার পূর্ব্ব প্রান্তে আর একটী প্রাচীন মন্দির অব-স্থিত, তাহা আদিকেশবের মন্দির বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কাশীখণ্ড পাঠে জানা যায়—পুরাকালে ভগবান গরুড়ধ্বজ, লক্ষ্মীদেবী ও গরুড়ের সহিত একদা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন পূর্ব্বক নিজেরই এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া নিজেই প্রথমে তাহার পূজা করেন। সেই অবধি এই মূর্ত্তি আদিকেশব বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। ভক্তিভাবে



মোসলমান আধিপত্যের শেষ সময়ে কাশীর ঘাট দৃশ্য। (১১৯ পৃষ্ঠা)

এই আদিকেশবের পূজা ও অর্চ্চনা করিলে মানব অনায়াসে বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এখনও মন্দিরটীর সেই শান্ত গম্ভীর ভাব দেখিলে বস্তুতঃই চিত্ত বিমোহিত হইয়া যায়। এখানে সহরের সে চিত্ত-বিক্ষেপক বিলাস-প্রলোভন নাই, দেবদর্শনার্থী যাত্রী-দলের নিত্য সমাগম নাই, স্থানটী বেশ শান্তিময়, মনে হয়, সহসা বুঝি কোন অপার্থিব দেবভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ উপবেশন করিলে আপনা হইতেই যেন হৃদয়ে ভক্তিভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। সম্মুখে গঙ্গাবরণাসঙ্গম "পাদোদক তীর্থ"। কাশীর তীর্থ-পঞ্চকের মধ্যে ইহাও অন্যতম। তীর্থশ্রেষ্ঠ মণিকর্ণিকা হইতে ক্রমে বারাণসীর দক্ষিণ-প্রান্ত অসিসঙ্গম হইয়া পঞ্চক্রোশী কাশীধামের যাত্রা আরম্ভ করিয়া কাশী প্রদক্ষিণান্তে বারাণসীর উত্তর সীমায় বরণাসঙ্গমে আসিয়া এই পাদোদক তীর্থে স্নান করিতে হয়। এখানে ভাদ্রমাসে শুক্লাদ্বাদশীতে বামনোৎসবের মেলা হইয়া থাকে।

—:০:—

মোসলমান আধিপত্যের শেষ সময়ে কাশীর ঘাটদৃশ্য।

অসি-বরণা-বিস্তৃত বারাণসীর ঘাটগুলির এক-প্রকার পরিচয় প্রদত্ত হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি নানা-

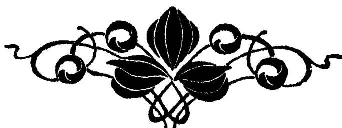
কারণে কাশীর দৃশ্য অনেকবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই স্মরণাতীত বৈদিক যুগ হইতে একাল পর্য্যন্ত কতবার কাশীর কতরূপ বিপর্য্যয় হইয়াছে, আবার সুবিধামত তাহার কত নূতন সংস্কার হইয়াছে, পাঠকগণের তাহা নিতান্ত অবিদিত নাই। বলা বাহুল্য দুর্ভাগ্যবশতঃ মোসলমান-আধিপত্য সময়েই ইহার বিকৃতির মাত্রা যেন সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। যাহাহউক মোসলমান রাজত্বের সে প্রখরভাব কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত হইয়া আসিলে, যখন সাম্য-নীতির প্রচারক ও আদর্শ নীতিনিপুণ সুচতুর ইংরাজ-জাতি ভারতের শাসনদণ্ড গ্রহণোদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছিলেন, যখন ভারতবাসী সকলেই একটা মহা অশান্তি, গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ভারতসম্রাট দিল্লীশ্বর সা-আলমের সিংহাসনতল টলমল করিতেছিল, ভিতরে ভিতরে ফরাসী ও ইংরাজের প্রবল প্রতিযোগিতায় ইংরাজই তাহাতে কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে, এমন সময় সন ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি ইংরাজসেনানায়ক সার রবার্ট ফ্লেচার (Sir Robert Fletcher) দিল্লী সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দৌলার বিপক্ষে কাশীর পর পারে মোগল-বাহিনীর সমাবেশ করেন। সেই সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে

জনৈক ইংরাজ চিত্রশিল্পীও ছিলেন, তিনি তখন পর-পার হইতে কাশীর যে দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, নিজ চিত্ত-বিনোদনজন্য তাহা অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং বিলাত-প্রত্যাগমনকালে তাহা তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান। কত দিন সে চিত্রের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই বা বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাহার রক্ষাকল্পে কেহ তেমন যত্নও করে নাই, সুতরাং চিত্রখানি সহজেই স্থানে স্থানে বিকৃত হইয়া যায়। সম্প্রতি প্রাচ্য-ইতিহাস-সংগ্রহকারক বিলাতের কোন সভা দৈবক্রমে তাহার সংবাদ পাইয়া তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করেন। 'ইণ্ডিয়ান হিষ্টোরিক্যাল সোসাইটী' বা ভারত-ঐতিহাসিক-সভার সাহায্যে ভারতগবর্ণমেণ্ট কলিকাতা 'ভিক্টোরিয়া মিমোরিয়ল হলের' জন্য বহুমূল্যে তাহা ক্রয় করিয়া রক্ষা করিয়াছেন। আমরা চিত্রখানি দেখিয়াছি এবং পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ তাহার একটী প্রতিলিপি প্রদান করিতেছি। এ চিত্র ইতিপূর্ব্বে আর কথনও প্রকাশিত হয় নাই। পাঠক দেখিবেন, বর্ত্তমান কাশী সহরের সহিত ইহার কতই পার্থক্য। চিত্রখানির সাহায্যে আমরা প্রায় দেড়শত বৎসরের পূর্ব্বে কাশীর ঘাটগুলির কিরূপ অবস্থা ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি। চিত্রখানিতে শিল্পীর নাম লিখিত ছিল, কিন্তু তাহা উদ্ধার করিতে

পারি নাই, তবে তাহারনিম্নে লিখিত যে অংশটুকু পাঠ করিতে পারিয়াছি, পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা এই স্থলে যথাযথ উদ্ধৃত হইল।

"The famous and ancient city of Benares with a view of the great Mogal camp on the opposite side of the Ganges, the 15th January 1765 when Sir Robert Fletcher left his majesty and marched to attack Sujah-Ud-daulah to con * * *"

এই চিত্রটী যথার্থই যে, একখানি বৃহৎ ইতিহাসের পরিচয় দিয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বর্ত্তমান কাশীচিত্রের সহিত ইহা মিলাইয়া দেখিলে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।



কাশীর উপাসক সম্প্রদায়।

বৈদিক বা সনাতন মত।

কাশী জগতের মধ্যে যেমন অতি প্রাচীন জনপদ, ইহার অধিবাসীবৃন্দও তেমনই ইহার প্রাচীনত্বের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সম্প্রদায় ও অনন্তভাবে পুষ্ট হইয়াছে। সেই সুদূর সত্যযুগসুলভ সাম-গাননিরত ও আদি-যজ্ঞাগ্নির চিররক্ষক সাগ্নিক ব্রাহ্মণ সনাতনী হইতে একাল পর্য্যন্ত কাশীতে জৈন, বৌদ্ধাদি যত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি বা পুষ্টি হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলগুলিরই কোন না কোন বিভাগ এখনও এখানে বিদ্যমান আছে।

কাশীতে যাঁহারা যথার্থ তীর্থদর্শকরূপে আগমন করেন, তাঁহাদের কেবল মণিকর্ণিকায় স্নান ও কয়েকটী প্রসিদ্ধ দেবালয় দর্শন হইলেই কাশীতীর্থ দর্শন সম্পূর্ণ হইল বলিতে পারা যায় না। তীর্থাবগাহন ও দেবদর্শন কাশীদর্শনের যেমন একদিক, তেমনি পবিত্র বেদগান ও বেদমন্ত্রশ্রবণ, সেই পূত যজ্ঞাগ্নি ও তাহার আহুতিবিধানাদির দর্শন হইতে নব নব প্রবর্ত্তিত সমস্ত ধর্ম্ম বা উপাসকসম্প্রদায়ের রীতিনীতি সকল নিরপেক্ষভাবে পরিদর্শন করাও বোধ হয় তাহার অন্যদিক। কারণ বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ

বারাণসী ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের এমন বিচিত্র ও বিপুল সমাবেশ বোধ হয় জগতের আর কোথাও দৃষ্টিগোচর হইবে না। বুদ্ধিমান তীর্থযাত্রীর এ অপূর্ব্ব সুযোগ পরিত্যাগ করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে।

কাশী আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন তীর্থ হইলেও বেদাঙ্গ হইতে জাত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত সকল উপাসকেরই ইহা সমান আকাঙ্ক্ষার স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে সে সকল বিষয় অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন সাম্প্রদায়িক জনমণ্ডলীতে বারাণসী পূর্ণ হইলেও এখনও বোধ হয় শতকরা নব্বই জন সনাতনবিধানানুরক্ত হিন্দু এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক এই কাশীর সেই বিরাট উপাসক-সম্প্রদায় আবার কত যে উপ-বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে, তাহারও হিসাব করা নিতান্ত সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

হিন্দুর বিরাট দেহ হইতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মত বৈদিক ক্রিয়কলাপে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও যে এই ঘোর কলির প্রাবল্যে কিছুমাত্র বিচলিত বা পরিবর্ত্তিত হন নাই, তাহা নহে, বরং আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম্ম ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে বর্ত্তমানকালোচিতভাবে তাঁহারা সম্পূর্ণই পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। এরূপ সংঘটন নিতান্ত অস্বাভাবিক বিষয় নহে, কারণ কালের সেই অপ্রতিহত গতির বিরুদ্ধাচরণ মানবের সমগ্র শক্তি বা

সামর্থ্যের সম্পূর্ণ অতীত! যিনি যতই স্থিতিশীল ভাবের পোষকতা করুন না, কাল তাহাকে অলক্ষ্যে অবলীলাক্রমে নিজ স্রোতে ভাসাইয়া লইবেই! ইহাই সেই অনাদি ও অনন্ত কালধর্ম্ম!

সামবেদী বিপ্র, সেই উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিৎ—ভিন্ন ভিন্ন বেদীয় আচার্য্য, সর্ব্বজন বরেণ্য সেই সকল পূত-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই প্রাচীন অগ্নিকুণ্ডমধ্যে হবি প্রদান করিতেছে—তৈলবিহীন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপাগ্রভাগে ক্ষীণ দীপশিখার মত যেন অতি কায়ক্লেশে বাহ্য বায়ুতাড়না হইতে তাহা কোনরূপে রক্ষা করিতেছে মাত্র—কিন্তু সে উৎসাহশীল যজ্ঞামোদী যজ্ঞকর্ত্তা বা যজমান কই, সে নিষ্ঠাবান তপোবনরক্ষক ক্ষত্র-নরপতির সে বিমল স্বাধীনতা কই, সে পবিত্র যজ্ঞভূমি, সে প্রশান্ত তপোবন, সে মনোহর-দৃশ্য হোমগোবিসমূহ কোথায়? সে অগ্নি রক্ষার উপযোগী অনায়াসলব্ধ কাষ্ঠখণ্ডেরও যে আজ অভাব! হায়, বেদবিধিরক্ষক বিপ্র যে, আজ তাহার দগ্ধ উদরের জন্যই উন্মাদপ্রায়, সুতরাং কতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ এখনও যে পরিত্যক্ত হয় নাই, ইহাই আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয় নহে কি? এখনও সেই বৈদিক বহ্নির চিহ্নমাত্রও দেখিবার যে স্থান আছে, এই কলিতাড়িত একা-

কারের দিনেও যেসেই বৈদিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার প্রয়াস আছে, তাহা অবশ্যই দেখিবার বিষয়।

"যুগধর্ম্ম" বলিয়া দেবভাষায় যে ঋষিবাক্য চিরকাল প্রচলিত আছে তাহা যে আর্য্য মনীষিগণের গভীর গবেষণা, দূর দৃষ্টি বা ত্রিকালজ্ঞানের পরিচায়ক, তাহার আর সন্দেহ নাই। যখন তাঁহারা সেই প্রাচীন যুগে এই আনন্দকানন কাশীর সুরম্য তপোবনমধ্যে আসন স্থাপন করিয়া প্রজ্জ্বলিত যজ্ঞাগ্নি-মধ্যে আহুতি প্রদান করিতেন, তখনই তাঁহারা দূর ভবিষ্যতের এই ভীষণ ব্যভিচারের সুস্পষ্ট চিত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা জানিয়াছিলেন, একদিন এ নিষ্কাম পবিত্র ভাবের প্রায় লোপ হইবে, ব্রাহ্মণ কর্ম্মরহিত, লোভপরবশ ও সংস্থানপর হইয়া বৈশ্য ও শূদ্রোচিত আচারসমূহে অনুপ্রাণিত হইবে, সুতরাং বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম ক্রমে বিলুপ্ত হইবে, তাই তাঁহারা বিভিন্ন যুগধর্ম্মের বিবিধ বিধান লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেই সকল বিধিই অধুনা রূপান্তরিত হইয়া নানা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। উপাসকমণ্ডলী তাহাই এখন স্ব স্ব প্রবৃত্তি অনুসারে গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন।

এই সকল ভিন্ন ভিন্ন উপাসকের মধ্যে কতক-গুলি বাহ্য মতভেদ ব্যতীত মূলতঃ সকলেরই উদ্দেশ্য

প্রায় একরূপ, কেবল প্রকৃতি ও অধিকার ভেদে এই বিসদৃশ মতের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং আমাদের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহাই উপলক্ষ্য করিয়া পরস্পর ঘোর বিরোধ করিয়া বসি। যাহা হইক সেই আর্য্য ঋষি নির্দ্দিষ্ট সনাতন ভাব কিয়ৎপরিমাণে শিথিলমূল হইলে, পরবর্ত্তী সময়ে তাহাঁদেরই প্রবর্ত্তিত পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ ও তান্ত্রিক উপাসনা বিধি কিঞ্চিৎ প্রকটভাবে প্রচারিত হয়, হিন্দু সমাজের অধিকাংশ উপাসক অবস্থা ও আবশ্যক বোধে নানা দেবদেবীর পূজকরূপে তাহাই আজিও মান্য করিয়া আসিতেছে।

—:০:—

জৈন সম্প্রদায়।

উক্ত বৈদিক ভাবের নানা ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইলে, হিন্দু দশাবতারের ন্যায় জিনধর্ম্ম-প্রচারক চতুর্বিংশ সংখ্যক তীর্থঙ্কর গুরুমণ্ডলীর ধীরে ধীরে আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের উপদেশ ও উপাসনা বিধি আর্য্যের বেদানুমোদিত প্রাচীন সপ্ত-দর্শনের ন্যায় দেবভাষাতেই আর একটী নবকায় ষড়্দর্শনরূপে প্রচারিত হইল। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জিনধর্ম্ম প্রবলতর করিতে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহাদের আশা ও উৎসাহ নিতান্ত বিফল হইল না। প্রসিদ্ধ

কাশীনরেশ 'প্রতিষ্ঠরাজের' কুমার সুপার্শ্বদেব সপ্তম তীর্থাঙ্কুররূপে বারাণসীধামেই নির্ব্বাণ লাভ করেন। তিনিই কাশীতে এই জিন-মতের প্রথম সূত্রপাত করিয়া যান, তাহার পর আরও কত শত বৎসর অতীত হইলে কাশীপতি অশ্বসেনের পুত্র পার্শ্বনাথ পিতৃরাজ্য ও সমস্ত সুখ-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-মার্গ অবলম্বন করেন। অচিরকালমধ্যে তিনিও যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া "চতুর্যাম" ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। ইনি প্রায় ৭০৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ত্রয়োবিংশ তীর্থাঙ্কুররূপে প্রসিদ্ধ পার্শ্বনাথ পর্ব্বতের একটী "টোঁক" বা চূড়ার উপর যোগাবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ করেন। ইনিই বারাণসী তথা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে জিন মতের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তাঁহার সময় তদীয় বহু সহায়ক ও অনুচর-মণ্ডলী কর্ত্তৃকই জৈনপ্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সুতরাং অন্যদিকে হিন্দুর প্রাধান্য ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল। এই ভাবে জৈনধর্ম্ম বারাণসীতে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য লাভ করিলে, পরবর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এবং পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সনাতন-ধর্ম্মের ভীষণ পীড়নে ক্রমে তাহা আবার শীর্ণকায় হইতে থাকে।

যাহাহউক বর্ত্তমান সময়ে বারাণসীর মধ্যে এ সম্প্রদায় যথেষ্ট হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও একেবারে লুপ্ত হয় নাই।

২১৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত অগ্নিশ্বর ঘাটের দক্ষিণে এখনও একটী প্রচীন জৈন-মন্দির আছে, এখন সারনাথ স্তূপের নিকটেও আর একটী প্রধান মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, এতদ্ব্যতীত ভেলুপুরা, মৈদাগিণ ও অন্যান্য অনেকস্থলে জৈন-মন্দিরে উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী ও গৃহস্থগণ বাস করেন। ইহাদের মধ্যে দুইটী প্রধান উপ-বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, একটী শ্বেতাম্বরী, অন্যটী দিগম্বরী। পরস্পরের মধ্যে সামান্য মতবিভেদ আছে সন্ন্যাসীগণ 'মুনি' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। জীবক্লেশ ও হিংসা নিবারণ ইহাঁদের প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ। সন্ন্যাসীগণ সেই কারণ একটী ঝাড়নের ন্যায় বস্তু সর্ব্বদা সঙ্গে রাখেন। উপবেশনকালে তাহা দ্বারা বসিবার স্থানটী ঝাড়িয়া লয়েন, উদ্দেশ্য কোন কীটাদি থাকিলে সরিয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহার উপবেশন-জনিত নিহত হইবে না। কোন স্থানে যাইতে হইলে, তাঁহারা কখন কোন যানারোহণে গমন করেন না, ইহারও উদ্দেশ্য জীব পীড়া নিবারণ। কলিকাতা হইতে কাশী বা ভারতের কোন সুদূর প্রদেশে যাইতে হইলেও ইহাঁরা পদব্রজেই গমন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার বেশ প্রচলন আছে। সন্ন্যাসীগণ অনেকেই বিদ্যানুরাগী, পণ্ডিত ও দ্বিজবংশ-সম্ভূত, বেশ নিষ্ঠাবান, শান্ত ও সরল প্রকৃতি সম্পন্ন। বিদ্বেষ-

বুদ্ধি বশতঃ হিন্দুগণ কর্তৃক জৈনধর্ম্ম উপেক্ষিত হইলেও, জৈন-গৃহীদিগের সহিত হিন্দু-পরিবারের সহানুভূতি ও অল্পাধিক বৈবাহিক সম্বন্ধ পর্য্যন্ত এখনও প্রচলিত আছে। সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার 'বিজ্ঞান ভিক্ষু' প্রমুখ বহু সুপণ্ডিত ও সাধক জৈন-ধর্ম্মশাস্ত্রের বিপুল উন্নতি বিধান করিয়া গিয়াছেন।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়।

ইহার পর বৌদ্ধসম্প্রদায় কাশীতেই সৃষ্ট এবং কাশীতেই আশাতীত পুষ্টিলাভ করিয়া ক্রমে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কালবশে কাশীর মধ্যে তাহা যেন একবারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সে সকল কথা ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ভুক্ত কোন পরিবার বা সাধু-সন্ন্যাসীর এখানে চিরস্থায়ী আবাস নাই। তবে চীন, জাপান, ব্রহ্ম ও সিংহলবাসী যতি ও শ্রমণগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থের দর্শন করিয়া থাকেন। অধুনা সারনাথ-স্তূপের নিকট জনৈক সিংহলবাসী বৌদ্ধ অবস্থান করিয়া আছেন। কয়েক জন বৌদ্ধ-শ্রমণও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য এখানে বাস করিতেছেন।

যে বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময় ভারতের রোমে রোমে সঞ্চারিত হইয়াছিল, যে উপাসনা-বিধি মূল বৈদিক-উপাসনা পদ্ধতিকেও যেন আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা সহসা কাশী ছাড়িয়া বা ক্রমে ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিল কেন ?

এ প্রশ্নের উত্তরে কত লোকে কত কথা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের মনে হয়, প্রথমতঃ এই ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সকল মন্ত্র ও গ্রন্থসমূহ চিরপূজ্য দেবভাষার পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক পালি ভাষা বা পাটলিপুত্রের ভাষায় প্রকাশিত হইবার কারণ, পরবর্ত্তী সময়ে ভারতের অন্যান্য প্রান্তীয় জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক সেরূপ সমাদরে গৃহীত হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ইহার উপসনা-পদ্ধতি যতদিন জৈনসম্প্রদায়ের ন্যায় বৈদিক-উপাসনা-প্রণালীর কতকটা অনুরূপ ছিল, ততদিন সনাতনী-দিগের অন্তরের মধ্যেও যাইয়া তাহা ক্রিয়া করিতে সমর্থ হইয়াছিল, কিন্তু যখনই তাহার শেষ গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এদেশীয় প্রকৃতির প্রতিকূলতাপূর্ণ অনাচার ভাবগুলি অবলম্বন করিল, অর্থাৎ বিভিন্ন বৈদেশিক বা অনার্য্য আচার-ব্যবহারসমূহ প্রচলিত আর্য্য-উপাদানগুলির সহিত বৌদ্ধগণ সদর্পে মিলাইতে বসিল, ধর্ম্মের আবরণে হিংসা-দ্বেষাদি অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল, এক পরিবারের মধ্যে কেহ

হিন্দু কেহ কেহ বৌদ্ধ এইরূপ সম্মিলন ভাবের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষভাবপুষ্ট বিরোধি দলের সৃষ্টি করিতে লাগিল, তখনই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিকণাসদৃশ সেই সনাতন ধর্ম্মভাব দাবাগ্নির ন্যায় সহসা প্রজ্জ্বলিত হইয়া কণ্টকারণ্যে পরিণত ভগবান বুদ্ধের সে "নির্ব্বাণ" সাম্রাজ্য ভস্মীভূত করিয়া দিল, ভারতের অঙ্ক হইতে সে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ মত কতদিনের তরে বিলুপ্ত হইল। সেই অবধি বারাণসীতে সকল বিহার চৈত্য ও স্তূপ উপাসক-বিহনে যেন শ্মশানের ন্যায় পরিত্যক্ত হইয়া আছে।

—:০:—

শঙ্করাচার্য্য বা দশনামীসম্প্রদায়।

যে সনাতন ধর্ম্মবহ্নি বহুদিন নানা কারণে সমাবৃত থাকিয়া ক্রমেই নির্ব্বানোন্মুখ হইতেছিল, অথবা ভিতরে ভিতরে প্রধূমিত হইতেছিল, সহসা তাহারই এক স্ফুলিঙ্গ শঙ্করাবতার শঙ্করাচার্য্যদেব ধ্বগ্ ধ্বগ্ করিয়া জ্বলিয়া উত্তর চিরতুষারাবৃত' হিমগিরি হইতে দক্ষিণ কুমারিকা রামেশ্বর অবধি, আবার পশ্চিম দ্বারকাক্ষেত্র হইতে পূর্ব্ব বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতভূমি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।

বেদানুমোদিত অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্যদেব সশিষ্য ভারতে ধর্ম্মবিজয় লাভ করিয়া, বিজয়

চিহ্নস্বরূপ তাঁহার শিষ্য-চতুষ্টয়কর্ত্তৃক ভারতের চারি প্রান্তে চারিটী অক্ষয় মঠ স্থাপন করিলেন।

প্রথমে পশ্চিম প্রান্তে বা পশ্চিমাম্নায় দ্বারকা-ক্ষেত্রে 'শারদা মঠ' এই মঠে তাঁহার শিষ্য চতুষ্টয়ের মধ্যে 'হস্তামলক' আচার্য্যরূপে অবস্থান করিলেন। ইহার আবার দুই শিষ্য 'তীর্থ' ও 'আশ্রম' সামবেদ রক্ষাকর্ত্তা 'কীটবার সম্প্রদায়' বলিয়া অভিহিত হই-লেন। ইহাঁদেরই শিষ্য ও প্রশিষ্য-পরম্পরায় উক্ত তীর্থ ও আশ্রম উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন।

পূর্ব্বাম্নায় বা ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠে শঙ্করশিষ্য 'পদ্মপাদ' আচার্য্যরূপে বরিত হইলেন, তাঁহারও দুইটী শিষ্য, 'বন' ও 'অরণ্য' ঋগ্বেদ রক্ষাকর্ত্তা 'ভোগবার সম্প্রদায়' বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেন। ইহাদেরই শিষ্য-পরম্পরা উক্ত বন ও অরণ্য উপাধিতে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন।

উত্তরাম্নায় বদরিকাশ্রমক্ষেত্রে জ্যোতির্ম্মঠে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের তৃতীয় শিষ্য 'তোটকাচার্য্য' অবস্থান করিলেন। তাঁহার তিনটী শিষ্য 'গিরি', 'পর্ব্বত' ও 'সাগর' অথর্ব্ববেদ রক্ষাকর্ত্তা 'আনন্দবার সম্প্রদায়' বলিয়া উক্ত হইলেন। এবং একাল পর্য্যন্ত উক্ত গিরি, পর্ব্বত ও সাগর উপাধিতে তাঁহাদের শিষ্য পরম্পরা পরিচয় দিয়া আসিতেছেন।

অনন্তর দক্ষিণাম্নায় রামেশ্বরক্ষেত্রে 'শৃঙ্গেরি মঠে' শঙ্কর-শিষ্য 'সুরেশ্বর' দেব আচার্য্যরূপে অবস্থান করিলেন। তাঁহারও তিনটী শিষ্য 'সরস্বতী' 'ভারতী' ও 'পুরী' যজুর্ব্বেদ রক্ষাকর্ত্তা 'ভূরিবার সম্প্রদায়' বলিয়া উক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী পরস্পরায় উক্ত গিরি, পুরী ও সরস্বতী উপাধিতে চিরদিন ভূষিত হইয়া আসিতেছেন।

এখন দেখা যাইতেছে, শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভুর শিষ্য চতুষ্টয়ের শিষ্যগণ বা তদীয় দশসংখ্যক প্রশিষ্যের নামানুসারেই পূর্ব্বোক্ত গিরি, পুরী প্রভৃতি দশনামী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে।

বারাণসী শঙ্করের সাধনভূমি, ভারতের ধর্ম্মকেন্দ্র, এ স্থলে তাহার কোন শিষ্য বা শিষ্যপরিচালিত স্বতন্ত্র মঠ ছিল না, সমগ্র বারাণসী তাঁহারই লীলাভূমি তাঁহারই আনন্দমঠ। শঙ্কর যাঁহার অবতার সেই বিশ্বেশ্বরই এ আনন্দ-কাননের অধিনায়ক, সুতরাং শঙ্কর নিজেই তাঁহার প্রকটরূপে এই স্থানে অবস্থান করিয়া সমগ্র ভারতের ধর্ম্মচক্র পরিচালনা করিতেন। সেই কারণ চতুরাম্নার সকল শিষ্যই এপর্য্যন্ত মোক্ষভূমি কাশীবাসের অত্যন্ত পক্ষপাতী। এখানেও শঙ্করমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দশনামী-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সন্ন্যাসী সতত এই স্থানে অব-

স্থান করিয়া আজিও তাঁহার অতুল-কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিতেছে।

দশনামীসম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ও সন্ন্যাসীগণ প্রথমে শৈব পরে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক হন। প্রথমে প্রায় সকলেই শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া থাকেন, অনন্তর দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ ও পরমহংসাধিকার লাভ ইহাঁদের মধ্যে আজিও প্রচলিত আছে। সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেকে বেশ সুপণ্ডিত ও সাধনরত, কেহ কেহ মঠাবস্থানকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাও করিয়া থাকেন, কিন্তু অধিকাংশই নিরক্ষর, সেই অজ্ঞ সন্ন্যাসীদল সন্ন্যাসধর্ম্ম ও পবিত্র গৈরিক বস্ত্রে কেবলই কলঙ্ক লেপন করিতেছে মাত্র। ইহারা সকলেই কৌপিনধারী, ইহাদের গলায় রুদ্রাক্ষ মালা ও ললাটে বিভূতি-ত্রিপুণ্ড্রক দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণের নিকট ইহাঁরা অনেকে বাবাজি বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। ইহাদের বহু শিষ্য-সেবকও আছেন। কাশীর মধ্যে বহু পুরাতন ও নূতন মঠের ইহাঁরাই অধিকারী। অনেক মঠে দেবত্তর সম্পত্তি যথেষ্ট আছে, সে সকলেরও অধিপতি এই মঠধারীগণ। ইহাঁদের মধ্যে বিবাহবিধি প্রচলিত নাই, চিরকৌমার্য্যই এ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাঙ্গ, সুতরাং শিষ্যপরম্পরায় সেই সকল মঠ ও দেবত্তর সম্পত্তি অধিকৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অধিকাংশ বাবাজীই দীন-সন্তান ও নিরক্ষর, সহসা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া তাঁহারা ঐশ্বর্য্যমদে উন্মত্ত হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাদের ভাবিবারও অবসর থাকে না যে, কেন তাঁহারা এ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, লোকে কেন তাঁহাদিগকে এত ধন রত্ন আনন্দসহকারে দান করিয়াছে! সে সনাতন ধর্ম্মালোচনা, তাহার উন্নতি ও উৎসাহকল্পে প্রকৃত সাধু সজ্জনের সেবার উদ্দেশ্যে তাহা ব্যয়িত না হইয়া নিতান্ত বিষয়ী বিলাসীর ন্যায় নানা অসৎ ও অকথ্য কর্ম্মানুষ্ঠানে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে। কেবল কাশীস্থিত মঠধারী সন্ন্যাসী বলিয়া নহে, অন্যান্য প্রদেশেরও বহু গিরি, পুরী প্রভৃতি উপাধিধারী দশনামীসম্প্রদায়ভুক্ত মহান্তগণ এইরূপই আচরণ করিয়া থাকেন। তবে যথার্থ সাধু-সজ্জন যে ইহাঁদের মধ্যে আদৌ নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না, কোন কোন মহাত্মা অনেক স্থলে এখনও ভগবান শঙ্করাচার্য্যের সেই গভীর অদ্বৈত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহা হউক সন্ন্যাসী-সমাজে দশনামীসম্প্রদায়ের সম্মান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মৃত্যু হইলে ইহাঁদের দেহ সমাধিস্থ বা নদীর জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

—:০:—

দণ্ডী সম্প্রদায়

দশনামী সন্ন্যাসী ব্যতীত আরও অনেক বিভাগের দণ্ডী সন্ন্যাসী কাশীতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূলতঃ ইহারা সকলেই শঙ্করাচার্য্য মতের অনুগামী। ব্রাহ্মণকুমার ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের দণ্ডী হইবার অধিকার নাই। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি কঠোর নিয়ম প্রচলিত আছে। দণ্ডী, সাধু বা পরমহংস গুরু, শিষ্যকে দীক্ষা বা মন্ত্র প্রদানকালে তন্ত্র মতে অভিষিক্ত করিয়া বা অন্য কোন বিশেষ বিধানে শিষ্যশরীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া শিষ্যকে কৃত-শ্রাদ্ধ-পিণ্ড ও শিখাসূত্র পূর্ণাহুতি করাইয়া দশাক্ষরমন্ত্রে দীক্ষিত করেন, অনন্তর দণ্ড কমণ্ডলু ও গৈরিক বস্ত্রের অধিকার প্রদান করেন। এখন হইতে অগ্নি ও ধাতু স্পর্শ নিষিদ্ধ হওয়ায় স্বপাক অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা ও ধূমপান ইত্যাদি তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং কোন ব্রহ্মচারী বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন অযাচিতভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলে ইহাঁদিগকে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হয়। আহারের ন্যায় শয়নাদি বিধানেও ইহাঁদের কঠোরতা কম নহে। কুশাসন ও কম্বলাদি ব্যতীত অন্য কোন উৎকৃষ্ট শয্যায় ইহাঁদের শয়ন করিতে নাই। দ্বাদশ বৎসর বা অল্পকাল এই

ভাবে দণ্ড বহন করিয়া পরে তাহা বিসর্জ্জন করিলে গুরুদেব কর্ত্তৃক পরমহংস অধিকার লাভ হইয়া থাকে। নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই ইহঁাদের প্রধান ধর্ম্ম, তবে আজকাল অন্য সকল সম্প্রদায়ের ন্যায় ইহাও অনেকটা বিকৃত হইয়া যাইতেছে, সুতরাং সে উচ্চভাব এখন আর প্রত্যেক দণ্ডীতেই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহার কারণ, মূল বা সাধনার প্রাথমিক ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি অনেকের ভাগ্যেই সম্পন্ন হইয়া উঠে না। যেমন গুরু তেমনি তাঁর শিষ্য! হয়ত কোন মঠের মহান্ত বা পরমহংস গুরুদেব শিষ্যানুশিষ্য অধিকার সূত্রে মঠাধীশ হইয়াছেন, কিন্তু ক্রিয়ায় তিনি সম্পূর্ণ অপরিপক্ক বা কিছুই করেন নাই, পূর্ব্বাশ্রমেও তাঁহার কোন সাধন-ভজন অভ্যস্থ ছিল না, গুরুর কৃপায় একেবারেই দণ্ডী সন্ন্যাসী হইয়া বসিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের শিষ্য-পরম্পরা অজ্ঞানবশতঃ দণ্ডী হইয়া উদরের তাড়নায় কেবল ভিক্ষার জন্য ঘুরিয়া বেড়ান। যাহা হউক ইহাঁদের মধ্যে দুই এক জন শিক্ষিত ও সাধনপুষ্ট ব্যক্তিও যে নাই তাহা নহে। তাঁহাদের দেখিলে এখনও শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভুর উচ্চ ও উদারভাব প্রত্যক্ষ বলিয়া মনে হয়। মৃত্যুর পর ইহঁাদেরও সমাধি হইয়া থাকে অথবা শবদেহ নদীজলে নিক্ষিপ্ত হয়।

রামানুজ সম্প্রদায়।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের পর কয়েক শতাব্দী অতীত হইলে রামানুজ স্বামীর আবির্ভাব হয়। ইনি শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধর্ম্মের পোষকরূপে অদ্বৈতবাদ মতের সামান্য খণ্ডন করিয়া ভক্তি-সাধনার রহস্য বিশিষ্ট বিশষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। বেদান্তশাস্ত্রের ভক্তিতত্ত্ব-বিশ্বাসী বৈষ্ণব সাধু সন্ন্যাসীগণ তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্য। বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য বা দ্রাবিড় দেশীয় বৈষ্ণবগণ রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচয় দেন। কাশীতে রামানুজী বৈষ্ণবদিগের প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে ভোজ্য ও ভোজন ক্রিয়া গোপনে সম্পাদন করিবার বিধি আছে। অন্যান্য কর্ম্ম সনাতন মতেরই অনুরূপ।

—:০:—

রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায়।

রামানুজ স্বামীর স্বর্গারোহণ হইলে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরা যথাক্রমে দেবাচার্য্য বা দেবানন্দ, হরিহরাচার্য্য বা হরিহরানন্দ ও রাঘবানন্দ রামানুজী মতের অনুসরণ করেন। রাঘবানন্দের অন্যান্য শিষ্যের ন্যায় রামানন্দ স্বামীও তাঁহার নিকট যথারীতি রামানুজী

মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বহু তীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে তাঁহার সম্প্রদায় নির্দ্দিষ্ট নিজ ভোজ্য ভোজনের সংগোপন বিধি সম্পূর্ণ পালন করিতে পারেন নাই, সেই কারণ তদীয় গুরুদেব রাঘবানন্দ স্বামী তাঁহাকে নিজ পংক্তি হইতে স্বতন্ত্র ভোজন করিতে বলেন। স্বামী রামানন্দ তাহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত বিবেচনা করিয়া সে সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিলেন ও নিজ নামে অপেক্ষাকৃত উদার মত-পুষ্ট রামানন্দী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী পরে এই রামানন্দী বা রামাৎ সম্প্রদায়ের যথেষ্ট পুষ্টিসাধন করেন। কাশীতে রামসীতার উপাসক রামানন্দী বৈষ্ণবদিগের বেশ প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁদের মধ্যে গৃহী ও বৈরাগী বা উদাসীন এই দুইটী বিভাগ আছে। কাশীতে ইহাঁদের কয়েকটী মঠও আছে। পঞ্চগঙ্গাঘাটের নিকট রামানন্দ স্বামীর প্রস্তর-খোদিত পাদুকাচিহ্ন রক্ষিত আছে, রামাৎগণ ভক্তিভরে তাহার পূজা করিয়া থাকে। রামানন্দ স্বামী জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণ সেইরূপই আচার পালন করিয়া আসিতেছেন এবং সর্ব্ববর্ণের মধ্যেই দীক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন।

—:০:—

বৈষ্ণব ও আখড়াধারী সম্প্রদায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কাশী সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয়-ক্ষেত্র, সুতরাং শিবপুরী বারাণসী মধ্যে বৈষ্ণব প্রাধান্যও নিতান্ত কম নহে। গৃহস্থ ও বাবাজী বৈরাগীর সংখ্যা এখানে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী সকল দেশীয় বৈষ্ণব এখানে বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রসিদ্ধ গোপালমন্দির ও অন্যান্য অনেক বৈষ্ণব মঠ বা আখড়ার নিয়মাধীন হইয়া ভজন করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের মূল আখড়া সাতটী। যথা—নির্ব্বাণী, নিরঞ্জনী, অটল, আহ্বান, যুনা, আনন্দ ও বড় আখড়া। কেহ কেহ বলেন, হিন্দুস্থানী বৈষ্ণব-দিগের সাতটী আখড়ার নাম এইরূপ, যথা—নির্ব্বাণী, থাকী, সন্তোষী, নির্ম্মোহী, বলভদ্রী, টাটম্বরী ও দিগ-ম্বরী। বারাণসীবাসী বেণীয়া ও আগরওয়ালা প্রভৃতি জাতিই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। বাঙ্গালী শিক্ষিত বৈষ্ণবের সংখ্যা এখানে তেমন অধিক নাই, তবে বৈরাগী বৈষ্ণবগণ শববহন ও শ্মশান যাত্রাকালে হরি-সংকীর্ত্তন করিবার জন্য অনেকে এখানে চিরস্থায়ী বস-বাস করিতেছেন।

নিমানন্দী নামে বৈষ্ণবদিগের আর এক শাখা এখানে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা

অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের তুলনায় যৎসামান্য বলিতে হইবে। নিম্বাদিত্য নামক এক বৈষ্ণব সাধু ইহার প্রবর্ত্তক। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি ইহাদের উপাস্য এবং শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ।

নিম্বাদিত্য প্রভুর কেশব ভট্ট ও হরিদাস নামে দুই জন প্রধান শিষ্য হইতে বিরক্ত ও গৃহস্থ নামক দুইটী শাখা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। মথুরার সন্নিকট যমুনাতটস্থিত প্রসিদ্ধ ধ্রুবক্ষেত্র নামক পর্ব্বতের উপর নিম্বাদিত্য-আখড়ার গদি প্রতিষ্ঠিত আছে।

কাশীতে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত আরও অনেক উপাসক শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বা বঙ্গদেশীয় চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব বৈরাগীগণও এই সকল শ্রেণীর অন্তর্গত।

গোরক্ষ পন্থী।

ভগবান গোরক্ষনাথের শিষ্য-পরম্পরায় এখানে গোরক্ষ পন্থী নামে একটী উপাসক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় বারাণসীর নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে গোরক্ষনাথের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হইয়াছিল। লোকে গোরক্ষনাথকে শিবের আর একটী অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যাহা হউক

কবিরভক্ত মধ্যে যাহারা প্রধান উদ্যোগী ও কবিরের সাধনমতে অনুপ্রাণিত, তাঁহারাই এই কবির পন্থী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। রামানন্দী বা অন্যান্য বৈষ্ণবদিগের সহিত ইহাঁদের মতের অনেক পার্থক্য থাকিলেও ইহাঁরা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া সাধারণের নিকট সম্মান লাভ করিয়াছেন। বৈষ্ণবোচিত তিলক মালা অনেকেই ধারণ করেন বটে কিন্তু আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপে ইহাঁদের তেমন আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। কবির সাহেবেরও সেইরূপ মত ছিল, তিনি দিবারাত্র একাগ্রমনে ভগবানের ভজন করিতেই ভালবাসিতেন। তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই কারণ হিন্দু মোসলমান সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণে দ্বিধা বোধ করিতেন না। প্রবাদ আছে সন ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে গোরক্ষপুরের অন্তর্গত মঘার গ্রামে তিনি দেহত্যাগ করেন। সে সময় হিন্দু মোসলমান মধ্যে তাঁহার শবদেহের সৎকার উপলক্ষে ঘোর মত বিরোধ উপস্থিত হয়। হিন্দু পক্ষ হইতে দাহ করিবার জন্য এবং মোসলমান পক্ষ হইতে সমাধি দিবার জন্যই এই বিরোধ ঘটে, ক্রমে তাহা লইয়া একটু বাড়াবাড়িতে পরিণত হয়। তখন সহসা কবির সাহেব তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "তোমরা

পরস্পর বৃথা দ্বন্দ্ব করিও না, শবাচ্ছাদিত বস্ত্র উন্মোচন করিয়া দেখ।” অনন্তর তখনই তাঁহার পুনরায় অন্তর্দ্ধান হইল। উভয় পক্ষ সহসা এই ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কিয়ৎপরে শবাচ্ছাদিত বস্ত্র উন্মোচন করিলে দেখা গেল তাহার মধ্যে শব নাই, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি সুন্দর পুষ্পস্তবক পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া উভয় পক্ষের বিরোধ তিরোহিত হইল তাহারা সেই পুষ্পস্তবক বিভাগ করিয়া লইল। হিন্দুগণ সেই অর্দ্ধাংশ পুষ্পস্তবকের যথারীতি দাহ ক্রিয়া সমাধা করিয়া তাহার ভস্মগুলি লইয়া পূর্ব্বোক্ত কবিরচৌরা নামক স্থানে মঠ মধ্যে নিহিত করিলেন। মোসলমানগণ অপরার্দ্ধ পুষ্পস্তবক গোরক্ষপুরস্থিত মঘার গ্রামেই সমাহিত করিয়া তাহার উপর একটী সমাধি স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

কবির সাহেবের ঔরসজাত কোন সন্তানাদি ছিল না, তবে কমাল ও কমালি নামে তাঁহার পালিত দুইটী পুত্র কন্যা ছিল। এক সময় গঙ্গাগর্ভে একটী শবশিশু ভাসিয়া যাইতেছিল, কোন কারণ বশতঃ তাহাকে মনোশক্তি বলে ঘাটে আনয়ন করিয়া জীবিত করেন, পরে তিনিই কবির পুত্র সাধকচূড়ামণি কমাল বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কবি-রের ন্যায় তাঁহারও বহু ভজন পদাবলী আছে।

রামকৃষ্ণকথামৃতের ন্যায় কবির বিরচিত সিদ্ধ পদাবলী বঙ্গভাষায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠে তাঁহার সাধন-বিভূতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কবির-বালক কমালের একটী ভজন-সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

লুম—একতালা।

কবকি ময় ঠাড়ি ঠাড়ি যমুনাকি তিরয়াঁ।
অরজ করত—মরি পার লাগায়ে দে নাওরিয়া॥
গুণি গুনি সব পার উতার গয়ে
ময় নির্গুণ ভই বাবরিয়া॥
রাত আধিয়ারি কারি, বিজলি চমকে ঘেরি
অই তুজে বাদরিয়া।
কহত কমাল কবিরকে বালক
আমবস মরি নাওরিয়া॥

অর্থাৎ আমি কত দিন ধরিয়া ঐ ভব-যমুনার তটে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে নাবিকপ্রবর আমায় পার করিয়া দাও। যাঁহারা গুণী তাঁহারা ত নিজ-গুণেই সকলে পার হইয়া যাইতেছে, হায় আমি যে নির্গুণ, তোমার কৃপা ব্যতীত আমার যে আর অন্য উপায় নাই! ঘনঘোর অন্ধকার রজনী, তাহাতে বিজলি বিকাশ হইয়া নয়ন ঝলসাইয়া দিতেছে, ঐ ঘনঘটা করিয়া বাদল আসিতেছে, তাই কবির বালক

কমাল সভয়ে পুনরায় কহিতেছে হে নাওবিয়া হে ভবপারের কর্ত্তা আমায় পার করিয়া দাও প্রভু!

রাধাবল্লভী সম্প্রদায়।

রাধাবল্লভী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে চাম্পারণ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণী ব্রাহ্মণের সন্তান। বাল্যাবস্থায় ইহাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সাধন ও পুণ্যফলে অল্পকাল মধ্যে সর্ব্ব-বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া ভগবান শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ধর্ম্ম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। ইনি রাধাকৃষ্ণের উপা-সক ছিলেন, সেই কারণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত উপাসক সম্প্রদায় 'রাধাবল্লভী' বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কাশীর প্রসিদ্ধ গোপালমন্দির এই সম্প্রদায়ের অন্ত-র্গত। কাশীর বহু বণিক ও ধনী সম্প্রদায় এই মতাবলম্বী।

প্রভুপাদ বল্লভাচার্য্য কাশীর হনুমানঘাটের নিকট একটী বাটীতে অবস্থান করিয়া সকলকে তাঁহার ধর্ম্ম-মতের উপদেশ প্রদান করিতেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে ৫২ বৎসর বয়সে তাঁহার বৈকুণ্ঠ লাভ হয়।

—:০:—

ভক্ত ছিল। শিষ্যগণের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব স্থাপন দ্বারা স্ব স্ব ধর্ম্মোন্নতি ও সর্ব্বত্র সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি স্থাপনই তাঁহার ধর্ম্মের সার উপদেশ ছিল। তাহার পর তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে ক্রমে যাঁহারা গুরু স্থানীয় হইয়া উঠিলেন তাঁহাদিগের দ্বারা গুরু নানক প্রবর্ত্তিত সেই মূল ধর্ম্মমত সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া কতিপয় উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ই নানকজীকে আদি গুরু এবং তাঁহার উপ-দেশবাণী যাহা গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম পুস্তক এবং গ্রন্থ মহারাজ বলিয়া প্রতি ধর্ম্মমন্দিরে ভক্তি-সহকারে পূজিত হইয়া থাকে।

কাশীতে নানক-সম্প্রদায়ের প্রভাব নিতান্ত মন্দ নহে। এখানে অনেকগুলি নানক পন্থী মঠ বা আখড়া প্রতিষ্ঠিত আছে। অসিঘাট, কুরুক্ষেত্র, লকসা, মিরঘাট ও চোউক প্রভৃতি স্থলে ইহাঁদের ধর্ম্মশালা ও মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কাশীর আদি ও শেষ মঠ বিশ্বেশ্বরগঞ্জের নিকট অবস্থিত। অধুনা কচুরীগলিতেও একটী নূতন ধর্ম্মশালা হইয়াছে। এই সকল স্থানে বহু নানক পন্থী সাধু অবস্থান করিয়া সংস্কৃত বিদ্যা ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। কাশীতে থাকিয়া এইরূপ শাস্ত্রালোচনার জন্যই এখানে এত শিখমঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অঘোর পন্থী।

প্রথমেই উক্ত হইয়াছে জগতের সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই আর্য্যঋষি প্রবর্ত্তিত সেই আদি ধর্ম্ম মতের রূপান্তর মাত্র। বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ ও দর্শন-বিজ্ঞান যাহার ক্রিয়া সিদ্ধাংশ (Practical portion) উপাসনা বিধি বা তন্ত্রনির্দ্দিষ্ট যোগ প্রক্রিয়ার কোন কোন অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম মতের সৃষ্টি হইয়াছে, অঘোর পন্থীও সেই ঋষি প্রবর্ত্তিত নবধা কুলাচারের অন্তর্গত একটী আচার মাত্র কিন্তু শিক্ষার দোষে কালে তাহা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছে। আর্য্যের উপাসনা বিধির নববিধ আচার যাহা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, অঘোরাচার, যোগাচার, সিদ্ধাচার বা জীবন্মুক্ত কোল পরমহংসাচার বলিয়া পরিচিত। অঘোরাচার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহারই অন্তর্গত। মদ্য মাংসাদির সেবা, শ্মশানবাস ও শোক, তাপ লজ্জা, ঘৃণাদি বর্জ্জিত নানাবিধ কুৎসিৎ ক্রিয়া ইহাদের ধর্ম্মাঙ্গ যাঁহার ঘোর কাটিয়াছে তিনিই অঘোর। সুতরাং সংসারের সকল ঘোর বিনাশ করিবার জন্যই এই আচার অবলম্বন করিতে হয়। "পাশবদ্ধ ভবেৎ জীব পাশ মুক্ত ভবেৎ শিব।" এই মহাবাক্যের স্বার্থক-

তার জন্য অঘোরাচারের অবলম্বন করিতে হয়, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কালের গতিকে শিক্ষার অভাবে তাহা বিকৃত ও জঘন্য হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক কাশীতে অঘোরাচারী সাধক অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অঘোরী বাবা এই সম্প্রদায়েরই একটী সিদ্ধ সাধক। ইহাঁরা শিবোপাসক জটাজুট ও অস্থি-মালা প্রভৃতি ধারণ করিয়া শ্মশানেই বাস করিয়া থাকেন।

আর্য্য সমাজ।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রবর্ত্তিত একটী নূতন উপাসক সম্প্রদায় কাশীর মধ্যে ধীরে ধীরে বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। ইহাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের ধরণে একেশ্বরবাদী, তবে বৈদিক ক্রিয়াকলাপে বিশ্বাসী এবং বৈদিক যজ্ঞ ও হোমাদি ক্রিয়ার পক্ষ-পাতী। রাজা রামমোহন প্রবর্ত্তিত ব্রাহ্মসমাজ যেমন কালে ত্রিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আর্য্য-সমাজিদিগের মধ্যেও সে ভাবের সূত্রপাত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। হয়ত কালে আদি আর্য্যসমাজ, সাধারণ আর্য্যসমাজ ও নববিধান আর্য্য সমাজের সৃষ্টি হইবে যাহা হউক এই সমাজের কার্য্য এখনও বেশ

ধীর ভাবে পরিচালিত হইতেছে। কাশীতে এই আর্য্য সমাজের একটী সভাগৃহ সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকাংশ পঞ্জাবী ক্ষেত্রী ও কতিপয় হিন্দুস্থানী কায়স্থ কাশীতে এই সমাজের প্রধান পরিচালক।

রাধাস্বামী সম্প্রদায়।

আর্য্য সমাজের ন্যায় ইহা আরও নূতন আর একটী উপাসক সম্প্রদায়। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে আগ্রার শিবদয়াল সিং নামক জনৈক উচ্চ ইংরাজী শিক্ষিত প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী হুজুর সাহেব কোন সিদ্ধ গুরুর উপদেশ ক্রমে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই এই রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। কাশীর বিখ্যাত ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত পণ্ডিত ব্রহ্মাশঙ্কর মিশ্র তাঁহার জীবনব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা এই নূতন মতের প্রচার ও উন্নতি করেন। তিনি মাধো দাসের উদ্যান বাটীতে অবস্থান করিয়া রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের জন্য একটী উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ করাইতে ছিলেন ও সতত পরিশ্রম করিয়া নানা বিষয়ে ইহার উন্নতি করিতেছিলেন। কিন্তু সহসা অকালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় অন্যান্য ব্যক্তির যত্নে

ইহার ক্রমেই প্রচার ও যথেষ্ট উন্নতি হইতেছে। ইহারাও কতকটা একেশ্বরবাদী ও ভক্তিমার্গের উপাসক।

কতিপয় অপ্রসিদ্ধ সম্প্রদায়।

যে সকল উপাসকমণ্ডলীর কথা ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত আরও কতকগুলি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব এখনও কাশীতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে গুলির বিস্তৃত বিবরণের পরিবর্ত্তে সংক্ষেপে তাহাদের নামোল্লেখ করিতেছি মাত্র।

সুরদাসী, রুইদাসী, সুখরাসাহী, নাগা, দাসুপন্থী, শিবনারায়ণী, ব্রাহ্মসমাজী ও ফকির প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ভুক্ত উপাসক এখানে বাস করিয়া আপন আপন অধিকার অনুসারে ভজন সাধন করিয়া থাকেন। ইহাদের সকলেই বিরাট হিন্দুসমাজের অন্তর্গত, ভারতেই ইহাদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মোসলমান ও ইংরাজ আধিপত্য সময়ে, তাহাদের উভয় ধর্ম্মমত প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কাশীতেও মোসলমান ও খৃষ্টান উপাসকের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি হইয়াছে। নানা স্থানে তাঁহাদের ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া মনে

হয়, পবিত্র বারাণসী-তীর্থ যথার্থই জগতের সমগ্র ধর্ম্মের একটী সমন্বয়-ক্ষেত্র

—:০:—

কাশীর সমাজ, সত্র ও মহাত্মগণ।

কাশীর উপাসক-সম্প্রদায় লইয়াই কাশীর বিরাট সমাজ। কাশীতে নাই এমন জাতি নাই। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সেই বৈদিকাচারি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ হইতে আজ পর্য্যন্ত জগতে যত বিধ উপাসক-শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে, সমস্তই যেন কাশীতে জীবন্তভাবে বর্ত্তমান। তবে 'কাশীর সমাজ' বলিয়া স্বতন্ত্র ভাবে লিখিবার কি আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে "কাশীর সমাজ" বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা প্রকৃতই অদ্ভুত ও অনন্ত। এখানের এক বাঙ্গালীসমাজ ধরিলেই একখানি স্বতন্ত্র বিরাট গ্রন্থ লিখিতে পারা যায়, সুতরাং এরূপ গ্রন্থে তাহার বিশদ ব্যাখ্যা বস্তুতঃই অসম্ভব। সেই কারণ অতি সংক্ষেপে দুই চারি কথায় তাহার আভাষ দিব মাত্র। পরকুৎসা মহাপাপ, কিন্তু আত্মকুৎসার কারণ অবগত হইলে, কালে আত্মোন্নতি হওয়া অসম্ভব নহে। এই হেতু কেবল আমাদের বাঙ্গালী সমাজেরই দুই একটী বিষয় এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

সকল সমাজ বা সকল বিষয়েরই সৎ-অসৎ দুই দিক আছে। সুতরাং এ সমাজের পক্ষেও তাহা

স্বাভাবিক। এ সমাজ কাশীর মধ্যে যত কিছু সৎকার্য্য করিয়াছে, অসৎকার্য্য তাহার অনুপাতে অত্যুজ্জ্বল আলোকের পার্শ্বে ঘন ঘোর অন্ধকারের ন্যায় অনুভূত হইবে। মোসলমান আধিপত্য সময়ে কাশী-বিধ্বস্থ হইবার পর, বঙ্গের শেষ বীর 'প্রতাপাদিত্য' ও অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরী 'রাণী ভবানী' প্রভৃতি হইতে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গের কত মহারাজ, কত রাজা, জমিদার এমন কি অনেক গৃহস্থ পর্য্যন্তও কাশীর পবিত্র ক্ষেত্রে কত শত-সহস্র পুণ্য-কীর্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার হিসাব করা বস্তুতঃই অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মন্দির, মঠ ও সত্র বা ছত্র সমূহের আধুনিক অবস্থা দেখিলে বিস্মিত ও মর্ম্মাহত না হইয়া থাকা যায় না। তাঁহারা যে সদুদ্দেশ্যে এই মহা পুণ্যময় কীর্ত্তিগুলি চিরস্থায়ী করিবার জন্য বিপুল অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার রক্ষাকর্ত্তারূপে যে সকল কর্ম্মচারি বা অধ্যক্ষ অধুনা এ স্থলে নিযুক্ত আছেন, কেবল তাঁহাদের স্বার্থপরতার ফলে বাঙ্গালী সমাজের যে ভীষণ অনিষ্ট হইতেছে, আশ্চর্য্যের বিষয় সে বিষয়ে কেহই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না।

এই সকল সত্রের নিয়ম, কাশীবাসী দীন দরিদ্র অনাহুত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ কুমার মধ্যাহ্নে এই স্থানে আহার করিতে পারিবে। কিন্তু ফলে

তাহার ভিন্নরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহারা নিত্য এই স্থানে আহার করে, তাহাদের অবস্থা ও ব্যবহার দেখিলে সকলের হৃদয়েই বিষাদ ও ঘৃণার ভাব জাগিয়া উঠে। প্রকৃত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের স্থান এখানে প্রায় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে কতকগুলি অকাল-কুষ্মাণ্ড বা বলীবর্দ্দ-সদৃশ অধিকাংশ গুণ্ডার দল এখানে পুষ্ট হইতেছে মাত্র। আবার তাহাদের ব্যবহারও এত জঘন্য যে, সে সকলের উল্লেখ করিয়া লেখনী কলুষিত করিতেও ঘৃণা হয়।

পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই জানেন "কেশেল" বলিয়া একটী শব্দ এখানে প্রচলিত আছে, তাহার মূল অন্বেষণ করিলে, যাহা জানিতে পারা যায়, তাহা কাশীবাসী বাঙ্গালী সমাজের যে ঘোর কলঙ্কের কথা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কাশী যে মুক্তিক্ষেত্র, তাহা বোধ হয় এই শ্রেণীর পক্ষেই প্রত্যক্ষ বলিতে পারা যায়।

বাঙ্গালী বলিয়া নহে, ভারতের হিন্দু নামধারী যে কোন জাতির স্ত্রী কোনরূপ ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হইলে, তাহাদের অনেকেই সেই সেই সমাজকর্ত্তৃক এক-কালিন্ বিতাড়িতা হইয়া রাজদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত দ্বীপান্তর-বাসীর ন্যায় চিরদিনের মত কাশীতে নির্ব্বাসিতা হইয়া থাকে। কেহ বা তাহার ফলে আত্মদোষ বুঝিতে

পারিয়া অনুশোচনায় তাহার অবশিষ্ট জীবন সৎভাবে অতিবাহিত করে, কিন্তু অধিকাংশই তাহাদের সেই পাপকালিমা সঙ্গের সাথী করিয়া মিথ্যা সতীত্বের আবরণে চির-সধবারূপে কাশীতে পিশাচীবৎ বিচরণ করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত সত্রে অন্যের আহার পাইবার বিশেষ সুবিধা নাই, সুতরাং কাশীতে আসিয়া দুর্ব্বিপাকবশতঃ অনেকেই এমন কি নীচ শূদ্রও বাজার হইতে বিলাতি সূতা ক্রয় করিয়া গলায় ধারণ করে ও ব্রাহ্মণ বলিয়া সত্রের স্মরণাপন্ন হয়। ইহা অভ্রান্ত সত্য, এরূপ ঘটনা সামান্য অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত চিরসধবারূপঃ হিন্দু-স্ত্রী-জাতির ভীষণ কলঙ্ক-প্রতিমাগুলির সহায়ক বা তাহাদের সর্ব্বনাশ-কর্ত্তারা ধোপা, নাপিত বা যে জাতিই হউক না কেন, সহজে ব্রাহ্মণের পরিচয়ে এখানে পরিচিত হইয়া থাকে ; সুতরাং সত্রে তাহাদের স্থান তখন সহজলভ্য হইয়া পড়ে। 'কর্ত্তারা' যখন ব্রাহ্মণ হইতে পারিলেন, 'গিন্নীরা' তখন ভিন্ন জাতীয়া বলিয়া আর কেন পরিচয় দিবেন? বিশেষ ব্রাহ্মণী-পরিচয়ে তাহাদেরও লাভ আছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গালায় 'বিধবা-বিবাহের' জন্য যে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার প্রচার ও প্রচলনোদ্দেশ্যে প্রাণপণ করিয়াছিলেন, এখানে ইহাদের অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, তিনি

বৃথা এ জাতির বিধবাদিগের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। যাহা বিধিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ্যভাবে এ দেশে প্রচলন করা দুঃসাধ্য, তাহাই অতি সহজে বা অলক্ষ্যে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে বাধা দিবার শক্তি বুঝি কাহারও নাই। পাগলকে "সাঁকো নাড়িও না" বলিলেই মুস্কিল, নতুবা অসঙ্কোচে চলিয়া যাও, পাগল তাহার আপন ভাবেই বিভোর হইয়া থাকিবে। আমাদের হিন্দুসমাজের ঠিক সেই পাগলের ভাব হইয়াছে। সদসৎ কোন কিছু করিবার ইচ্ছা থাকে, অবিচলিত চিত্তে করিয়া যাও, কেহ কোন কথা বলিবে না, কিন্তু যদি তুমি নিজ উদারতা দেখাইয়া "পাঁচে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ" এই প্রবচনের স্বার্থকতা করিতে চাও, যুক্তি দেখাইয়া কাজ করিতে যাও, অমনি অসংখ্য অযাচিত প্রতিবাদে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলিবে, তুমি বিফল-মনোরথ হইবে। কাশীর এই বীভৎস সমাজই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেমন ইহারা স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় কাশীবাস করিতেছে, যেন কোন ভাবনা চিন্তাই নাই। কর্ত্তা সত্রে আহার করেন, আত্মপ্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে সর্ব্বদা সৎলোকের কুৎসা যেন মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। একজন নবাগত যথার্থ ব্রাহ্মণসন্তান আসিলেও তাহাদের পীড়নে তাঁহাকে স্বতন্ত্র স্থানে অতি

হীনভাবে সত্রে ভোজন করিতে হইবে। উপর্য্যুপরি ব্রাহ্মণের পরিচয়-প্রশ্নে তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে। তখন তাহাদের ‘চোট্ পাট্’ কথা শুনিলে মনে হয়, সত্রগুলি বুঝি ইহাদেরই চিরস্থায়ী অধিকৃত। এমন কি সত্রের অধ্যক্ষও তাহাদের আচরণে বাধা দিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। তাহার কারণ এই সকল দুর্দ্দান্ত লোক তাঁহাদের সহায় থাকিলে অনেক বিষয়ে তাঁহাদের লাভ আছে। আহারান্তে নিদ্রা ও দাবা-পাশা খেলিয়া ইহারা দিনাতিপাত করে, সুবিধা মত যাত্রীদিগের দালালি করিয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতেও বিরত হয় না। স্ত্রীলোকগণ বড় লোকের বাড়ী রন্ধন ও যাত্রীদিগের নিকট ‘সধবা’ বলিয়া পূজা প্রাপ্ত হয়। ইহাদের অধিক সংখ্যক পুত্র কন্যা হইলেও বিশেষ চিন্তা নাই। পুত্র, বড় হইতে না হইতে অষ্টম বর্ষে তাহাদের উপবীত হইয়া যায়, তাহা হইলেই বংশানুক্রমে তাহাদের সত্রে অধিকার জন্মে, আর কন্যা, কুমারীরূপে অনেকদিন যাত্রীদিগের পূজা গ্রহণ করিতে থাকে। পুত্র কন্যা বড় হইলে প্রথম প্রথম সমশ্রেণীর মধ্যেই বিবাহাদি হইয়া থাকে। কাহারও কাহারও অবস্থা সামান্য উন্নত হইলে, পুত্র সভ্য ও শিক্ষিত হইলে, কন্যাদায়গ্রস্ত প্রবাসী ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যে সহজেই মিলিয়া যায়। যতদিন তাহারা

প্রকৃত ব্রাহ্মণবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারে, ততদিন তাহারা "কেশেল" বলিয়া সামান্য হেয় হইয়া থাকে, কিন্তু সামাজিক সকল নিয়ম তখন বর্ণে বর্ণে তাহারা মান্য করিয়া অতি সাবধানে দিনাতিপাত করে। পরে তাহারাও অনেককে "কেশেল" বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা করিয়া নিজেদের নির্দ্দোষ প্রমাণ করে। এই জন্যই বলিতে হয়, 'কাশী' প্রকৃত ইহাদেরই প্রত্যক্ষ মুক্তিক্ষেত্র।

গৃহীর ন্যায় দণ্ডী, সাধু ও সন্ন্যাসী-শ্রেণীর মধ্যেও এই ভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সে সকল প্রত্যক্ষ কুৎসিৎ ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। ইহাতেই বোধ হয় কাশীর সমাজ সম্বন্ধে পাঠকের কতকটা জ্ঞান হইবে। এ সম্বন্ধে ইতি-পূর্ব্বে 'শীতলাঘাট' প্রসঙ্গেও কিছু কিছু বলা হইয়াছে।

সত্রের মধ্যে বা দণ্ডী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে যে ভাল লোক আদৌ নাই, তাহা নহে; তবে এই সকল ভণ্ডের মধ্য হইতে সৎ লোক বাছিয়া লওয়া নিতান্তই কঠিন ব্যাপার।

কাশীর মহাত্মগণ সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অংশে অনেকের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কবীর, তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতি কাশীতেই তাঁহাদের শিবত্ব লাভ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থেও

তাঁহাদের বিস্তৃত জীবন-চরিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কারণ এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ সঙ্গত বিবেচনা করি না। অধুনা কোন্ কোন্ মহাত্মা কাশীতে অবস্থান করিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। তবে অনেক মহাত্মা যে, গুপ্ত-ভাবে এখনও এখানে বিরাজ করিতেছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।



রামনগর ও ব্যাসকাশী।

কাশীর পরপারে বা গঙ্গার পূর্ব্বতটে বেনারস-মহারাজের ফোর্ট বা দুর্গান্তর্গত প্রকাণ্ড প্রাসাদ, ইহাও কাশী-দর্শনার্থীর অবশ্য দর্শনীয়। গঙ্গার উপরেই সেই বিরাট-দৃশ্য সৌধ যখন অস্তগত সূর্য্যের কনক-নিন্দিত রক্তিম-কিরণরাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন মনে হয়, বিশ্বেশ্বরের সুবর্ণ-মন্দিরের ন্যায় এ রাজ-অট্টালিকাও বুঝি আমূল অকলঙ্ক সোণার স্তবকে মণ্ডিত। পশ্চাতে দিগন্তব্যাপী উন্মুক্ত আকাশের কোলে বিশাল বিন্ধ্যাচল যেন এক খানি অচঞ্চল নীলাভ জলদরেখার ন্যায় সততই সেই চিত্রোপম প্রাসাদের তল-পৃষ্ঠসম প্রতীয়মান হইতে থাকে। আবার যখন সেই সুমনোহর দৃশ্য গঙ্গার স্বচ্ছ সলিল-গর্ভে প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা যায়, তখন তাহার সৌন্দর্য্য আরও কতগুণে যে বর্দ্ধিত হয়, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিবার প্রয়াস বিড়ম্বনা মাত্র। নৌকা হইতে সে দৃশ্য দেখিতে দেখিতে দর্শকের চিত্ত বিমোহিত হইয়া যায়, ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইলে সে সৌধশোভা আরও স্পষ্টতর হইয়া উঠে। গঙ্গা-সলিলধৌত সেই সোপান-পাদ প্রাসাদে উপস্থিত হইলে, প্রথমেই দুর্গ-

দ্বারের পার্শ্বে মর্ম্মর-খোদিত মকরবাহিনী গঙ্গাদেবীর একটী সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে আরও কত দেবমূর্ত্তি সেই প্রস্তর প্রাচীর-মধ্যে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলেই প্রথমে ব্যাসেশ্বরের প্রস্তর-নির্ম্মিত শিবালয় নয়নগোচর হয়। শিবালয়-মধ্যে শ্রীমন্মহর্ষি ব্যাসদেবের এক খানি প্রকাণ্ড তৈল-চিত্র বিলম্বিত আছে। প্রাসাদমধ্যে রাজসভা বা দরবার-গৃহ সুন্দররূপে সজ্জিত, প্রাচীন মহারাজগণের ও বৃটীশ-রাজপ্রতিনিধি প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর চিত্র তাহাতে রক্ষিত আছে। হস্তিদন্ত ও মণিরত্ন-খচিত বিবিধ শোভনীয় সামগ্রী প্রাসাদের নানাস্থানে বিচিত্র-ভাবে সজ্জিত।

মহারাজের এই প্রাসাদ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা বলবন্ত সিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাশীনরেশদিগের প্রাচীন রাজধানী ও দুর্গ বরুণার নিকট ছিল। রাজা বলবন্ত হইতেই এই স্থানে নূতন বেনারস-মহারাজদিগের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমান্ প্রভু নারায়ণ সিংহ একজন স্বধর্ম্ম-পরায়ণ, সুপণ্ডিত, গুণগ্রাহী ও ভাগ্যবান পুরুষ। বৃটীশ-গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অর্দ্ধ স্বাধীনতা বা সামন্ত-রাজ-সম্মানে ইনি সম্মানিত

হইয়াছেন। রামনগরের মধ্যে তাঁহার নিজস্ব সৈন্য-সামন্ত, বিচারালয়, কোতোয়ালি, হস্তিশালা ও অশ্ব-শালা প্রভৃতি স্বাধীনরাজ্যসুলভ সমস্তই বিদ্যমান আছে। যে কোন বিশিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারীর অনুমতি লইলে এ সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাসাদের অনতিদূরে মহারাজের সুন্দর কানন-সমন্বিত সরোবরতীরে 'সুমেরু' মন্দির। মন্দির-গাত্রে প্রস্তরখোদিত নানা দেব দেবীর ও বিবিধ জীব জন্তুর বিচিত্র মূর্ত্তি শোভিত রহিয়াছে। মন্দিরটী দেখিবার জিনিস। প্রতি বৎসর পূজার সময় এখানে মহা সমারোহে রামলীলা হইয়া থাকে। বহু দূর হইতে হাজার হাজার লোক তাহা দেখিতে আইসে। মহা-রাজের 'সরস্বতী ভাণ্ডার' নামে একটী লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার আছে, তাহাতে বহুমূল্যবান বিবিধ গ্রন্থনিচয় রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে এক লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের এক খানি তুলসীদাসের রামায়ণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ভূতপূর্ব্ব মহারাজের যত্নে ও অর্থব্যয়ে তাহা প্রস্তুত হইয়াছিল।

সাধারণে রামনগরকে ব্যাসকাশী বলিয়া উল্লেখ করেন। কথিত আছে, মহর্ষি ব্যাস তদানীন্তন মুনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া কাশীর পর পারে এই স্থানে আসিয়া নিজ আসন স্থাপন করিয়া

নূতন কাশীর প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। সেই কারণ লোকে এখনও ইহাকে ব্যাসকাশী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ এখানে এখনও বিদ্যমান আছে। অনেকে তাহা দর্শন করিতে যান। রামনগর হইতে অথবা রাজঘাটের লৌহ-সেতু অতিক্রম করতঃ এক্কা করিয়া তথায় যাওয়াই সুবিধাজনক। অনেকে দশাশ্বমেধঘাট হইতে নৌকা করিয়া পার হইয়া চড়ার উপর দিয়া সোজা পূর্ব্বদিকে ব্যাসকাশীর আদি স্থান দেখিয়া আইসেন। মাঘ মাসে ব্যাসকাশীর মেলা হইয়া থাকে। কাশীবাসী জন-সাধারণ সকলেই তখন পর পারে মেলা দেখিতে যান। এই স্থানে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশ্রম আছে, তাহাতে কতিপয় শান্তিপ্রিয় দণ্ডী সাধু অবস্থান করিয়া স্ব স্ব সাধন ভজন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের দেখিলে সহজেই বেশ ভক্তি-ভাবের উদয় হয়।



পরিশিষ্ট।

কাশী যেন ক্ষুদ্রায়তনে নূতন কলিকাতা! তাই বুঝি বিলাস-মুগ্ধ বাঙ্গালী বাবুদিগের আজ কাল এত আদরের স্থানে ইহা পরিণত হইয়াছে। এখানে দিন দিন যেরূপ বাঙ্গালীর বসতি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, বিশ পঁচিশ বৎসর পরে কাশী যেন বাঙ্গলা-দেশেরই একটী নূতন সহররূপে প্রতীয়মান হইবে।

এখানে নাই এমন জিনিস নাই—বিদ্যা, বিলাস, বাণিজ্য ও বৈভব তাহার উপর হিন্দুর শেষ আকাঙ্ক্ষার বস্তু বিশ্বনাথ-মণিকর্ণিকা ত আছেই, এখন এখানে যাহা অন্বেষণ করিবে, তাহাই যে সহজলভ্য! বাস্তবিক বাঙ্গালা-দেশের বাহিরে এমন মনোরম স্থান আর নাই। পূর্ব্বে ছিল, ইহা সাধু-সজ্জন-সেবিত আনন্দ-কানন 'কাশী'—এখন হইয়াছে, বিলাসরম্য অপূর্ব্ব সহর 'বারাণসী'। ইংরাজের আনুকূল্যে ও সহরবাসীর চেষ্টায় ভাব ও বৈচিত্রে ইহা যথেষ্টরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখানে টাউনহল, পার্ক, কলেজ, হাঁসপাতাল, চক, বাজার সমস্তই বিদ্যমান। কাশীর মন্দির ও ঘাট সমূহের বিস্তৃত বর্ণনা ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে এই সকলের যথাসম্ভব উল্লেখ করিয়া ইহার উপসংহার করিব।

টাউনহল।—টাউনহলের বিষয় পূর্ব্বে স্থানে স্থানে উক্ত হইয়াছে। ইহা কালভৈরব মহাল্লার নিকট অবস্থিত। ভূতপূর্ব্ব বিজনাগ্রাম-মহারাজ এই হল নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া সাধারণকে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ যেমন গুণগ্রাহী, তেমনই সদাশয় ছিলেন। তিনি কাশীর উন্নতিকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। দুর্গাবাড়ীর নিকট তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। টাউনহলের এক পার্শ্বে স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে অনারারি মেজিষ্ট্রেটের কোর্ট বা 'আঁধেরী কাছারির' কার্য্য হয়।

মিউনিসিপ্যাল গার্ডেন।—কেহ কেহ ইহাকে এলফ্রেড পার্ক বলিয়াও উল্লেখ করেন। বাগানটী আমাদের কলিকাতার লালদীঘির অনুরূপ সুন্দর-ভাবে সজ্জিত। সাধারণের বায়ু সেবন জন্য বিস্তৃত পথও আছে।

নাগরি-প্রচারিণী সভা।—এই বাগানের পূর্ব্ব কোণে 'নাগরি-প্রচারিণী-সভার' বিস্তৃত হল ও লাইব্রেরী আছে। কলিকাতার 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের' ধরণে ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। ইহার সম্মুখেই বা উক্ত টাউনহলের পূর্ব্বদিকে বেনারসের প্রধান তার-ঘর বা টেলিগ্রাফ আফিস ও প্রধান পুলিশ-আফিস বা কোতোয়ালি অবস্থিত।

প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স্‌ হাঁসপাতাল। সম্রাট ৭ম এডওয়ার্ড যখন প্রিন্স-অফ-ওয়েল্‌স্‌ রূপে কাশী দর্শন করেন, তখনই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ 'কবিরচৌরা' নামক মহাল্লায় ইহা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্থানে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ইহার সঙ্গেই 'লেডি ডফ্‌রিণ জেনানা হাঁসপাতাল' অবস্থিত। এখানে স্ত্রীলোকদিগের চিকিৎসা হইয়া থাকে। মিউনিসিপ্যাল আফিস বা 'চুঙ্গি-কাছারি'ও ইহার নিকটে। তদ্ব্যতীত খৃষ্টানদিগের 'জেনানা-মিসন' প্রভৃতি অনেক বড় বড় বাড়ী এই স্থানেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

কুইন্স কলেজ।—কাশীর এই 'কুইন্স কলেজ' বা গবর্ণমেন্ট-কলেজ-অট্টালিকাটী আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের একটী চরম আদর্শ। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু তাহার বহুদিন পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ স্থপতি মেজর 'কিটো' মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১২৭০০০৲ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার মধ্যে একটী সমুচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভ দণ্ডায়মান আছে। কেহ বলেন ইহা অশোকস্তম্ভ, কেহ বা ৪র্থ শতাব্দীর গুপ্ত-রাজাদিগের নির্ম্মিত স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করেন। স্তম্ভের গাত্রে প্রাচীন অক্ষরে কত কি লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত কলেজে একটী সূর্য্য-ঘড়ি ও সারনাথ প্রভৃতি স্থান

হইতে আনীত বহু প্রস্তর খোদিত প্রতিমূর্ত্তি এখানে রক্ষিত আছে।

মহারাজকা কোঠী বা নাদেশ্বর কোঠী।—ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকট মহারাজ বেনারসের সুসজ্জিত প্রকাণ্ড সহর-প্রাসাদ। এখানে রাজ-প্রতিনিধি প্রভৃতি আসিলে অবস্থান করিয়া থাকেন। নিকটেই মহারাজের মিণ্ট-হাউস, পূর্ব্বে কোন কালে তথায় মিণ্ট ছিল শুনিতে পাওয়া যায়, পরে গেষ্ট-হাউসে পরিণত হয়। অনন্তর বেনারসের কুমার-সাহেবের সহর-আবাসরূপে তাহা পরিণত হইয়াছে।

ভিক্টোরিয়া পার্ক।—ইহা সাধারণতঃ 'বেণীয়া পার্ক' বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভূতপূর্ব্ব ভারত-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি রক্ষার্থে কাশীর সাধারণ অধিবাসীবৃন্দ এই পার্কটীর সম্প্রতি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। উদ্যান মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্ম্মরপ্রস্তর-নির্ম্মিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। দশাশ্বমেধঘাট রোড বা বাঙ্গালী টোলার নিকটবর্ত্তী বলিয়া বাঙ্গালিদিগের ইহা একটী চমৎকার বায়ুসেবনের স্থান হইয়াছে।

এই সকল ব্যতীত বাঙ্গালি টোলার 'বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজ,' 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের' শাখা-সভা ও পাঠাগার, 'কারমাইকেল লাইব্রেরী' প্রভৃতি সাধারণের দেখিবার ও শুনিবার অনেক বস্তু আছে।

কাশীর বাণিজ্য ও বাজার।—এ সম্বন্ধেও এ স্থলে কিছু বলা আবশ্যক। সর্ব্ব প্রথমেই 'দশাশ্বমেধের বাজার' উল্লেখযোগ্য। কারণ, বাঙ্গালীটোলার সম্মুখে বিশেষ বাঙ্গালীদের আবশ্যকীয় সকল প্রকার সামগ্রীই এখানে পাওয়া যায়। চাল, ডাল, তরি তরকারি, মাছ, মাংস, দুধ, ঘি, কাপড় চোপর, কাগজ, কলম, খেলেনা, এমন কি সকল প্রকার স্বদেশী দ্রব্য সমস্তই এখানে পাওয়া যায়। ডাক্তার, বৈদ্য, ঔষধ তাহাও এখানে অনায়াসলভ্য। বিশ্বনাথের গলিতে খেলেনা ও বাসন আদি যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয়। কাশীর নানা স্থানে খাবারের দোকান আছে, তবে বিশ্বনাথ মন্দিরের উত্তরে 'কচুরি-গলির' খাবারই প্রসিদ্ধ, এখানে সকল রকম খাবার চাটনি ও মেওয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। এই কচুরি-গলির পশ্চিমদিকে বিস্তৃত রাজপথের উপর 'চক্-বাজার' এখানেও নানাবিধ মনোহারি জিনিস পত্র পাওয়া যায়। তাহারও পশ্চিমে 'দাল কমণ্ডীর' রাস্তা ও 'নারিয়েলটোলা' রাস্তা। এখানে তামাক, সুরতি, নস্য, হুঁকা ও আরও কিয়দ্দূর পশ্চিমে কাচের জিনিস পত্র যথেষ্ট বিক্রয় হয়। কচুরিগলি বা উক্ত চক্-বাজারের পূর্ব্বদিকে 'লক্ষ্মী-চৌতারা' ও রাণীকুঁয়া প্রভৃতি স্থানে বেনারসী সাড়ী দোপাট্টার আড়ৎ। কিন্তু এ সকল স্থানে নিজে

কোন দ্রব্য খরিদ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চতুর্দ্দিকে এত প্রচ্ছন্ন হিন্দুস্থানী দালাল ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে যে, কোন খরিদ্দারই তাহা ঠিক বুঝিতে পারে না। তাহারা খরিদ্দার বা দোকানদারকে মুখ ফুটিয়া কোন কথাই বলে না, অথচ কেহ কোন দ্রব্য খরিদ করিলেই তাহাদের নির্দ্দিষ্ট দালালি রক্ষিত হইবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে সময় ও অবস্থা বোধে কখন কখন খরিদ্দারকে এক টাকার জিনিস পাঁচ সিকায়, দেড় টাকাতে বা তাহার দ্বিগুণ মূল্যেও খরিদ করিতে হয়। সুতরাং কাশীবাসী কোন পরিচিতের দ্বারা বা কাশীর প্রসিদ্ধ ও একমাত্র স্বদেশী দ্রব্যের দোকান "স্বদেশী-সম্মিলনী" বা "বেনারস আর্ট এণ্ড কিউরিয়সের" সহায়তায় সকল জিনিস ক্রয় করাই সুবিধাজনক। তাহাতে কাহাকেও ঠকিতে হইবে না।

উক্ত চকের আরও উত্তরে যাইলে 'ঠাটেরী বাজার'। এখানে পিতল, কাঁসা ও জর্ম্মন-সিলভারের নির্ম্মিত বাসনের বাজার। কাশী, ধাতুশিল্প ও বেনারসী-সাড়ী প্রভৃতির জন্যও প্রসিদ্ধ। দেওয়ালীর সময় এখানে বাসনের প্রদর্শনী হয়।

এতদ্ব্যতীত 'বিশ্বেশ্বরগঞ্জ,' 'দীননাথের গোলা' ও 'চেৎগঞ্জ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কেণ্টনমেণ্টের নিকটেও

অনেক বড় বড় দোকান আছে। তাহাতে ইংরাজ-পছন্দ বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় হয়।

কাশীর মেলা।—কাশীতে 'বার মাসে তের পার্ব্বণ' বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়, কাশীতে ৩৬৫ দিনে বোধ হয় সহস্রাধিক মেলা হয়। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও দুই একটী মেলা লাগিয়াই আছে। দলে দলে হিন্দুস্থানী মেয়ে ছেলে সেই দিকে মেলা দেখিতে যাইতেছে। তবে এই সকলের মধ্যে রামলীলা, দশমীর বিজয়োৎসব বা দুর্গা প্রতিমা বিসর্জ্জন, বুঢ়ুয়া-মঙ্গল, কাজেরী, নৃসিংহ চৌথ, লক্ষ্মীকুণ্ড, লোটাভাণ্টা, হোলী, দেওয়ালি বা দীপালি ও শিবরাত্রি প্রভৃতিই প্রধান। গ্রহণ উপলক্ষেও কাশীতে বিরাট মেলা হইয়া থাকে। সে জনসংঙ্ঘ বাস্তবিক অদ্ভুত!

কাশী দর্শনে ব্যয়।—কলিকাতা হইতে কাশী ষ্টেশন বা বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশন পর্য্যন্ত তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৪৷৷০, মধ্যম শ্রেণী ৭৷৷০ ও দ্বিতীয় শ্রেণী ১৮।/০ পূজার সময়ও কখন কখন অন্যান্য বিশেষ কারণে মধ্যম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য রেল কোম্পানী কর্ত্তৃক যাতায়াতের অল্প ভাড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অনেকে সেই অবসরেই কাশী দর্শনে বহির্গত হন।

কাশীতে দুইটী ষ্টেশন আছে, কাশী ও বেনারস ক্যাণ্টনমেণ্ট। কাশী অপেক্ষা ক্যাণ্টনমেণ্ট ষ্টেশনেই নামা উঠায় সাধারণের সুবিধা অধিক, কারণ এখানে গাড়ী অপেক্ষাকৃত অধিকক্ষণ দাঁড়ায়। যাহাদের সঙ্গে বেশী লোকজন অথবা অধিক জিনিস পত্র নাই, তাঁহারা কাশীতেই নামিতে পারেন।

ষ্টেশন হইতে সহরের ঘোড়ারগাড়ি ভাড়া ॥০ আনা হইতে ৸০ বার আনা পর্য্যন্ত। কিন্তু, অধিক যাত্রীর সমাগম হইলে, কখন কখন ১৷৷০ টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে।

একা ভাড়া সাধারণতঃ সহর পর্য্যন্ত ৶০ আনা হইত।০ চারি আনা মাত্র। তবে সময় সময় কিছু অধিক দিতে হয়।

অনেকে কাশী ষ্টেশন হইতে নৌকা করিয়া সহরে আসেন, কিন্তু তাহাতে আসিতে কিছু বিলম্বও হয়, অথচ ভাড়াও।০ আনা হইতে ॥০ আট আনার কমে হয় না। তবে ঘাটের ধারে যাঁহাদের নামিতে হইবে, তাঁহাদের পক্ষে নৌকাতে আসাই ভাল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কাশীতে বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শনের জন্য বা পূজা অর্চ্চনার জন্য বিশেষ কোন বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই দিতে পারেন। অথবা না দিলেও কেহ কিছু পীড়ন করে

না। তবে নূতন যাত্রী দেখিলে যাত্রাওয়ালা ব্রাহ্মণগণ অযথা বিরক্ত করিয়া থাকে। এখানে মণিকর্ণিকা-কুণ্ডে স্নান করিলে ও যাত্রাওয়ালারা সমস্ত দেখাইয়া দিলে প্রত্যেক যাত্রীর জন্য ১।০ পাঁচ সিকা করিয়া তাহা-দিগকে দিতে হয়। সধবা পূজা, কুমারী পূজা, চণ্ডী-পাঠ, দণ্ডী ও ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতির জন্য যাহার যেমন ইচ্ছা তিনি তেমনই ব্যয় করিতে পারেন। তবে কাশীতে কোন পরিচিত লোক থাকিলে এ সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তার কোন কারণই থাকে না। নতুবা প্রসিদ্ধ ও সৎ পাণ্ডার বাটীতে উঠিলেও কাহাকে বিশেষ বিড়ম্বিত হইতে হয় না।

কাশীতে কিছুদিন থাকিতে হইলে পূর্ব্ব হইতে তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক, যদি তাহা না করা হয়, তবে বাঙ্গালীর হোটেল আছে, দশাশ্বমেধের নিকট যে কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে অনেকেই তাহা বলিয়া দিতে পারেন। তাহাতে দুই বেলা আহারাদির ব্যয় সাধারণতঃ ।/০ বা ।৵০ আনা পড়িবে। ঘর ভাড়া দুই এক দিনের জন্য প্রত্যহ ।০ আনা হইতে সময় সময় ১৲ টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। মাসিক ৫৲ টাকা হইতে ৩০৲ টাকার মধ্যে স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া পাওয়া যায়। কাশীর ঘণ্টা হিসাবে গাড়ী ভাড়া প্রায় কলিকাতার অনুরূপ। গোধূলিয়ার নিকট গাড়ির

আড্ডায় মিউনিসিপ্যাল-বোর্ডে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। নিত্য-যাত্রা ও পঞ্চক্রোশী-যাত্রা এ সকল বিষয় স্বামী সচ্চিদানন্দ সংকলিত "কাশী-মাহাত্ম্যে" বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। তাহাতে বিশ্বনাথের আরতি-স্তোত্র প্রভৃতি অনেকগুলি স্তবও সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক কাশী-যাত্রীরই তাহা এক এক খানি সংগ্রহ করা আবশ্যক। কাশীর প্রসিদ্ধ পাণ্ডাদিগের নিকট এবং দশাশ্বমেধের সেই সর্ব্বজন পরিচিত 'স্বদেশী সম্মিলনী'তে তাহা পাওয়া যায়। পঞ্চক্রোশী-যাত্রার ব্যয় সর্ব্ব সমেৎ ১০।১৫ টাকার অধিক পড়ে না। পাঁচ দিনে তাহা সম্পন্ন করিতে হয়। এ সকল বিষয় পাণ্ডা বা যাত্রাওয়ালা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে।

বিদেশে সর্ব্বদা স্নানাহারের অনিয়মে অনেকেই সহসা অসুস্থ হইয়া পড়েন. তাহাতে সংযাত্রীগণ নিতান্ত বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের খুব ধীর ভাবে সুনিয়মে অবস্থান করা বিধেয়। তবে কাশীতে সহসা অসুখ বিসুখ হইলে বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দশাশ্বমেধের নিকট ডাক্তার বৈদ্য ও ঔষধালয়ের অভাব নাই। অনেকেই বেশ সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী চিকিৎসক। এখানের খ্যাতনামা ডাক্তার প্রকাশ

নাথ হালদার প্রভৃতি অনেকে বিশেষ যত্ন করিয়া সকলের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। ষ্টার কোম্পানীর বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ হোমওপ্যাথী ও এলোপ্যাথী ডাক্তারখানাও এই সঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কাশীযাত্রীদিগের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে সমস্তই এক প্রকার বলা হইল। অন্যান্য বিষয় কাশীতে আসিলেই সহজে সকলের পরিজ্ঞাত হইবে।

জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণার জয়, জয় বিশালাক্ষী,
কাশী-কোতোয়াল কাল ভৈরবের জয়,
জয় কাশীতল-বাহিনী গঙ্গা,
মণিকর্ণিকার জয়।

সমাপ্ত।



লাভ করিতে পারিবেন, এ কথা আমরা বলিতে পারি। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সুন্দর। ছবিগুলি বেশ।"

বসুমতী। (শনিবার ২৯শে আশ্বিন, ১৩১৯।)

" * * এই গ্রন্থখানিতে কাশীর অতীত ও বর্ত্তমান সময়ের বিবরণ অতি সুন্দর ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। * * * কাশীর বিস্তৃত বিবরণ যাঁহারা জানিতে চাহেন,—প্রতি তীর্থের, প্রতি মন্দিরের ইতিহাসের সহিত যাঁহারা পরিচিত হইতে চাহেন,—তাঁহারা এই গ্রন্থখানি পাঠ করুন। পূজার সময় অনেকে কাশী যাইবেন,—তাঁহারা যেন যাইবার সময় এই গ্রন্থখানি ক্রয় করেন। ইহাতে প্রায় সমস্ত দেবালয়ের ও তীর্থের বিবরণ অতি বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানিতে অনেকগুলি চিত্র আছে। চিত্রগুলিও সুন্দর। সারনাথ বা মৃগদাব সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এই পুস্তকপাঠে জানিতে পারা যায়। এ গ্রন্থ ঐতিহাসিক, প্রত্নতত্ত্ববিদ্, পুরাবস্তু অনুসন্ধিৎসু, তীর্থযাত্রী প্রভৃতি সকলেরই উপকারে আসিবে।"

হিতবাদী। (২৮শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩১৯ সাল।)

"ইহাতে কাশীর প্রাচীন ইতিহাস, গঙ্গার ঘাট ও মন্দির প্রভৃতির বর্ণনা আছে। * * * এই গ্রন্থে তিনি কয়েক খানি চিত্রও দিয়াছেন। বাঙ্গালী কাশীযাত্রিগণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন, ইহাই আমাদিগের ধারণা। * * *"

মেদিনীপুর হিতৈষী। (২০শে শ্রাবণ সোমবার ১৩১৯।)

"কাশীধাম",—"সুবিখ্যাত শিল্পী, পরমভক্ত, সমুচ্চ সাধক, সুপ্র-

সিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ কৃতী লেখক শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত।" * * * মন্মথ বাবু ১৫।১৬ বৎসর কাশীতে অবস্থান পুরঃসর যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া কাশীর নানাস্থান পরিভ্রমণ করত বহু অনাবিষ্কৃত তথ্য আবিষ্কার করেন এবং পুরাকাল হইতে কাশীর ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রচার করিয়াছেন। * * * যিনিই এই গ্রন্থ হস্তে করিবেন, তিনি পাঠ শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবেন না। * * * আমরা ইহা পাঠ করিয়া ধন্য হইয়াছি। * * * বহুসংখ্যক মনোজ্ঞ চিত্র দ্বারা পুস্তকের বর্ণনীয় বিষয় আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। * * * শিল্পের হিসাবে কাশীধাম ভারতের শীর্ষ স্থানীয়। মন্মথবাবু একজন বিখ্যাত শিল্পী, তিনি প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে ভাস্কর্য্য শিল্পের কি অপূর্ব্বত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারও অংশ গ্রহণ করিয়া সাধারণে আনন্দিত ও ধন্য হইবেন। * * * মন্মথ বাবুকে যে কত ধন্যবাদ দিব, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।"

INDIAN DAILY NEWS. (SEPT. 10th, 1912.)

"Sachitra Kashidham : By Monmotha Nath Chakravarti. This is an illustrated guide book to Benares in Bengali in which a detailed account is given of all the temples and places of pilgrimage in Benares, which cannot fail to be of use to Bengali pilgrims to that holy city."

AMRITA BAZAR PATRIKA. (OCT. 7, 1912.)

"* * * He has ransacked the ancient and modern authorities, both mythological and historical, in tracing the origin of the name of Benares and its early history. The reader will find in the book

detailed descriptions of not only all the temples, wells, ghats, mutts, mosques, and other relics of antequarian interest but also of all the modern institutions which have added lustre to the fair fame of the fascinating city. There are also in the book elaborate accounts of the various religious sec's with their institutions, that have established themselves in the city. The book contains illustrations of some of the well-known places In the accounts which the learned author has given he has left nothing unsaid and the most minute objects of interest have not escaped his observant eye. The language is chaste, lucid and dignified, and the general get-up of the book excellent. We have no doubt the book will command a large sale."

THE TELEGRAPH. (OCT. 12, 1912.)

" * * * Babu Manmathanath has gone out of his beaten path and taken to writing on subjects far remote from Art or Photography, we mean, a topographical review of Kasi and its surroundings. When we say topographical, we do not imply thereby that he has written only notes on the Holy City as regards its geography, but an exhaustive and interesting history, social, religious and political, of Benares with minute descriptions and accounts of places of interest. Babu Manmathanath is himself an artist, but it must not be assumed, therefore that he has seen Kasi with only an artist's eye. He has interspersed his book with pretty pictures of numerous places of interest in Kasi, but in addition to this has given the history of Kasi, early as well as modern, history of the kingdom of Kasi and the chronology of its kings, the

detailed description of the innumerable temples, "Ghauts" and "Mauths" of Kasi, accounts of various religious sects, local society, "Chhatras" and "Mahatmas," accounts of "Ramnuggur" and "Vyas-Kasi" and notices of the modern buildings and places of interest in Kasi with its commerce, bazar, fairs and sundry other things. The language of the book is devoid of unnecessery gloss and polishing so as to be understood by all and appreciated by them as a literary relish. It has one great attraction, we mean, it never tires the patience of readers; in it interest is sustained throughout. We think it is valuable as a book of reference and as such is sure to prove useful to all intending pilgrims to the Holy City."

কাজের লোক। (কলিকাতা, জুলাই, সন ১৯১২ সাল।

"প্রাচীন এবং আধুনিক কাশীধামের বিস্তারিত বিবরণ, যেখানে যাহা কিছু দেখিবার ও জানিবার আছে, তাহা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করেন নাই। শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের সংস্থাপন কর্ত্তা, বর্ত্তমান সময়ের একজন কীর্ত্তিমান চিত্রশিল্পী, সুলেখক, সদ্বক্তা এবং পুরাতত্ত্ববিদ্। 'কাশীধাম' তাঁহারই লেখনী-প্রসূত একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। কাশীধামে যাইতে হইলে, মন্মথ বাবুর একখণ্ড "কাশীধাম" সঙ্গে থাকিলেই যেন যথেষ্ট হইয়া গেল। কাশীর যাহা কিছু জানিবার সমস্তই ইহাতে আছে। গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য, বিলক্ষণ কৌতূহলোদ্দীপক এবং চিত্তাকর্ষক।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুল, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, এমন একখানি পুণ্যধাম কাশী-সম্বন্ধীয় পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। এতবড় গ্রন্থের, এরূপ বান্ধান পুস্তকের ১।০ মূল্যও যথেষ্ট সুলভ। ১৬ খানি রঙ্গিন কালীতে মুদ্রিত হাপ্‌টোন ছবি আছে। সুন্দর পুস্তক।"

সাহিত্য-সংবাদ। (শ্রাবণ, ১৩১৯ সাল।)

"৺কাশীধাম সম্বন্ধে ইংরাজীতে ও বাঙ্গলায় অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে অল্পের মধ্যে সকল কথাই সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পাঠে প্রাণে ধর্ম্মভাবের উদ্রেক হয়,—গ্রন্থের ইহাই বিশেষত্ব। চক্রবর্ত্তী মহাশয় কলিকাতার একজন সুবিখ্যাত ও সুদক্ষ শিল্পী। 'ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল'—তাঁহার সে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছে। এদিকে সাহিত্য-সংসারেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা আছে। আলোচ্য গ্রন্থ পাঠে তাঁহার সেই উভয় গুণেরই পরিচয় পাওয়া যাইবে। তিনি কেমন শিল্পী ও কেমন সাহিত্যিক, এই গ্রন্থে পাঠক তাহার পরিচয় পাইবেন। ভাষা সরল ও সুন্দর। বিষয়-বিন্যাস কৌতূহলপ্রদ। এ গ্রন্থের আদর হওয়া বাঞ্ছনীয়। * * *"

ব্রহ্মবিদ্যা। (আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ১৩১৯।)

পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমরা দেখিলাম, প্রকাশকের প্রভৃতি বাক্য একান্ত সত্য। প্রায় ৩০০ শত পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তকে কাশী বারাণসী সম্বন্ধে বক্তব্য বিস্তর কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যিনি ১৫।১৬ বৎসর কাশীতে বাস করিয়া স্থানীয় তথ্য সকল নিজে আয়াস-সহ অনুসন্ধান করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্তদৃষ্ট

ও অন্যলিখিত বিবরণের অনুবাদাদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্য ও সত্য, তাহার সন্দেহ নাই। * * * এই পুস্তকে অবশ্য-জ্ঞাতব্য কোন বিষয়ের অভাব দেখিলাম না। * * * লেখা, প্রাঞ্জল, প্রসাদ-গুণশালী, মনোহর, স্থানে স্থানে আবেগময় ও সুমিষ্ট সাধু-ভাষা সমন্বিত। ইহাতে ১৬।১৭ খানি হাফটোন ছবি আছে। ফলতঃ এ পুস্তকখানি তীর্থ যাত্রীর পথ-প্রদর্শক স্বরূপ। এই শারদীয়া পূজার অবকাশে অনেকেই কাশীতে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে এখানি বড়ই উপকারে আসিবে, ইহা আমাদের ধ্রুব ধারণা। * * *"

আলোকচিত্রণ বা ফটোগ্রাফি শিক্ষার ১ম পুস্তক।

(৪র্থ সংস্করণ) আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত।

ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। সহজে ফটোগ্রাফি শিখিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নাই। মস্ত সংবাদপত্রে ও ফটোশিল্পিগণ কর্ত্তৃক ইহা একবাক্যে প্রশংসিত। বর্ত্তমান সময়ের অধিকাংশ ফটোগ্রাফারই এই পুস্তকের সাহায্যে প্রথমে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই আদি ও শ্রেষ্ঠ পুস্তক। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

ছায়াবিজ্ঞান। (ফটোগ্রাফি শিক্ষার ২য় পুস্তক।)

ইহাও শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আলোকচিত্রণে যে সকল বিষয় নাই, ছায়াবিজ্ঞানে তাহাই বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ফটো শিক্ষার্থীর ইহাও বিশেষ প্রয়োজনীয়

পুস্তক। তৃতীয় সংস্করণে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

সনাতন সাধনতত্ত্ব বা তন্ত্র-রহস্য।

শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র তন্ত্রের গভীর রহস্য ইহাতে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে তন্ত্রের এমন ব্যাখ্যাপুস্তক আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। সমস্ত সংবাদপত্র ও সাধুমণ্ডলী দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত। শ্রীশ্রী৺ দক্ষিণা কালিকার সুরঞ্জিত চিত্র-সম্বলিত, সুন্দর কাপড়ে বাঁধাই, স্বর্ণাক্ষরে নামাঙ্কিত মনোহর সুঠাম পুস্তক। প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্যপাঠ্য।

কাশীমাহাত্ম্য।

শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ স্বামী প্রণীত। মূল্য ৵০ দুই আনা মাত্র ইহাতে সংক্ষেপে কাশীমাহাত্ম্য, বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণাদির স্তোত্র ও পঞ্চ ক্রোশী এবং অন্তঃগ্রিহীক যাত্রাদি লিখিত হইয়াছে। ভক্তিবান কাশীযাত্রীর অবশ্য পাঠনীয়।

অন্নদাজীবনী।

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলের স্বনাম প্রসিদ্ধ প্রধান অধ্যাপক স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বাগচী মহাশয়ের জীবন চরিত। প্রত্যেক শিল্প শিক্ষার্থীর অতি অবশ্য পাঠকরা উচিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র

ঠাকুরমা।

"শিল্প ও সাহিত্য" সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত বালিকাবিদ্যালয় তথা প্রত্যেক গৃহস্থ রমণীর নিত্য পাঠ্য। স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ক এমন উপাদেয় পুস্তক ইতিপূর্ব্বে আর কখনও প্রকাশ হয় নাই। উপহার বা পারিতোষিক রূপে এই পুস্তকখানি প্রত্যেক বৌ-ঝিরই হস্তে দেওয়া আবশ্যক। মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।
